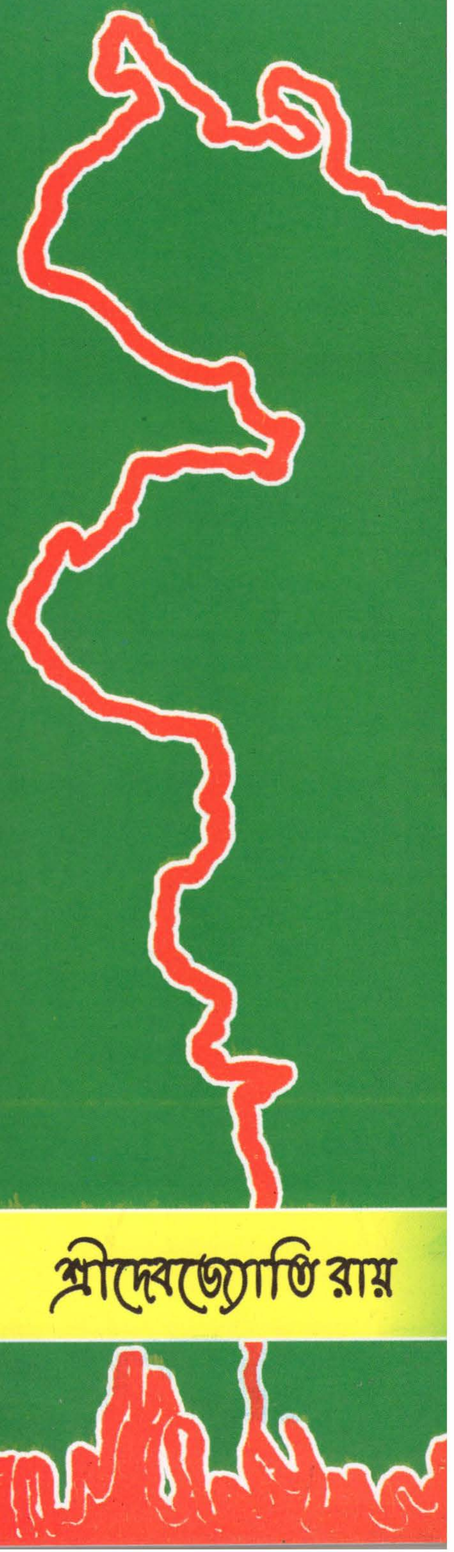
কেন উদ্বাস্তু হতে হল



শ্রীদেবজ্যোতি রায়

কেন উদ্বাস্তু হতে হল

শ্রীদেবজ্যোতি রায়

পরিবেশক

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
(অরুণ ঘোষ)
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা -৭০০ ০৭৩
ফোন- ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

বারাসাত রেলওয়ে বুক স্টল
(শ্যামল রায়)
(২-৩ নং প্লাটফরম)
বারাসাত, উ. ২৪ পরগনা
ফোন- ৮৬৯৭২৫৬৮৪৭

KENO UDBASTU HOTE HOLO
[WHY DID WE BECOME REFUGEES]
By
Shri Debajyoti Roy

প্রথম প্রকাশ ঃ কোলকাতা বইমেলা, ২০০১
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ কোলকাতা বইমেলা, ২০০৫
তৃতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ২৪, ২০১২
(কোলকাতা বইমেলা)

প্রকাশক ঃ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস
১২ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৫
ফোন - ৯১৬৩১২২২১১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ শ্রী এন. কে. রায়

কম্পোজ ঃ শ্রীসৌম্য জ্যোতি রায়।

মুদ্রণ ঃ ডি অ্যাণ্ড পি গ্রাফিক্স লিঃ
গঙ্গানগর, কলকাতা - ৭০০ ১৩২
ফোন- ০৩৩-২৫১৮ ৮৮৮০

মূল্য ঃ ৮০ টাকা মাত্র।

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২১৩৩; ফোন-০৩৪-৮২২৬৪২৫৩
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রায়গঞ্জ, প. দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১৩৪
শ্রীচঞ্চল দেবনাথ
নতুন পুকুর, বারাসাত, কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন- ৯৮৩৬২৬৮১৪৩
অ্যাডভোকেট তপন বিশ্বাস
সম্পাদক, 'ওম গাণ্ডীব' মালিপুকুর, দ. ২৪ প. পিন-৭৪৩ ৫১৩
ফোন-৯৪৩৪৩০২১২৯

উৎসর্গ

আগামী দিনে যাঁরা ভারতের ইতিহাস লিখবেন
এবং
প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আজ যাঁরা পূর্ববঙ্গ
থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও
ভারতের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির জন্য আন্দোলন করছেন

তাঁদের উদ্দেশে

অনিচ্ছুক কোন উদ্বাস্তুকে তার জন্মভূমিতে ফেরত পাঠানো যাবে না

জাতিসঙ্ঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক শাখা 'ইউনাইটেড নেশন্স হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস'-র বিধান অনুসারে কোন দেশের কোন মানুষ যদি তার নিজের জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা এবং রাজনৈতিক মতবাদের কারণে অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং ঐ দেশ থেকে নিজের দেশে ফিরে আসতে না পারেন বা ফিরে আসতে না চান তবে তিনি উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচিত হবেন। এই উদ্বাস্তুরা আশ্রয়গ্রহণকারী দেশের অন্যান্য নাগরিকদের মতই যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাবেন। ["...Refugees are to receive the same treatment as nationals of their country of residence."] উদ্বাস্তু জনগণকে তাঁদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে হবে। অনিচ্ছুক কোন উদ্বাস্তুকে তার জন্মভূমিতে ফেরত পাঠানো যাবে না। আশ্রয়গ্রহণকারী দেশ যদি ঐ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসিত করতে অপারগ হয় তবে জাতিসঙ্ঘ সাহায্য করবে।

অনুপ্রবেশকারী কে?

যে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী 'ক্ষতি সাধনার্থ পরের এলাকায় বা দলে গোপনে ও অবৈধভাবে প্রবেশ' করে। (সংসদ বাংলা অভিধান, ১৯৭৫, পৃ- ২৯) পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গ থেকে এ পর্যন্ত একজন হিন্দু-বৌদ্ধও কি এদেশে এসেছেন যিনি ভারতের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে চান?

***

নবী মোহাম্মদের নির্দেশ

* "এ কথা সত্য যে, পয়গম্বর মোহাম্মদ ইহুদিদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এটা ছিল ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। কিন্তু শেষ অধ্যায়ে মোহাম্মদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আছে যে, "সকল ইহুদিদের আরব থেকে বিতাড়িত কর।" — মাওলানা আকরাম খাঁ।

(দেখুন - যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ-পত্র, অনুচ্ছেদ- ২৪)

মৃত্যু শয্যায় থেকেও নবীজী বলেছেন, "একমাত্র মুসলমান ছাড়া ইহুদী খৃষ্টান সবাইকে আমি আরব ছাড়া করব।" (হাদিস সহি মুসলিম, ৩/৯৬৫ এবং ৪৩৬৬)

***

কোরানের ভিত্তি-ভূমি

সামরিক শক্তির ভিত্তিভূমি দু'টি— আনুগত্য এবং সামরিক শৃঙ্খলা। আল্লাহ্ এই দু'টো ভিত্তিভূমিকেই একত্রিত করেছেন তাঁর সৃষ্ট কোরানের আয়াত সমূহে। [The foundation of the military spirit is as they say : Obedience and military discipline. Allah has gathered these foundations in the verses of His Book (Quran), Sahih Al-Bukhari,vol.1, page-xxxi]

***

গজনীর মহম্মদ (সুলতান মাহ্মুদ) এবং বাবর ছিলেন তাতার, মহম্মদ ঘোরী, নাদির শাহ্ এবং আহমদ শাহ্ আবদালি ছিলেন আফগান, তৈমুর ছিলেন মঙ্গোলিয়ান। এরা কেউ কারও বন্ধু ছিলেন না। তবে হিন্দুদের বিলুপ্তি সাধনের ব্যাপারে তারা ছিলেন এক এবং অভিন্ন। ড. আম্বেকরের ভাষায়, " .. with all their internecine conflicts they were all united by one common object and that was to destroy the Hindu faith." [Pakistan or The Partition of India, 1990, p-57]

***

ভারত বা বাংলাদেশে (অন্যান্য দেশেও) মুসলিম পরিবারের শিশু যেদিন থেকে কথা বলা শুরু করে সেদিন থেকেই তাকে আল্লাহ্ ও নবীর মহত্ত্বের সঙ্গে আর যেটি শিক্ষা দেওয়া হয় তা হচ্ছে 'প্রতিমা পূজা নিকৃষ্টতম কাজ; এটা মহাপাপ। এ পাপের কোন ক্ষমা নেই।' হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনরা প্রতিমা পূজারী। তাই তারা অপবিত্র, মহাপাপী। তারা অভিশপ্ত (মালাউন), তারা ঘৃণ্য।

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং (যিনি পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু) বিরোধী দলের নেতা হিসেবে ১৮.১২.২০০৩ তারিখে বলেছিলেন —



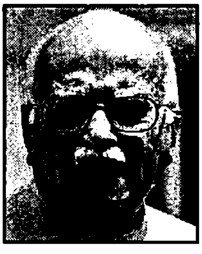
"আমি বিশেষভাবে বলতে চাই যে, আমাদের দেশ ভাগ হওয়ার পরে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা নির্যাতন ভোগ করছেন এবং এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব... এই ভাগ্যহীন লোকদের নাগরিকত্ব প্রদানের প্রক্রিয়া অধিকতর সহজ (more liberal) হওয়া উচিত। আমি আন্তরিকভাবে আশাকরি যে মাননীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে এই বিষয়টি মনে রাখবেন।"



সেদিন জেনারেল শংকর রায়চৌধুরী বলেছিলেন—

"আমরা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের লোক পাচ্ছি, যারা সকলেই আমাদের দেশে বে-আইনি ভাবে প্রবেশ করছে। এর মধ্যে অনেকে অর্থনৈতিক কারণে দেশত্যাগ করছে, যাদের আপনারা সারা দেশে দেখতে পাচ্ছেন — মুম্বাই, দিল্লী বা কোলকাতা যেখানেই হোক না কেন। এর মধ্যে কতক অনুপ্রবেশকারী, সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু তাদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যেমন— চাকমা, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি। আমি আন্তরিকভাবে সরকারকে জানাচ্ছি যে, সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের ভয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করছে, তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করা উচিত এবং তাদের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ ও সদয় আচরণ করা উচিত।"

উত্তরে শ্রী এল. কে. আদবানী বলেছিলেন ঃ



"বিরোধী দলনেতা এবং শ্রীশংকর রায়চৌধুরী যা বলেছেন, আমি তা নোট করে রাখছি এবং তাঁরা যে মত ব্যক্ত করছেন, তার সাথে আমি সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করছি। ...... আমরা সর্বদাই বলি যে, ধর্মীয় কারণে কোন ব্যক্তি দেশত্যাগ করলে সে উদ্বাস্তু, খাঁটি উদ্বাস্তু এবং অন্য কোন কারণে, এমনকি অর্থনৈতিক কারণে আসা বে-আইনী প্রবেশকারীদের সাথে সে এক পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। বে-আইনী প্রবেশকারীরা বে-আইনী প্রবেশকারী ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে আমি তা লিখে রাখছি এবং অনুমোদন (endorse) করছি।"

কয়েকটি নির্মম সত্য কথা

- ‘২০০১-এর ১ অক্টোবর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অষ্টম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জয়ী হন বিএনপি-র বেগম খালেদা জিয়া। সেদিন থেকে ৯২ দিনের মধ্যে বিএনপি এবং জামাতীরা ৮০ জন সংখ্যালঘুকে খুন করে, ৮১১ জনকে আহত করে। ধর্ষণ করে ২২৮ জনকে। তাদের মধ্যে সংখ্যালঘু মহিলার সংখ্যা ২২৫ জন। তাদের বয়স ৮ থেকে ৫০ বছর। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা শতকরা ১০-এর কম। এই হিসেবে শতকরা ৯৮.৭ জন সংখ্যালঘু মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন।’ এই হিসেব কোনো হিন্দু সাংবাদিক বা হিন্দু মিডিয়ার নয়। খবরটি প্রকাশিত হয়েছে ১৭.০২.২০০২ তারিখের ঢাকার ‘জনকণ্ঠ’ পত্রিকায়।
- ভারতের উচ্চমার্গের নেতৃবৃন্দের কাছে বাঙালি উদ্বাস্তুদের জ্বালা-যন্ত্রণার মূল্য শূন্যের কাছাকাছি। এর ফলে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা বিশেষভাবে উৎসাহ পাচ্ছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের মৌলবাদী অপশক্তি দু’বাহু তুলে ওখানকার সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন বড়িয়ে যাচ্ছে। তারা বুঝে নিয়েছে, হিন্দুদের উপর যত অত্যাচারই করা হোক, বর্তমান ভারত সরকার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করবে না। এই সুযোগে মুজিব তনয়া শেখ হাসিনা দিনের পর দিন দাবির বহর বাড়িয়ে চলেছেন এবং অতি দ্রুত মোল্লাপন্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। গত ৩০.০৬.২০১১ তারিখে ‘পরিপূর্ণ মুসলিম বাংলা’ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করলেন তাদের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বহাল রেখে এবং ‘বিসমিল্লাহ্’ যুক্ত করে। এর ফলে ওখানকার সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে। গত ২৯.১১.২০১১ তারিখে সংখ্যালঘুদের শত্রু সম্পত্তি/অর্পিত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার নাম করে একটি আইন পাশ করলেন, যার ভিত্তিভূমি দ্বি-জাতি তত্ত্ব।
- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট তথা বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচ-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীরবীন্দ্র ঘোষ গত ৮ ডিসেম্বর (২০১১) ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে (ব্রুসেল্‌স) প্রদত্ত ভাষণে ২০০৯-এর জুন মাস থেকে ৩০.১১.১১ তারিখ পর্যন্ত শেখ হাসিনা সরকারের শাসনকালে ওখানে সংখ্যালঘুদের উপর সংগঠিত অত্যাচারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে —

  * ২৫০ জন সংখ্যালঘুকে খুন করা হয়েছে।
  * ২১৫ জন মহিলা/কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়েছে।
  * ২,২০০ জনকে মারধর করা হয়েছে।
  * ৪,০৫০-টি পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে।
  * ২৭০-টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছে।
  * ১৫০-টি বসতবাটি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুঠ করা হয়েছে এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
  * ৩০৬ জন সংখ্যালঘুকে জোর করে মুসলমান বানানো হয়েছে।

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট সমূহ

ভূমিকা

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ, তার সঙ্গে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ, প্রায় একই সময়ে কাশ্মীর যুদ্ধ অগণিত মানুষের জীবনে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। যুক্ত বাংলা বিভক্ত হবার ফলে 'বন্যার জলস্রোতে'র মত লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশ্য বাংলা বিভক্ত হবার পূর্বেই ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে দাঙ্গার সূচনা থেকেই হিন্দুরা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় অন্যত্র চলে যান। সংখ্যায় অল্প হলেও একই কারণে বৌদ্ধরাও চলে আসেন; চলে আসেন কিছু সংখ্যক আদিবাসী। '৪৭-এর পরে ভারতে যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁরা 'উদ্বাস্তু' নামেই পরিচিত হন।

১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি সাময়িকভাবে উদ্বাস্তু আগমন কিছুটা স্তিমিত করে; তবে কখনও তা' বন্ধ হয়নি। অবশ্য এই চুক্তির শর্তসমূহ ভারতে যথার্থভাবে কার্যকর হওয়ায় ভারত থেকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ বন্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার ঐ চুক্তির শর্তাবলী সঠিকভাবে কার্যকর না করায় এবং অন্যান্য অনেকগুলো বৈষম্যমূলক আইন পাশ করায় ওখানকার সংখ্যালঘুরা কখনই তাঁদের মাতৃভূমিতে নিরাপত্তা বোধ করেননি। এর জন্যই তাঁরা অবিরাম ভারতে চলে আসেন। কিন্তু ১৯৫০-এর পরে ভারতের সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য তাঁদের ভিটে মাটি ত্যাগ করেননি।

দু'টো পর্যায়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে সংখ্যালঘুদের আগমন ঘটে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়, আর ১৯৭১ থেকে আজ পর্যন্ত আর একটি পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের সংগে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ও ভারতে এসে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। ১৯৭১-এ এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নেন। এঁদের শতকরা ৯৫ জনই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও আদিবাসী। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের পরে বাহাত্তরে এঁরা প্রায় সবাই বাংলাদেশে ফিরে যান। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায়ও ওখানে নানা প্রকার বৈষম্যের শিকার হয়ে আবার তাঁরা চলে আসতে থাকেন ভারতে। ওখানে পাকিস্তান আমলের শত্রুসম্পত্তি আইনটি 'অর্পিত সম্পত্তি' আইনের রূপ পেল। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর ওখানকার গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার কাঠামোটি ভেঙ্গে পড়ে এবং সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হলেন।

১৯৮৯-এ ভারতে বাবরী মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্ক এবং ১৯৯২-এ এটিকে ভেঙ্গে ফেলার বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার অনেক গুণ বেড়ে যায়।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা কিছুটা অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক' ভিতটি এই সরকার এখনও সুদৃঢ় করার মত অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে পারেনি।

এই গ্রন্থের লেখক শ্রীদেবজ্যোতি রায় তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দুই পর্যায়ের উদ্বাস্তুদের করুণ অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য উদ্বাস্তু আগমনের স্রোতধারাকে তিনি চার ভাগে ভাগ করেছেন। কেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং পরে বাংলাদেশ রাষ্ট্র থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তাঁদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হলেন তার চিত্রটি 'সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী' নিয়ে তুলে ধরেছেন শ্রীরায়। দেশভাগের ফলে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এই গ্রন্থটি সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করতে সহায়তা করবে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এলো তার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি, লেখা হয়নি কোন উল্লেখযোগ্য উপন্যাসও। অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর 'Marginal Men' হল একমাত্র তথ্যভিত্তিক গবেষণা গ্রন্থ। এই বই থেকে আমরা উদ্বাস্তু জীবনের বেদনা ও সংগ্রামের একটি ছবি পাই। শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন রচিত 'লজ্জা' ও 'ফেরা' উপন্যাস দু'টোতেও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের এক করুণ চিত্র পাওয়া যায়।

দেশভাগের পর বায়ান্নটি বছর আমরা অতিক্রম করেছি। আমরা কি এই আশা করতে পারি না, দুই বাংলার কোন না কোন শক্তিশালী লেখক দেশভাগের ট্রাজেডি তুলে ধরবেন? শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের লেখা এই গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে বার বার এই প্রশ্নটি আমার মনে এসেছে। উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে যাঁরা জানতে চান, তাঁরা নিঃসন্দেহে শ্রীরায়ের গ্রন্থটি পড়ে লাভবান হবেন।

১ ডিসেম্বর, ২০০০
কলিকাতা

অমলেন্দু দে
ভাইস প্রেসিডেন্ট
এশিয়াটিক সোসাইটি

(প্রথম সংস্করণ থেকে গৃহীত)

"দাঙ্গা হয় দুই পক্ষে। কিন্তু এখানে এক পক্ষ নীরব থেকেছে। মার খেয়েছে। পালিয়ে বেড়িয়েছে। অপর পক্ষ মেরেছে। এক সম্প্রদায়ের উপর অপর সম্প্রদায় হামলা করেছে। হিন্দু সম্প্রদায় মার খেয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মৌলবাদী গোষ্ঠীর হাতে।. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাকে কোন অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা সঙ্গত নয়। সাম্প্রদায়িক হামলা, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বলাই যৌক্তিক।"
— মি. সালাম আজাদ। (সহায়ক গ্রন্থ -'২০')

আশিস বাণী

২০০১-এর শেষে 'কেন উদ্বাস্তু হতে হল'র প্রথম সংস্করণ আমি পড়ার সুযোগ পাই। গ্রন্থটি পড়ে লেখকের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জন্মে। তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং নির্ভীক প্রকাশভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করে। ১৮৮৫ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই উপমহাদেশের সম্প্রদায়গত রাজনীতিতে বড় মাপের যে সব ঘটনা ঘটেছে, তার নির্যাস নিয়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মাতৃভূমি ছেড়ে এসে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক তথ্য সংগ্রহ করেছেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থ থেকে।

দ্বিজাতি-তত্ত্ব ভিত্তিক ভারত-বিভাজনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সেদিন উভয় দেশের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় হওয়া একান্ত উচিত ছিল। এ কাজ না করে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ যে ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন তার মাশুল দিতে হচ্ছে পূর্ব-বঙ্গের অমুসলমানদের, বিশেষ ভাবে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের। অমুসলমান, বিশেষত হিন্দু এবং বৌদ্ধ হবার অপরাধে প্রতিনিয়ত তাদের পাশবিক অত্যাচারে শিকার হতে হবে তা সেদিনের হিন্দু নেতারা হয়ত বুঝতে পারেননি। কিন্তু ১৯৪৬, ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৭১, ১৯৯২ এবং ২০০১-এর পাশবিক ঘটনার কথা জেনেও কেন্দ্রীয় সরকার কেন নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল-২০০৩ পাশ করলেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণও পড়েছি। তৃতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি দেখেছি। বাংলাদেশের প্রয়াত ড. নীলিমা ইব্রাহিম, নিবন্ধকার সালাম আজাদ এবং অন্যান্যদের লেখা উদ্ধৃত করে লেখক ওখানকার নিষ্পাপ মানুষদের ওপর মৌলবাদীদের পাশবিক অত্যাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়ে অনেকবার কেঁদেছি। বারবার মনে পড়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর কথা। মহাপ্রয়াণের আগে তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, বাঙালি হিন্দুরা আমার কথা শুনল না। আমি চারিদিকে রক্ত দেখতে পাচ্ছি। এর ৭ বছরের মধ্যে কলকাতা, নোয়াখালী এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে রক্তস্রোত বইতে শুরু করে। ফলে ১৯৪৭-এ ভারত ভাগ হয়ে যায়। পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে উদ্বাস্তু স্রোত আসতে থাকে। পরবর্তী ঘটনা-দুর্ঘটনা অনেকেই জানেন। যাঁরা বিশদ ভাবে জানতে চান, তাঁরা এই গ্রন্থটি পড়বেন। নতুন প্রজন্মকে বলব, তোমরা অবশ্যই এই গ্রন্থটি পড়বে। মনে রেখো আত্মরক্ষার প্রথম দায় আমাদের নিজেদের। এ ব্যাপারে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক ভুল করেছেন। সেই ভুলের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়।

পরিশেষে লেখক শ্রীদেবজ্যোতি রায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি দীর্ঘায়ু হোন; তাঁর সৃষ্টি অব্যাহত থাকুক।

স্বা. স্বামী প্রদীপ্তানন্দ

জানুয়ারি ১০, ২০১২

অধ্যক্ষ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

একটি সমালোচনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়
এম.এ., বি.টি., ডিপ্.ই.এল.টি.(কল)
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক
বনমালিপুর প্রিয়নাথ ইন্‌স্টিটিউশন (উচ্চ মাধ্যমিক)
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা

শ্রীদেবজ্যোতি রায় লিখিত 'কেন উদ্বাস্তু হতে হল' বইখানি আগ্রহভরে পড়েছি। উদ্বাস্তু হবার বেদনা রয়ে গেছে আমাদের অনেকের মনের গভীরে, এ বেদনা আমাদের জীবনকালে যাবার নয়। কিন্তু কেন, কার দোষে, কাদের সযত্ন-লালিত সংঘবদ্ধ চক্রান্তে চোদ্দ পুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে ও-পার বাংলা থেকে এ-পার বাংলায় ভেসে আসতে হ'ল ছিন্নমূল তৃণখণ্ডের ন্যায় তার নেপথ্য সত্য তেমন করে জানা ছিল না। জানা ছিল, খবরের কাগজের কিছু ভাসা ভাসা কথা আর পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন কিছু বুদ্ধিজীবীর (?) প্রলাপ-বাক্য-নিঃসৃত অর্ধসত্য। শ্রীরায়ের লেখা বইখানি তথ্য, সত্য, চোখের জলের নোনা স্বাদ, রক্তের লাল রঙ, তার বিকৃত গন্ধ, হৃৎপিণ্ডের কান্নার স্পন্দন — সব যেন এক ত্রে উৎসর্গ করেছে জিজ্ঞাসু পাঠকদের উদ্দেশে। সুপরিকল্পিত সংঘবদ্ধ নারকীয়তা কাকে বলে, কাকে বলে অসহায় রক্ত মোক্ষণ সে-সবের কিছু অভিজ্ঞতা উদ্বাস্তুদের অনেকের আছে। সীমানা অতিক্রম করে এদিকে পৌঁছবার প্রাণান্ত প্রয়াস এবং প্রতি পদে ওৎ পেতে থাকা হায়নার আগুনে চোখ, লালা-ঝরানো সুদীর্ঘ জিহ্বা ও চক্‌চকে ধরালো দাঁতের কথা অনেকের জানা আছে স্বচক্ষে দেখা সন্তানের চিতার আগুনের বীভৎস স্মৃতির ন্যায়। শ্রীরায় বহু পরিশ্রম করে নানা নেপথ্য সত্যের দলিল সংগ্রহ করেছেন এবং পৌঁছে দিয়েছেন পাঠকদের কাছে। তিনি কৃতজ্ঞতা ভাজন সকল মতের পথের ধর্মের সত্য-সন্ধানী মানুষের।

শক্তের অপরাধে 'দুই বিঘা জমি'-র উপেনের সর্বহারা হয়ে পথে নামার বেদনা ভাষা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের সোনার লেখনীতে, আর অসংখ্য উপেনের এবং তাদের প্রতিবেশীদের অমানুষিক নিগ্রহের কাহিনী ভাষা পেয়েছে শ্রীরায়ের ইস্পাতের কলমে।

শহিদের আত্মোৎসর্গ, অসংখ্য নারীর সম্মান, নর-নারী নির্বিশেষে বহু মানুষের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা ভয়ংকর অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে মানুষের ধর্মান্ধতার পাপে তার অমর সাক্ষী শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের বইয়ের তথ্যপঞ্জী।

এ-সব তথ্য ও সত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারলে সুখী হতাম!

৫. ৯. ২০০৫।

স্বা. রবীন্দ্রনাথ রায়
শিক্ষক

লেখক শ্রীরায় সম্পর্কে ড. অনিল বিশ্বাস



Dr. A. R. Biswas
M. A., LL.M., Ph. D., D. Litt, (Hony)
Onath Nauth Deb Gold Medalist
Anandaram Baroah Medalist &
Griffith Memorial Prizeman.

বর্তমান যুগে সুষ্ঠু গবেষণার অভাবই বিশেষ করে চোখে পড়ে। ব্রিটিশ সম্বন্ধে অনেক অপবাদই আছে। কিন্তু তাঁরা যে এদেশবাসীকে মননের গবেষণায় উন্নীত করেছেন, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোন সংশয় নেই। উনবিংশ এবং বিংশ শতকে যে রেঁনেসাস এসেছিল, তার কৃতিত্ব মূলত ব্রিটিশদেরই । আজ তাঁরা চলে গেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে গবেষণারও ঘাটতি পড়েছে। অল্প যে কয়েকজন গবেষক এখনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে স্থান দেই আমি এ যুগের শ্রীদেবজ্যোতি রায়কে।

শ্রীরায় যা' কিছু লেখেন তার পেছনে থাকে ঐতিহাসিক তথ্য। এরই মারফতে তিনি মননের যুক্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। ফলে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি সিদ্ধান্তে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এই জন্যে আমি শ্রীরায়কে অগ্রণী বলে মনে করি। তিনিই নতুন যুগকে এই মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারেন। তাই আমার আবেদন রইল এই মর্মে যে নতুন যুগের মানুষ যেন ঐ মননের পথেই অগ্রসর হন এবং নতুন নতুন আবিষ্কারে এগিয়ে যেতে পারেন।

গৈরিক, ১৮ কো-অপা. রোড
কলকাতা-৭০

স্বা. ড. অনিল বিশ্বাস



"মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অদ্ভুত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক মুসলমান প্রীতি যে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের কি গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে — একদিন ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহার বিচার করিবে।"

— প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার।
(বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪৩৮)

শুভেচ্ছা বাণী

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ
এম.এ., পি.এইচ.ডি.
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অবসরপ্রাপ্ত)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ১, ২০০০

অবিভক্ত বাংলাদেশের পূর্বাংশের মানুষ ধর্মীয় নির্যাতনের ফলে জন্মভূমি ত্যাগ করতে শুরু করেন ১৯৪৬ থেকে। সুদীর্ঘ ৫৫ বছর পরে আজও চলছে তাঁদের ভিটে ছাড়ার পালা। কী এর কারণ? কেন আমরা চলে আসছি ওখান থেকে? নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের মননশীলতা নিয়ে শ্রীদেবজ্যোতি রায় এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন এবং এর কারণ বিশ্লেষণ করেছেন গ্রহণযোগ্য যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে। এ যাবৎ আমরা বলে এসেছি মুসলিম লীগ দ্বিজাতি-তত্ত্বের মত একটি ভুলতত্ত্ব সৃষ্টি করে ভারত ভাগ দাবি করেছিল। কিন্তু ঐ ভুল তত্ত্বটি কোত্থেকে এল তা' নিয়ে তেমন কোন আলোচনা হয়নি এতদিন। শ্রীরায় এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। তিনি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, এই তত্ত্ব টি ভুল নয়; এটি ইসলাম ধর্মের মৌলিক তত্ত্ব। ইসলাম ধর্মের ব্যখ্যা অনুসারে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত— বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী। এর নাম দ্বিজাতি-তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে মুসলমানরা তাদের ধর্মশাস্ত্রে চিহ্নিত অপবিত্র পৌত্তলিক হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে না। মুখ্যত এর জন্যই ভারত ভাগ হয়েছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হিন্দু-বৌদ্ধরা দলে দলে তাঁদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ১৯৪৬-৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তান নামক তথাকথিত পবিত্র ভূমিতে এবং অধুনা ইসলামী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিধর্মীদের উপর যে নিপীড়ন ও অত্যাচার চালানো হয়েছে তার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থে। শব্দ চয়নের মুন্সিয়ানা এবং সাবলীল প্রকাশভঙ্গী পাঠকের মনকে স্তম্ভিত করে রাখে। নিপুণ শিল্পীর মত শ্রীরায় পূর্ব পাকিস্তানে তথা অধুনা বাংলাদেশে বসবাসরত নির্যাতিত হিন্দু-বৌদ্ধদের নীরব অশ্রুধারাকে রং হিসেবে ব্যবহার করে তাঁদের দুঃখ দুর্দশার ছবি এঁকেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে লেখক যে সাহস, সততা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন এবং যেভাবে অসত্যের আবরণকে উন্মোচিত করে সত্যকে তুলে ধরেছেন, বর্তমান অপ-রাজনীতির যুগে তা' বিরল। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রশক্তি যখন যখনই হিন্দু-বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করেছে, তখন তখনই কোরান ও হাদীস সংকলনের বিভিন্ন বিধানের সাহায্য নিয়েছে। লেখক এই ধরনের বেশ কিছু বিধানের উল্লেখ করেছেন এই গ্রন্থে। এগুলোকে অসত্য বলে প্রমাণ

করার এতটুকু সুযোগ নেই কারও।

১৯৫০ থেকে আজ পর্যন্ত মৌলবাদী মুসলমানদের তাণ্ডবে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে যা' ঘটেছে, এখনও যা' ঘটছে এবং আগামীতে যা' ঘটতে যাচ্ছে তা' বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। একদা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দু ও বৌদ্ধরা নিজেদের শ্রমে ও অর্থে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাংলাকে সোনার বাংলা করে গড়ে তুলেছিলেন। অথচ তাঁদের বংশধরগণ বিগত ৫৩ বছর ধরে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বসবাস করছেন। যাঁদের আত্মত্যাগে ভারত স্বাধীন হয়েছিল সেই সর্বত্যাগী স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও তৃতীয় শ্রেণির কয়েদী হিসেবে বন্দী করা হয়েছিল। এঁদের অপরাধ এঁরা হিন্দু, এঁরা পৌত্তলিক। যারা বন্দী করেছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদান শূন্য।

১৯৭১-এ লেখকের সামনেই তাঁর আপনজনদের ধর্ষণ করা হয়েছে, খুন করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা আবার ঘটে ১৯৭২-এ। শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই ধরনের অত্যাচারের কথা কিছু কিছু লিখলেন। অমনি রে রে করে উঠল উভয় বাংলার মৌলবাদী শক্তি। এদের বিচারে বাংলাদেশে হিন্দুর উপর অত্যাচারের বর্ণনা 'কষ্টকল্পিত'। এরা ভারতকে মুসলিম ভারত হিসেবে দেখতে চায়। মুখ বুঁজে রইল পশ্চিম বাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সিংহভাগ।

বলা যায় বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধরা কৃষ্টিগতভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছেন। এর বিষময় পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন শ্রীরায়।

শ্রীরায় নিজেকে ঐতিহাসিক বলে দাবি করেননি। তিনি তাঁর একক প্রয়াসের এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি আগামী দিনের ঐতিহাসিকদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থটি আগামী দিনের ঐতিহাসিকদের প্রয়োজন মেটাবে।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, শ্রীরায়ের এই প্রচেষ্টা ঘুমন্ত ভারতবাসীকে জাগ্রত করুক। আমি দেবজ্যোতিবাবুকে অজস্র সাধুবাদ জানাই। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

১.১২.২০০০ — স্বা. দীনেশচন্দ্র সিংহ

(প্রথম সংস্করণ থেকে গৃহীত)

'কেন উদ্বাস্তু হতে হল'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের শুভ লগ্নে আমি লেখক ও প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১০.০১.২০১২ — দীনেশচন্দ্র সিংহ

লেখকের নিবেদন

২০০১-এর মার্চ মাসে আমাদের এই বই-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-তনয়া শেখ হাসিনা। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০৫-এ। তখন ওখানে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি হিন্দু নির্যাতনের ঘৃণ্য ইতিহাস সৃষ্টি করেন। আজ ২০১২-এ যখন তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী।

ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু যখন বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন শেখ হাসিনা তখন ছাত্র রাজনীতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। তাও খুব হালকা ভাবে। শেখ সাহেব কিন্তু অনেক পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ। কোরান-হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস না পড়লেও মুসলিম মানসিকতার কথা তিনি ভাল করেই জানতেন। তবুও শেখ সাহেব ধরে নিয়েছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাঁর নিজস্ব মাওলানা ও মৌলভীদের দিয়ে কোরান ও হাদিসের এমন ব্যাখ্যা দিতে পারবেন যার ফলে অনাগত স্বাধীন বাংলাদেশে সব ধর্মের মানুষেরাই শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করতে পারবেন। তাঁর এই চিন্তাধারার প্রবল সমর্থক ছিলেন তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বন্ধু বরিশালের শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার। ষাটের দশকে শ্রীসুতারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের অনেকবার আলোচনা হয়েছে। শ্রীসুতার বলতেন, 'কোরান ও হাদিসে কি লেখা আছে তা বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। সরকার ইচ্ছে করলেই কোরান-হাদিসের ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা দিতে পারে।' কিন্তু এটা যে সম্ভব নয়, চিত্তবাবু সেদিন গুরুত্ব দিয়ে তা ভাবতে যাননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শেখ সাহেব গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ — রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে এই চারটি নীতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। বিশ্বকবির 'আমার সোনার বাংলা'-কে জাতীয় সঙ্গীত করতে পেরেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, কোরানের মূল স্তম্ভ 'আল্লাহ্ বা খোদা সর্বশক্তিমান' এই কথাটিও পরিহার করতে পেরেছিলেন। যে কোন দৃষ্টিতে এ সব ঐতিহাসিক ঘটনা।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার কাজে শেখ সাহেব ভারত সরকারের সাহায্য নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু একাত্তরের অনেক আগে চিত্তবাবুকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। প্রস্তুতির প্রথম লগ্ন থেকে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত চিত্তবাবু তাঁর ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও অনেক হিন্দু ছেলে-মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুরাই সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন ও নির্যাতন

সহ্য করেছেন। কিন্তু বিগত ৪১ বছরের মধ্যে ঐ ত্যাগের কিছুমাত্র স্বীকৃতি বা প্রতিদান পাননি তারা। শেখ সাহেবের দুঃখজনক মৃত্যুর পর থেকে হিন্দুদের দুর্গতি বহুমাত্রিক হয়েছে।

২০০১-এ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অষ্টম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে ও পরে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে তা তৈমুর লঙ-এর গণহত্যাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মাওলানা নাসিরুদ্দিন ওমর নামে একজন অতি বিদ্বান মুসলমান এসেছিলেন তৈমুরের সঙ্গে। তিনি জীবনে একটি চড়ুই পাখিও হত্যা করেননি। তৈমুরের নির্দেশে তিনিও ১৫ জন হিন্দুকে খুন করেছেন। (সহায়ক গ্রন্থ-৩৯; ৩/৪৩৬)

পূর্বোক্ত নির্বাচনের পরে জামাত ও বিএনপি-র সন্ত্রাসীরা নারী ধর্ষণের যে রেকর্ড করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নিদর্শন পাওয়া কঠিন।

সম্প্রতি মুজিব-তনয়া শেখ হাসিনা কার্যত মোল্লাপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইতিহাসের কলঙ্ক জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গত জুন মাসে (২০১১) ইসলামকে দেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্থায়ী স্বীকৃতি দিলেন। এ জিন্দেগীতে এর এতটুকু পরিবর্তন হবে না। ম্যাডাম সংবিধানের শুরুতেই রাখলেন 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রহিম', যা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভিত্তিভূমি। এর ফলে মুসলমান না হয়ে হিন্দুদের ওখানে বাঁচার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। স্বভাবতই হিন্দুরা ভারতে চলে আসতে চাইবেন। কিন্তু ভারত সরকার আগেই সে পথ বন্ধ করে রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহনজী নিজে পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু। ২০০৩-এ পার্লামেন্টে উদ্বাস্তুদের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গত জুন মাসে শেখ হাসিনা যে ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছেন, সে সম্পর্কে এক ইঞ্চি মন্তব্য করেই ১০০ ইঞ্চি পিছিয়ে এলেন।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন হয়ে যাবার পরে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' বাদ দিয়ে এবং 'বিসমিল্লাহ্ ...' যুক্ত করে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ও আদিবাসীদের বুঝিয়ে দিলেন যে, এ সংবিধান এবং এ দেশ তাদের নয়। শেখ হাসিনা একটু ঘুরিয়ে সেই কথাই বললেন।

২০০১-এর নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই বাংলাদেশে অজস্র নারকীয় ঘটনা ঘটেছে। রাজশাহীর ১৭ বছর বয়স্কা রেখা রাণীকে ৮ জন বিএনপি ক্যাডার এক সঙ্গে ধর্ষণ করতে এলে রেখার মা শিপ্রারাণী ওদের পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করেছিল, '... তোমরা একজন করে আস।'

বিএনপি সরকারের শাসনে হিন্দুদের উপর সংঘটিত অত্যাচার সম্পর্কে মি. গাফ্‌ফার চৌধুরী লিখেছিলেন, ''বর্তমান বাংলাদেশে যারা ক্ষমতাসীন তাদের অনেকেই সজ্ঞানে দেশের পিতৃ-হত্যার অপরাধীদের সঙ্গে জড়িত এবং তাদের রক্ষক। মাতৃভূমিতে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের যে রেকর্ড তারা সৃষ্টি করেছে, তা প্রাচীন গ্রীসের রাজা ইডিপাসের মায়ের সঙ্গে সহবাস করার তুল্য পাপ।'' ('দৈনিক স্টেট্‌সম্যান', জুলাই ২০, ২০০৪, পৃ-৭)

বাংলাদেশের বেশ কিছু সংখ্যক লেখক-সাহিত্যিক এ সব কথা অকপটে লিখছেন। পত্র-পত্রিকায় তা ছাপা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অনেক রথী-মহারথীরা বলছেন, এ সব নিয়ে আলোচনা করলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে। এখানকার জনৈক বামপন্থী রাজনীতিবিদ এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত আচরণ করা উচিত নয়।

২০০১-এর নির্বাচনের পর একটি হিন্দু বাড়ীতে হাসেম, ইমরান, কফিল, মামুনরা ২৫/৩০ জন সন্ত্রাসী ধর্ষণ করতে আসে। তারা হাতে বাঁশ দিয়ে তৈরী ছোট ছোট ফালি নিয়ে এসেছিল। এগুলো দিয়ে যা করেছে, তা কোন সুস্থ লোকের পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ২০০৩-এর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেও একদল মৌলবাদী নরপশু বাংলাদেশে মোড়েলগঞ্জের বহরবুনিয়া গ্রামে স্বামীকে বেঁধে রেখে এক সন্তানের 'যুবতী-মা' সবিতা হালদারকেধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলেছে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ ও ৮ জুন, ২০০৩) ওখানকার 'কিলিং স্কোয়াড' নামে একটি খতম বাহিনী ২০০৩-এর নভেম্বরে চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে ৪ দিনের শিশু সহ ১১ জন হিন্দুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। ২০০৪-এর ১৭ মার্চ গভীর রাতে কান্দিউড়ার কবিরাজ পরিতোষ দাসকে জবাই করে উঠানে ফেলে রেখে যায় সন্ত্রাসীরা। (দৈনিক স্টেটসম্যান, ৮. ১.'০৫)

তখন হিন্দুরা ভেবেছিলেন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে প্রথমেই তিনি কঠোর হাতে এই পাশবিক অত্যাচার বন্ধ করবেন। ২০০৮-এর নির্বাচনে হিন্দুরা একতরফা ভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দিলেন। ক্ষমতায় এলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু হিন্দুদের উপর জঘন্য অত্যাচার বন্ধ হয়নি। শিশুকন্যা ধর্ষণ, যুবতীদের গণধর্ষণ সহ যাবতীয় অত্যাচারই চলছে। আমগ্রামের ৮ বছরের কিশোরী ধর্ষিতা হয় ২০ মে (২০১০) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। নড়াইল জেলার গাছবেড়িয়া গ্রামের বিধান বিশ্বাসের ৫ বছরের শিশু কন্যা প্রথম শ্রেণির ছাত্রী বিউটিকে ১২ মার্চ (২০১০) রাতে ২৭ বছর বয়স্ক বাদশা মোল্লা ধর্ষণ করে। পটুয়াখালি জেলার বাউফল থানার লেহালিয়ার কাছে ২০১০-এর ১৯ মার্চ সন্ধ্যা ৭-টা নাগাদ ১৬ বছরের এক হিন্দু মেয়েকে ৮ জন (বেশিও হতে পারে) মুসলিম গুণ্ডা গণধর্ষণ করে। এদের মধ্যে ৪ জন বি-এন-পির যুব দলের সশস্ত্র ক্যাডার।

বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ হত্যা, লুঠ, আগুন লাগানো এবং নারী ধর্ষণের সহস্রাধিক ঘটনার রেকর্ড আছে আমাদের কাছে। এ সব রেকর্ড ভারত সরকারের কাছেও আছে; নিশ্চিত ভাবেই আছে। অথচ ভারত সরকার ২০০৩-এর ডিসেম্বর মাসে পাশ করিয়ে নিলেন 'নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০০৩'। বিলটি লোকসভায় পাশ হয়ে গেল ২২ ডিসেম্বর (২০০৩) কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই। এটি তখন আইনে পরিণত হয়। এই আইনের বিশেষ ক্ষতিকর দিকগুলো হচ্ছে —

১৯৪৮-এর ১৮ জুলাই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিদেশ থেকে (এর মধ্যে বাংলাদেশও আছে) হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান ভারতে এসে এখনও সরকারের দেওয়া নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট পাননি তাদের সকলকে অবৈধ আগন্তুক [Illegal Migrants] বলে চিহ্নিত করা হবে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে জোর করে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে ফেরত

পাঠাবার চেষ্টা করা হবে, তা তারা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ যা-ই হোক না কেন। পাকিস্তান বা বাংলাদেশে আমাদের মা-বোনেরা হাজার বার ধর্ষিতা হলেও ভারতে এসে আশ্রয় নিতে পারবেন না। অথচ জাতিসঙ্ঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক শাখার বিধান অনুসারে উদ্বাস্তু জনগণকে তাঁদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে হবে। **অনিচ্ছুক কোন উদ্বাস্তুকে তার জন্মভূমিতে ফেরত পাঠানো যাবে না।**

এ সব তথ্য অন্ধকার কুঠুরীতে বন্ধ রেখে ভারত সরকার ২০০৩-এ পাশ হওয়া নাগরিকত্ব বিল বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে মুজিব-তনয়া শেখ হাসিনা তাঁদের সংবিধানে বহাল রাখলেন 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' এবং 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম'। নিশ্চিতভাবে তিনি পাকিস্তানের পথে যাত্রা করলেন। গত ডিসেম্বরে সংখ্যালঘুদের শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার নাম করে 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ভিত্তিক একটি আইন পাশ করে ঐ ধ্বংসাত্মক পথে যাত্রা করার প্রমাণ রাখলেন। নিছক চক্ষুলজ্জার কারণে ম্যাডাম হাসিনা সংবিধানে ধর্মনিপেক্ষতা শব্দটি ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু তিনি যেদিন ক্ষমতা হারাবেন সেদিনই বাংলাদেশ পুরোপুরি মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে যাবে। ক্ষমতা না হরালেও পরবর্তী টার্মে তাঁকেই ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি মুছে ফেলতে হবে। এ কথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সোনিয়াজী কিংবা শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীর বিন্দুমাত্র অজানা নয়। তবু সোনিয়াজী ঢাকা গিয়ে সেখ হাসিনার কাজকর্মকে সমর্থন জানিয়ে এলেন। গত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে গেলেন প্রধামমন্ত্রী মনমোহন সিং।

এমন একটি অবস্থায় আমাদের এই বই-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যার জন্য আমরা উদ্বাস্তু হয়েছি, সেই ১৯৪৭-এর ভারত বিভাজনের মূল কারণ ব্যাখ্যা করা এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যে সকল হিন্দু-বৌদ্ধ সহ অন্যান্য অমুসলমানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছেন তাদের দুর্গতির কথা পৃথিবীবাসীকে জানানো।

আমরা সাধ্য মতো নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। তবু কারও কাছে যদি কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তবে অনুগ্রহ করে জানাবেন। এই সংস্করণে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রুফ দেখার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, কমলা কান্ত বণিক, অনিমেষ মেহ্‌তা, কুমারী যুঁই সাহা এবং শ্রীমতি রিনা চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরে চির শুভার্থী হিসেবে আমাকে উৎসাহ যুগিয়ে আসছেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, ড. দীনেশ চন্দ্র সিংহ, অ্যাডভোকেট রত্নেশ্বর সরকার, অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, ডা. হরিপদ সিকদার, শ্রীমাণিকলাল রায়, শ্রীচঞ্চল দেবনাথ এবং আরও অনেকে তাদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি এবং আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। নমস্কার সহ—

১২.০১.২০১২ শ্রীদেবজ্যোতি রায়

আমরা চাই এই বইটি ইংরেজী এবং হিন্দি সহ অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হোক। এ ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি। যোগাযোগ- 9830996566

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের

মহানায়ক



শেখ মুজিবুর রহমান

মহান শুভার্থী



শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

শ্রেষ্ঠ সারথী



শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতার

এই মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বে শেখ মুজিবুর রহমান একমাত্র মুসলিম রাজনীতিবিদ যিনি ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিলোপ সাধনে বদ্ধপরিকর। —শ্রী সুতার

অন্তরালের যোদ্ধা



শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সুতার

শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, 'শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সুতার যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন, তা যদি পাক সরকার জানতে পারতো তাহলে তাঁকে দশ বার ফাঁসি দেওয়া হত।'

—দি স্টেটসম্যান, ১৯-১১-২০০১

যে সব নর-দানবের নির্দেশে ১৯৭১-এ বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ বাঙালি খুন হয়েছেন এবং ৩ লক্ষ মা-বোনেরা ধর্ষিতা হয়েছেন—



শিল্পীর চোখে
আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খান



৭১-এর কুৎসিত রাজাকার চট্টগ্রামের
সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী।



জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা
মাওলানা আবু আলা মওদূদী



৭১-এর নৃশংস রাজাকার
দুনিয়াব্যাপী ওয়াজ করনেওয়ালা
দেলোওয়ার হোসেন সাঈদী

সেদিন খুন, ধর্ষণ এবং অন্যান্য ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালির সিংহভাগ ছিলেন হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু।

প্রকাশকের নিবেদন

গবেষক-প্রাবন্ধিক শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের 'কেন উদ্বাস্তু হতে হল'-র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের শুভ লগ্নে প্রকাশক হিসেবে দু'একটি কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করছি। ভারতে বাঙালি উদ্বাস্তু সমস্যার উৎসভূমি ১৯৪৭-এর ধর্মভিত্তিক, ভাষান্তরে সাম্প্রদায়িক দেশ-ভাগ। পৃথিবীতে ধর্ম নিয়েই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি তর্ক-বিতর্ক এবং তার সঙ্গে রক্তপাত হয়েছে। ধর্মান্ধতার ফলেই এই উপমহাদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারীধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। ধর্মের সংজ্ঞা নির্নয় করা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিতে এই জটিলতার কারণেই ভারত একাধিকবার ভাগ হয়েছে। আজকের ভারতে যত মন্দির ধ্বংস হয়েছে এবং গণতন্ত্রের মন্দির পার্লামেন্ট আক্রমণ সহ যত পাশবিক ঘটনা ঘটে চলেছে তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ধর্মের জটিলতা।

আজ ২০১২-এর ১২ জানুয়ারি। আমার সৌভাগ্য দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্রবিদ স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০-তম জন্মদিনে এই লেখাটি লিখছি। আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে স্বামীজী ধর্ম এবং পাপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম এবং ভেদ-দর্শনই পাপ।' স্বামীজী এই সংজ্ঞাটি নিয়েছেন ভারতের মাটিতে রচিত 'মহাভারত' থেকে। পাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের সকলকে গুরু গোবিন্দ সিং হতে বলেছিলেন। আমরা যদি তা পারতাম তাহলে ভারতের মাটিতে এক পলকের জন্যও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। সাত চল্লিশের দেশ-ভাগ হত না। উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হত না। আমাদের নেতাদের কপটতা বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতে হত না। তথাকথিত সাধু-সন্তরা ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে নির্জীব করে হিন্দুদের দুর্বল জাতিতে পরিণত করতে পারতেন না। একাত্তরে বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ বাঙালিকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হত না। ৩ লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষিতা হতে হত না। ভাগ্যের পরিহাস, না আমাদের পূর্ব-পুরুষের অজ্ঞতা জানি না, পরপীড়ন করাই যাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, তাদের চিহ্নিত করার এতটুকু চেষ্টা করা হয়নি। আজও হচ্ছে না। বরং ইতিহাসের নামে 'অপ-ইতিহাস' পড়ানো হচ্ছে। এর ফল হয়েছে মারাত্মক।

বাংলাদেশের ফরিদপুর জিলার একটি গ্রামে আমার জন্ম ১৯৭০-এর শেষে। একাত্তরের ২৫ মার্চ তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট মি. ইয়াহিয়া খান দেশ রক্ষার নামে সার্বিক গণহত্যা শুরু করেন। আগস্ট থেকে শুরু করেন এক তরফা হিন্দু নিধন। শেখ মুজিবের হিসেবে ৩০ লক্ষ বাঙালি খুন হয়ে যায় ঐ বছর। তার মধ্যে ছিলেন অজাতশত্রু গেরুয়াবসনধারী আমার ঠাকুর্দা। তাঁর একমাত্র অপরাধ তিনি হিন্দু। পিঠে গুলির ক্ষত নিয়ে বাবা কোনো প্রকারে এদেশে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু ঐ ক্ষত শুকোবার আগেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর অবস্থা ছিল আরও করুণ।

সেদিন ১ কোটি বাঙালি ভারতে এসে প্রাণ বাঁচান। তাদের মধ্যে মুসলমান ছিলেন

মাত্র ৫ লক্ষ ৪১ হাজার। বাকী ৯৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসী। এদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমার মতো দুগ্ধপোষ্য শিশুর সংখ্যা লক্ষাধিক তো ছিলই। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ ৪১ বছর।

১৯৪৬ থেকে আজ পর্যন্ত ঠিক কি কারণে আমরা জন্মজন্মান্তরের মাতৃভূমি ছেড়ে এ দেশে চলে আসছি, এর জন্য দায়ী কে, কী এর প্রতিকার তা নিয়ে কোনো সেমিনার বা বিতর্ক হয়েছে বলে শুনিনি। কোনো নাটক বা সিনেমা হয়েছে বলেও শুনিনি। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার গর্বে গর্বিত ভারত সরকার কোন নীতিবোধের নিরিখে আমাদের অনুপ্রবেশকারীর জীবন যাপন করতে বাধ্য করছেন? আমাদের বিশ্বাস ১৯৬০-র পরে যাদের জন্ম, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে তাদের এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে দেওয়া হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক কোনো অসৎ চক্র এর পেছনে নেই, তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

লেখাপড়া শেষ করে একটি বড় মাপের সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছি দীর্ঘদিন। সেখানে শিখেছি, 'আপ ভাল তো জগৎ ভাল', 'অহিংসা আর ব্রহ্মচর্য জীবনের বড় সম্পদ', 'অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে', 'সব ধর্মের মূল কথা এক' ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের লেখা আলোচ্য গ্রন্থটির ১ম ও ২য় সংস্করণ পড়ে আমার চিন্তা অন্য ধারায় প্রবাহিত হল। তাঁর পরামর্শ মতো পড়লাম কোরান, হাদিস, রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ড. আম্বেদকরের 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া' এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থ যা এই বাংলার কোনো স্কুল কলেজে পড়ানো হয় না।

এ সব গ্রন্থ পড়ে বিগত ১৩০০ বছর ধরে (৭১২-২০১০) সিন্ধুর দেবুল থেকে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা পর্যন্ত হিন্দুরা কেন দিনের পর দিন মার খাচ্ছে তার একটা স্পষ্ট ধারণা পেলাম। জানতে পারলাম ১৯৪৭-এর ভারত বিভাজনের প্রেক্ষাপট, ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং ইসলামের নামে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর গণহত্যা এবং হিন্দু নিধনের কারণ এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ। জানতে পারলাম শেখ মুজিবের সংগ্রামের প্রেক্ষাপট, অসহায়ভাবে তাঁর মৃত্যুবরণ এবং ধর্মান্ধতার দিকে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের কুৎসিত পদযাত্রার কথা।

শ্রীরায় তাঁর গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সব আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রায় সবটাই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের সব কপি অনেক আগেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে কোনো প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতা ছাড়াই। বিভিন্ন কারণে এটির পুনর্মুদ্রণ বা নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু সর্বস্তরের বাঙালি-অবাঙালি পাঠক এবং গবেষণারত অনেক ছাত্র-ছাত্রী বারবার তাগিদ দিচ্ছিলেন এটির পুনর্মুদ্রণের জন্য। তাই আমরা এটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশ করছি। যুব সমাজের কাছে আমাদের আহ্বান — হে, আগামী দিনের ভারতের কর্ণধারবৃন্দ! এসো, নিজেরা এই গ্রন্থটি পড় এবং অপরকে পড়তে দাও। আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষায় ব্রতী হও।

নমস্কার ও শুভেচ্ছান্তে —

১২.০১.২০১২ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস



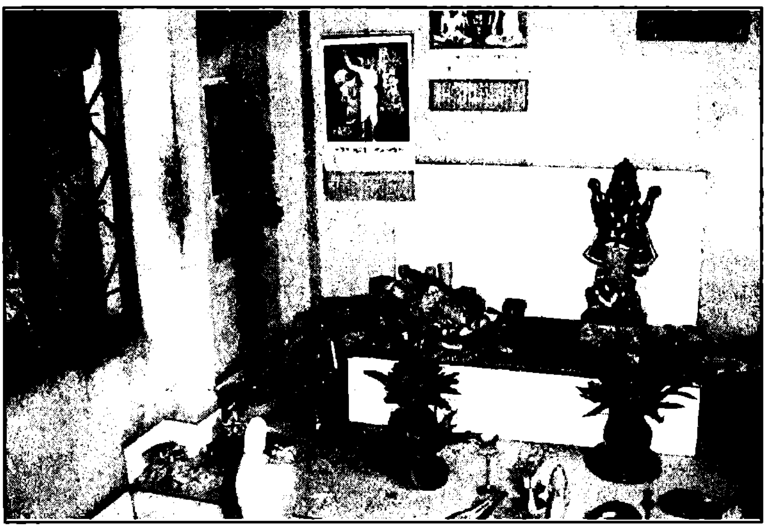
বাঁদিকে: ইরাকের বিন কাশিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু আক্রমণ করে ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের মাথাটি কেটে সোনার থালায় রেখে পাঠিয়ে দিয়েছেন হাজ্জাজের কাছে। ডানদিকে : কাশিমের সর্বশেষ উত্তরসূরী পাকিস্তানের নবীন জঙ্গী মহম্মদ আজমল কাশভ।



পাকিস্তানের একদল তুখোর জঙ্গী ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর মুম্বাই আক্রমণ করে এবং ওখানকার বিখ্যাত তাজ হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। জীবিত অবস্থায় ২১ বছরের আজমল কাশভকে আটক করা সম্ভব হয়। আজও তার বিচার সম্পূর্ণ হয়নি।



বহিরাগত আক্রমণকারী সুলতান মাহমুদ ১৭বার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি সোমনাথ মন্দিরের কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুঠ করে মন্দিরটি ধ্বংস করে দেন। এই ছবিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐ মন্দিরের।



২০১০-এর ৭ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা এলাকায় কার্তিকপুর বাজারে অবস্থিত কালী-শনি মন্দিরের সব প্রতিমা ভেঙ্গে দিয়ে তার উপর প্রস্রাব করে দেয় মৌলবাদী দুবৃর্ত্তরা। মন্দিরের দেওয়ালে ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের ছবি শোভা পাচ্ছে।

প্রেক্ষাপট

(১৮৮৫-১৯৪৫)

> **মহানবী হযরত মোহাম্মদ বলেছেন —**
> **"তোমাদের জানা উচিত এই পৃথিবীর মালিক আল্লা এবং তাঁর রসুল।"**
> **(হাদিস নং-৪৩৬৬, সহি মুসলিম, ৩/৯৬৩)**

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এর ২১ বছর পরে ১৯০৬-এর ৩০ ডিসেম্বর বিশ্বের সেরা কূটকৌশলী বৃটিশ শাসকদের সরাসরি মদতে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল 'মুসলিম লীগ'।

তিন বছরের শিশু মুসলিম লীগ ১৯০৯-এ বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আদায় করে নিয়েছে। ১৯১৬-এ লখনৌ চুক্তি স্বাক্ষর করে কংগ্রেস ঐ ধ্বংসাত্মক নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেয়। এর এক বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯১৯-এ তিনি ঘোষণা করেন যে, হিন্দু মুসলমানদের ঐক্য গড়ে মাত্র ৬ মাসের (মতান্তরে ১ বছর) মধ্যেই স্বরাজ এনে দেবেন। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক পরাজয় যাত্রা। এই পরাজয় যাত্রা শেষ হয় ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ কূটকৌশল এবং মুসলিম রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

অহিংস রাজনীতির আবিষ্কারক গান্ধীজী গীতার মধ্যে অহিংসা ছাড়া কিছু খুঁজে পাননি। পৃথিবীর কোন মুসলিম পণ্ডিত যে কোরানের মধ্যে অহিংসার কোন বিধান খুঁজে পাননি, গণতন্ত্র ও বিশ্বজনীন মানবাধিকার বর্জিত যে কোরানের ভিত্তিভূমি সীমাহীন আনুগত্য ও সামরিক শৃঙ্খলা গান্ধীজী সেই কোরানেও খুঁজে পেলেন অহিংসা। তাঁর দাবি তিনি একাধিকবার কোরান পড়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত, কোরানের শিক্ষা মূলত অহিংসার পক্ষে (স.গ্রন্থ-০৫ ; পৃ-৮২)। গান্ধীজী ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ। মুসলিম জনগণকে তিনি ভাই বলে গ্রহণ করেছিলেন। স্বরাজ লাভের জন্য তিনি ১৯২০-এর ৮ আগষ্ট অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। তার আগের বছর মুসলমানরা শুরু করেছিলেন সহিংস খিলাফত আন্দোলন। এই আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুদের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ ছিল না। তবু গান্ধীজী এই আন্দোলনকে মনে প্রাণে সমর্থন করে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। কথা ছিল মুসলমানরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা' করেননি। তাঁরা যোগাযোগ করেছেন ব্রিটিশদের সঙ্গে। এর ফলে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ১৯২৯-এর মার্চ মাসে মি. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৯) মুসলমানদের

অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৪ দফার একটি দাবি পেশ করেন। **১৯৩০-এর ২৯ ডিসেম্বর দার্শনিক কবি বলে পরিচিত মুসলিম রাজনীতিবিদ আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমি দাবি করেন।**

অন্যদিকে ১৯১৮-এ বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) রাজনীতির জগতে প্রবেশ করেন। তথাকথিত অস্পৃশ্য এই মাহার সন্তান ব্যাপক পড়াশোনা করে ঘোষণা করলেন যে, ভারতের দুর্বলতার মূল কারণ হিন্দু সমাজের বিদ্যমান জন্মভিত্তিক জাত-ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা। তিনি এই দু'টো মহাপাপের বিলুপ্তি দাবি করলেন। তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য লেখাপড়ার সুযোগ চাইলেন। এরই সঙ্গে চাইলেন সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং আসন সংরক্ষণ সহ যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা। তিনি সকল ধরনের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করলেন। কিন্তু কংগ্রেস বা গান্ধীজী বাবাসাহেবের কথার কানাকড়িও মূল্য দিলেন না। 'তোমরাও হিন্দু, আমরাও হিন্দু', 'তোমরা ভগবানের পুত্র (হরিজন)', 'অস্পৃশ্যতা মহাপাপ' — এই সব সুন্দর সুন্দর কথা বলে অস্পৃশ্যদের দাবি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বাধ্য হয়ে বাবাসাহেব অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা দাবি করলেন; তাও ১০ থেকে ২০ বছরের জন্য। ১৯৩২-এ বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই দাবি মেনে নেন। এর বিরুদ্ধে গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করেন। পরে একটি চুক্তির মাধ্যমে (পুণা চুক্তি, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) অস্পৃশ্যদের জন্য আসন সংরক্ষণসহ যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়। মুসলমানদের জন্য চালু থাকে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা। **এই ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থাই ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের অন্যতম মুখ্য কারণ।**

১৯৩২-এর ১৭ নভেম্বর লন্ডনে শুরু হয় তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক। কংগ্রেস নেতৃত্ব ঘোষণা করেন যে, তাঁরা এই বৈঠক বর্জন করবেন। বাবাসাহেব ছুটে গেলেন গান্ধীজীর কাছে। বললেন, 'আপনি বৈঠকে চলুন। অন্যথায় ইকবালের মত দেশদ্রোহীরা পাদ প্রদীপে চলে আসবে। ইকবালের মতো দার্শনিক-কবিকে বাবাসাহেব সেদিন 'দেশদ্রোহী' বলেছিলেন *। কারণ, এক সময়ের 'ভারত প্রেমিক' কবি ইকবাল জার্মানী গিয়ে ইসলাম শাস্ত্র সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশুনা করে ফিরে এসে 'ইসলাম-প্রেমের' গান লিখেছেন — 'আমরা মুসলমান, সমগ্র পৃথিবীই আমাদের। ['The Tragic Story of Partition - H.V. Seshadri, 1984, p-121] ভারতে ইনিই 'কোরান ভিত্তিক মুসলিম আবাসভূমি' পরিকল্পনা দাঁড় করান। সেদিন একমাত্র ড. আম্বেদকরই ইকবালের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের 'দেশদ্রোহী'

---

* "I want to request you to give up civil disobedience and to join the Round Table Conference. The point is that if you do not come, we shall get nothing in England and everything will be upset. People like Iqbal who are enemies of the country will come to the forefront." [The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol-51, page- 462.]

হিসেবে চিহ্নিত করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

বিভিন্ন কারণবশতঃ মুসলিম লীগের আন্দোলনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে প্রায় অজ্ঞ এবং প্রবল আত্মবিশ্বাসী মি. জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের ধ্বংস কামনা করে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে লন্ডনে চলে যান। পরে ১৯৩৪-এ নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান (১৮৯৫-১৯৫১) কবি ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) পরিকল্পিত কোরান ভিত্তিক মুসলিম আবাসভূমি-তত্ত্ব নিয়ে লন্ডনে যান জিন্নাহ্ সাহেবকে বোঝাতে যে, কোরান অনুসারে 'জেহাদ' পরিচালনা করতে পারলে আমরা নিজস্ব আবাসভূমি আদায় করে নিতে পারব। জিন্নাহ্ সাহেব ব্যাপারটা বুঝলেন এবং ফিরে এলেন ভারতে। এ এক নতুন জিন্নাহ্। ড. আম্বেদকরের ভাষায় — "তিনি (মি. জিন্নাহ্) কেবল মাত্র ইসলামে বিশ্বাসী হয়েই থেমে যাননি, এখন তিনি ইসলামের জন্য মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত। আজ শুধুমাত্র কলেমা-ই নয়, ইসলাম ধর্ম-তত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেছেন তিনি। আজ মসজিদে গিয়ে খুৎবা-পাঠ শুনেই ক্ষান্ত হন না, তিনি ঈদ উৎসবে যোগদান করে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। .... বোম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সভা শুরু হয় 'আল্লাহু আকবর' এবং 'কায়েদ-ই-আযম জিন্দাবাদ' — এই দু'টো ধ্বনি দিয়ে এবং প্রতিটি সভা শেষ হয় এই দু'টো ধ্বনি দিয়েই। (স.গ্র.-০১, ৮ম/পৃ-৪০৭)

ব্রিটিশদের সরাসরি মদতে মি. জিন্নাহ্ সেদিন ভারতের প্রতিটি মুসলমানের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন কোরানে বর্ণিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের বার্তা। এই ধ্বংসাত্মক তত্ত্বকে ভিত্তি করে মুসলিম লীগ ভারত বিভাজন দাবি করে ১৯৪০-এর ২৩ মার্চ। **এই উপমহাদেশে উদ্বাস্তু সমস্যার বীজ বপন করা হয় ঐ দিনেই। সর্বশেষে শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন সরকার নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল-২০০৩ পাশ করে উদ্বাস্তু সমস্যাকে স্থায়ী করে দেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীও উদ্বাস্তু সমস্যাকে স্থায়ী রূপ দিতে চান বলে মনে হচ্ছে।**


শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী



কবি ইকবাল লিখেছেন —

"চীন ও আরব আমাদের,
আর মোদের হিন্দুস্থান,
সারা দুনিয়াই মোদের স্বদেশ,
আমরা মুসলমান।"

তবু নাকি ইকবাল শ্রেষ্ঠ ভারত প্রেমিক !!

উদ্বাস্তু স্রোতের প্রথম ধাপ

(১৯৪৬-১৯৫৮)



"এ কথা সন্দেহাতীত যে, (**পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে**) সংখ্যালঘু বিনিময়ই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকার।" — **ড. আম্বেদকর।**

"লোক বিনিময়ের কথা আমি ভাবতেই পারছি না।" — **গান্ধীজী।**

১৯৪০-এর ২৩ মার্চ। বেলা ৩ টা। মি. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশন বসল লাহোরে। বেলা ৩-৪৫ মিনিটের সময় বাংলার জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক্ (হক্ সাহেব) সভা মণ্ডপে প্রবেশ করেন এবং একটু পরেই তিনি 'ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। এটি আসলে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'। প্রস্তাবটি পাশ হয় ২৬ মার্চ, মতান্তরে ২৩ মার্চ। এই প্রস্তাবে মুসলিম লীগ ভারতের সকল মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমি দাবি করে। মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালি এবং অসাম্প্রদায়িক বলে পরিচিত হক্ সাহেব কোন অবস্থায় তাঁর নিজের হাতে গড়া নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা পার্টির কর্মসূচী শিকেয় তুলে রেখে মুসলিম লীগে যোগদান করে এই চরম সাম্প্রদায়িক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা অনেকেরই বুদ্ধি বিবেচনার বাইরে। মুসলিম লীগের মূল বক্তব্য ছিল, হিন্দু ও মুসলিম সম্পূর্ণ ভাবে দু'টি আলাদা জাতি। **এরা একই দেশে একত্রে বসবাস করতে পারে না।** (স. গ্র. ৯/পৃ-৪৩৪) এর উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন, "দ্বি-জাতি তত্ত্ব অসত্য।" (স.গ্র-৫/পৃ-২৬৮) সেদিন কংগ্রেসের প্রায় সব নেতাই বলেছিলেন, হিন্দু এবং মুসলমান আলাদা জাতি নয়। তাই মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির প্রশ্ন ওঠে না। হিন্দু মহাসভার বীর সাভারকার বলেছিলেন — 'হ্যাঁ, হিন্দু ও মুসলমান দু'টি আলাদা জাতি। কিন্তু এঁরা একত্রে একই দেশে বসবাস করতে পারেন। তাই ভারত বিভাজনের প্রয়োজন নেই। বিভাজনের এই প্রচেষ্টাকে যে কোন ভাবে প্রতিহত করা হবে'। সেদিন এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. আম্বেদকর খানিকটা নতুন কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, বিগত কয়েক শত বছরের মধ্যেও ভারতবাসী একটি জাতি হিসেবে গড়ে ওঠেনি। অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতেও ভারতের হিন্দু মুসলমান মিলে একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে, তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। এরা একই মাতৃভূমির একই সন্তান হিসেবে বেড়ে উঠবে তা' মিথ্যা আশা মাত্র। (স.গ্র.০১, ৮ম/পৃ-৪০৬) ড. আম্বেদকর ব্যক্তিগত ভাবে অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মীয় বিধি-বিধান, মুসলমান নেতাদের মানসিকতা

এবং তাঁদের রাজনৈতিক কৌশল (strategy) এবং সর্বোপরি ভারতের প্রতিরক্ষার সমস্যা বিবেচনা করে তিনি ভারত বিভাজনের পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। তবে সে ক্ষেত্রে তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য ছিল '**একই সঙ্গে পাঞ্জাব এবং বাংলাকেও ভাগ করতে হবে এবং প্রস্তাবিত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় করতে হবে।**' তাঁর মতে, "এ কথা সন্দেহাতীত যে, সংখ্যালঘু বিনিময়ই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের পক্ষে স্থায়ী প্রতিকার"। (স.গ্র.-১, ৮ম/১১৬) সেদিন অধিকাংশ হিন্দু রাজনীতিবিদ্ এই বক্তব্যের সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। গান্ধীজী সেদিন বলেছিলেন, "লোক বিনিময়ের কথা আমি ভাবতেই পারছি না। আমি মনে করি উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রস্তাব।" (স.গ্র.-৯/ পৃ-৪৩৭) তিনি আরও বলেছিলেন, "ভারত থেকে সব মুসলিম এবং পাকিস্তান থেকে সব হিন্দু ও শিখদের বিতাড়ন মানে যুদ্ধ, দেশের চিরকালীন ধ্বংস।" (স.গ্র.-০৫/ পৃ-২৬৯) তবে গান্ধীজী মাঝে মধ্যে দু'একবার অন্য ধরনের কথাও বলেছেন। ১৯৪৭-এর ২৬ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লীর এক প্রার্থনা সভায় তিনি বলেছিলেন, "হিন্দু এবং শিখ যাহারা ওখানে আছে তাহারা যদি আর সেখানে থাকিতে না চায় তাহা হইলে তাহারা যে কোন ভাবে এখানে আসিতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারত সরকারের প্রথম কর্তব্য হইবে তাহাদের জন্য কাজের সংস্থান করা এবং তাহাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় করা।" (স.গ্র.-৩৫, ৮৯তম/পৃ-২৪৬)

দৃপ্তকণ্ঠে লোক বিনিময়ের দাবি তোলার জন্য সেদিন অনেকে ড. আম্বেদকরকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালও দিয়েছেন। অনেকেই সেদিন তাঁকে ব্রিটিশদের দালাল এবং মুসলিম লীগ ঘেঁষা বলে অভিহিত করেছিলেন। আজও সে গালাগালের অবসান হয়নি। মুসলিম ধর্মশাস্ত্র এবং মুসলিম রাজনীতির কৌশল ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার জন্যই এমনটি ঘটেছিল এবং এখনও ঘটছে।

ড. আম্বেদকর 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব্ ইণ্ডিয়া' শীর্ষক একটি বই লিখে মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের বিধি-বিধান, মুসলমান আক্রমণকারীদের নৃশংস অত্যাচার এবং ১৯০৬-এ ভারতের মুসলিম লীগের জন্ম থেকে শুরু করে ১৯৪০ পর্যন্ত মুসলমানদের রাজনীতির কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়ে হিন্দু রাজনীতিবিদ্দের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা কোন কাজে আসেনি। সবচেয়ে বড় বাধা আসে কংগ্রেস ও গান্ধীজীর কাছ থেকে। ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদেরকে অনতিবিলম্বেই ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। চলে যাওয়ার আগে ভারত বিভাজন হোক — এটা তাঁরা চেয়েছিলেন। তাই মুসলিম লীগের নৈতিক অনৈতিক সকল কাজকেই তাঁরা সমর্থন করছিলেন। লীগকে অর্থ এবং অস্ত্র দিয়ে তাঁরা সাহায্য করতেন, এমন অভিযোগও আছে। গান্ধীজীর একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান ছিল ভারত বিভাজন বন্ধ করা। কখনও তিনি নিজের ইচ্ছামত কোরানের ব্যাখ্যা করে আবার কখনও চোখ বুজে অন্ধ সেজে 'ইসলামী প্রলয়' বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বারবার বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেছিলেন। ১৯৪৬-এ কোলকাতার মহা-

দাঙ্গা এবং নভেম্বরের নোয়াখালি ও ত্রিপুরার পাশবিক হিন্দু নিধন যজ্ঞকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছিলেন অন্ধ সেজে। ঘটনাটি ছিল এই —

মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে ব্যর্থ মুসলিম লীগ নেতা মি. জিন্নাহ্ বুঝতে পারলেন যে, নির্বাচনে জয়ী হওয়া এবং হিন্দুদের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে জেতা, দু'টোই খুব কঠিন কাজ। তাই ঐ বছর ১৬ আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের ডাক দেন। ১৯৪৬-এর ২৭-২৯ জুলাই বোম্বেতে অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের সভায় দু'টো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর দ্বিতীয়টিতে বলা হয়, 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিল গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করে যে, পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে, বৃটিশদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদে এবং ভবিষ্যতে বর্ণ হিন্দুদের দমনমূলক শাসন থেকে অব্যাহতি পেতে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামার সময় এসে গেছে। এই কাউন্সিল সমগ্র মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, তারা যেন তাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সর্বোচ্চ সংগঠন সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের পক্ষে এসে দাঁড়ান এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন।' (সহায়ক গ্রন্থ-২৫, ৮/১৩৯)

লীগ অনেক হিসেব-নিকেশ করে দেখল যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে বাংলা। কারণ, এখানকার শতকরা ৫৪.৩ জন অধিবাসী মুসলমান। প্রিমিয়ার হচ্ছেন মি. সুরাবর্দি। দাঙ্গা করার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে তার। তিনি '১৯২৬-এ নিজের শ্বশুর মহাশয়ের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য কলকাতায় দাঙ্গা বাঁধিয়েছিলেন, ... কলকাতার নিম্ন শ্রেণির দরিদ্র বেকার মুসলমান, পশ্চিমা মুসলমান, সমাজ-বিরোধী মুসলমান, সরকারী পুলিশ তো তাঁর হাতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য।' ('স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)', অমলেশ ত্রিপাঠী, পৃ-৪৪২)।

তখন রমযান মাস চলছিল। শুক্রবার, ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬। মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র দিন। এই পবিত্র দিনেই শুরু হবে পাকিস্তান আদায়ের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই উপলক্ষে লীগ সরকার যে আমন্ত্রণ-পত্র বিলি করে তাতে দিনটিকে 'মুক্তি-দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। মুসলিম লীগের একান্ত আপনজন হিসেবে মি. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯০৪-১৯৬৮) কোলকাতা ময়দানের সভা-মঞ্চে উপস্থিত থেকে তাদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন। বাংলা তফসিলী ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে যোগেনবাবু আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে সমর্থন করলেন। একটি চিঠি লিখে কোলকাতা জিলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী এস্. এম্. ওসমান সাহেবকে জানালেন — "যেহেতু মুসলিমদের প্রতি বৃটিশ সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও নিদারুণ ভাবে বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ তার প্রতিবাদের নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত লইয়াছে, সেহেতু ভারতের তফসিলী জাতি সমূহ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা ১৬ আগষ্ট শুক্রবার 'সারা ভারত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত লইয়াছে এবং তদনুসারে বাংলার তফসিলী জাতি ফেডারেশন কোলকাতা

জেলা মুসলিম লীগের ঘোষিত কার্যক্রমে সহযোগিতা করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে।" [Morning News, August 15, 1946.]

যোগেনবাবুর লেখা এই চিঠি পড়লে মনে হয় সমগ্র ভারতের তফসিলী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরাও লীগের ঘোষিত ১৬ আগস্টের কার্যক্রমের অনুরূপ ঐ তারিখে 'সর্বভারতীয় ভাবে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ' পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আসলে তেমন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এটি তাঁর নিছক বাগাড়ম্বর।

২৯ জুলাই থেকেই লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। এই প্রস্তুতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীগোপাল দাস খোসলা তাঁর 'স্টার্ণ রিকনিং'-এর ৪১ থেকে ৮৬ নং পৃষ্ঠায়। 'আমরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থা-পদ্ধতি পরিহার করছি। আমাদের হাতে পিস্তল আছে এবং তা ব্যবহার করব' — সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মি. জিন্নাহ্ বলেছিলেন এ কথা। তিনি আরও বলেছিলেন, **প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন "আমি নীতি শাস্ত্র আলোচনা করতে যাচ্ছি না"।** খাজা নাজিমুদ্দিন বলেছিলেন, 'আমরা যখন অহিংসায় বিশ্বাস করি না, তখন একশ' পথে যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারছি। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে কি বুঝায় তা বাংলার মুসলমানরা খুব ভালভাবেই জানেন।' লিয়াকত আলি খান বলেছিলেন, **"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে বুঝায় আইন ভেঙে যে কোন কাজ করা।"**

৪ আগস্ট কোলকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেটিয়াবুরুজ এবং ২৪ পরগনার লীগ নেতাদের ডেকে ১৬ তারিখের কর্মসূচীর চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় এবং সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে তা মুসলিম সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার করা হয়। কোলকাতার মেয়র তথা লীগ সম্পাদক জনাব এস. এম. ওসমানের নামে অনেকগুলি প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

একটি প্রচারপত্রে বলা হয় — "মুসলমানদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, এমন এক রমযান মাসেই কোরান নাযেল হয়েছিল। এমন এক রমযান মাসেই খোদা 'জেহাদ' করার অনুমতি দেন। এমন এক রমযান মাসেই বদরের যুদ্ধ হয়েছিল। এটিই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান নিয়ে মহানবী জয়লাভ করেছিলেন। আবার এমন এক রমযান মাসেই পবিত্র মহানবী ১০,০০০ মুসলমান নিয়ে মক্কা জয় করে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করেছিলেন; স্থাপন করেছিলেন মুসলিম কমনওয়েল্থ। মুসলিম লীগের সৌভাগ্য যে, এমন একটি পবিত্র মাসেই তারা সংগ্রাম শুরু করেছে।"

'জেহাদের জন্য প্রার্থনা' এই শিরোনামে অন্য একটি প্রচারপত্রে উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে আরও বলা হয়, "খোদার দয়ায় ভারতে আজ মুসলমানদের সংখ্যা ১০ কোটি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা আজ হিন্দু ও ব্রিটিশদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছি। হে মহান খোদা, আমরা এই রমযান মাসেই জেহাদ শুরু করছি। কসম খেয়ে বলছি - আমরা তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল; দেহে এবং মনে আমাদের শক্তিশালী কর; আমাদের সকল কাজে তুমি সাহায্য কর। কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর,

ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করার সামর্থ্য দাও এবং জেহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা দাও। খোদার দয়ায় পৃথিবীর মধ্যে আমরা যেন **ভারতকে সবচেয়ে বড় মুসলিম সাম্রাজ্যে পরিণত করতে পারি।**"

আর একটি প্রচারপত্রে ভাল, মন্দ, চোর, গুণ্ডা-বদমায়েসদেরও জেহাদে অংশ গ্রহণ করে স্বর্গে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয় এই ভাষায় — "যারা চোর, গুণ্ডা, চরিত্র বলে বলীয়ান নয়, যারা নামায পড়ে না — তারাও এসো। স্বর্গের আলোকজ্জ্বল দরজা তোমাদের জন্যও খোলা আছে। এসো আমরা হাজারে হাজারে সেখানে প্রবেশ করি। এসো পাকিস্তান আদায়ের জন্য, মুসলিম জাতির জয়ের জন্য এবং যে সব সেনারা জেহাদ শুরু করেছে তাদেরকে জয়ী করার জন্য চীৎকার করে মোনাজাত (প্রার্থনা) করি।"

তরবারি হাতে মি. জিন্নাহ্‌র ছবিসহ একটি প্রচার পত্র বিলি করা হয়েছিল। এই প্রচার পত্রে জিন্নাহ্‌ সাহেব যেন বলছেন — "স্বর্গেও ইসলামের তরবারি সূর্যকিরণের ন্যায় জ্বলজ্বল করবে এবং সব অশুভ পকিল্পনাকে নস্যাৎ করে দেবে। আমরা মুসলমানরা রাজমুকুট পরে দেশ শাসন করেছি। উৎসাহ হারিও না। প্রস্তুত হও এবং হাতে অস্ত্র তুলে নাও। হে মুসলমানগণ, একবার ভেবে দেখো আজ আমরা কাফেরদের অধীন। কাফেরদের ভালবাসার পরিণাম ভাল নয়। হে কাফেরগণ! সুখ বা গর্ব অনুভব কর না। তোমাদের শেষ বিচার বেশি দূরে নয়। সার্বিক ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। আমাদের হাতের তরবারির দ্বারা জয়ের বিশেষ শিরোপা অর্জন করব।"


মি. এম. এ. জিন্নাহ্‌

তিন দিন ধরে কলকাতার বুকে চলে হিন্দু ও শিখ হত্যা। পৃথিবী অবাক হয়ে দেখলো বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উপর কোলকাতার সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা অবাধে চালাচ্ছে হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ। অবশ্য তিন দিন পরে হিন্দুরাও কিছুটা প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। ইতিহাস ইতিমধ্যেই এই নারকীয় ঘটনাকে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' বলে চিহ্নিত করেছে। সেদিন নিহত হয়েছিলেন পাঁচ থেকে ছ'হাজার নিরপরাধ মানুষ। লর্ড ওয়াভেল বলেছেন, পলাশীর যুদ্ধে যত লোকের মৃত্যু হয়েছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়েছে কোলকাতার দাঙ্গায়। (অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ... পৃ-৪৪৩)

শহরে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল পুলিশ কেন্দ্রগুলোতে। এদের রাখা হয়েছিল হত্যালীলা থামাতে নয়, প্রতি আক্রমণ বন্ধ করার লক্ষ্যে। রাত ৯-টা থেকে ভোর ৫-টা পর্যন্ত কারফিউও জারি করা হয়েছিল। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭.৮.১৯৪৬) আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) জানাচ্ছেন, 'সমগ্র কোলকাতা শহরে যখন নারী পুরুষ খুন হচ্ছিল তখন পুলিশ ও মিলিটারি নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। *[India Wins Freedom,1965, page-169]*



মি. সুরাবর্দি

মি. জিন্নাহ্‌র নির্দেশে অবাঙালি প্রিমিয়ার মি. সুরাবর্দি (১৮৯২-১৯৬৩) কোলকাতায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালালেন। কিভাবে এই হত্যাকাণ্ড চালাতে হবে তার গোপন নির্দেশ দিয়ে মি. জিন্নাহ্ গান্ধীজীকে আলোচনার অছিলায় ব্যস্ত রাখলেন। পাকিস্তানের বর্তমান শাসকরা একই কৌশল অবলম্বন করছেন এখনও। পূর্বোক্ত গোপন নির্দেশটি এরূপ—

* ভারতের প্রত্যেকটি মুসলমান পাকিস্তান আদায়ের দাবিতে মৃত্যু বরণ করবে।

* পাকিস্তান আদায়ের পর সমগ্র ভারত দখল করতে হবে।

* ভারতের সকল মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে হবে।

* সমগ্র পৃথিবীতে ব্রিটিশ ও আমেরিকা যে আধিপত্য বিস্তারের কর্মসূচী নিয়েছে, মুসলিম বিশ্বকে তার সঙ্গে হাত মেলাতে হবে।

* পাঁচজন হিন্দু যে অধিকার ভোগ করছে, একজন মুসলমানকে সেই অধিকার ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ পাঁচজন হিন্দুর সমান একজন মুসলমান।

* যতদিন পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি নিয়ে যেতে হবে।

* হিন্দু মালিকানাধীন সব কারখানা ও দোকান পুড়ে ধ্বংস করে দিতে হবে, লুঠ করতে হবে এবং লুঠের মাল লীগ অফিসে জমা দিতে হবে।

* সকল মুসলিম লীগ সদস্য সঙ্গে অস্ত্র রাখবে।

* জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা যদি লীগে যোগদান না করে তবে তাদেরকে গোপনে খুন করতে হবে।

* হিন্দুদের সংখ্যা কমাবার জন্য তাদেরকে অবিরত ভাবে খুন করে যেতে হবে।

* সব মন্দির ধ্বংস করে দিতে হবে।

* ভারতের প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে (জিলায়) মুসলিম লীগের গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিতে হবে।

* গোপনে প্রতি মাসে একজন করে কংগ্রেসীকে খুন করতে হবে।

* মুসলিম গেস্টাপো বাহিনীর এক একজনকে দিয়ে কংগ্রেসের বড় অফিসগুলি ধ্বংস করে দিতে হবে।

* ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে করাচী, বম্বে, কোলকাতা, মাদ্রাজ, গোয়া, বিশাখাপত্তম প্রভৃতি শহর অচল করে দিতে হবে। এ কাজের দায়িত্বে থাকবে মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।

* কোন মুসলমানকেই হিন্দুর অধীনে সেনা বা নৌ-বাহিনীতে কিংবা সরকারী বা আধা-সরকারী অফিসে চাকুরী করতে দেওয়া হবে না।

* চূড়ান্ত আক্রমণের লক্ষ্যে সমগ্র ভারত ও কংগ্রেস সরকারের মধ্যে অন্তর্ঘাত চালিয়ে যেতে হবে।

* এ সব কাজে অর্থ জোগাবে মুসলিম লীগ .....

* বম্বে, কোলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, লাহোর, করাচী প্রভৃতি শহরের মুসলিম লীগ অফিসে সব অস্ত্র-শস্ত্র পৌঁছে দিতে হবে।

* হিন্দুদেরকে ভারত ছাড়া করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের সকল শ্রেণির সদস্যরা সব সময়ের জন্য অস্ত্র বহন করবে; অন্তত পকেটে রাখার মত একটি ছোরা।

* সকল প্রকার যান-বাহন হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে।

* আগামী ১৮ অক্টোবর (১৯৪৬) থেকে হিন্দু মহিলা ও মেয়েদের ধর্ষণ করবে, অপহরণ করবে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করবে।

* হিন্দু সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে হবে।

* সকল লীগ সদস্যকে সব সময়ের জন্য হিন্দুদের ব্যাপারে নিষ্ঠুর হতে হবে এবং তাদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সব ব্যাপারেই বয়কট করতে হবে।

* কোন মুসলমান কোন হিন্দুর দোকান থেকে কিছুই কিনবে না। হিন্দুর তৈরী সিনেমা দেখবে না। মুসলিম লীগের সব সদস্যই এই নির্দেশ মেনে চলবে এবং ১৯৪৬-এর ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজে নেমে পড়বে।

(উৎস ঃ পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গোপালদাস খোসলার 'Stern Reckoning', New Delhi- 110 001, পৃ- ৩১৩-১৪।)

অবাক করা ব্যাপার হল পাকিস্তানের দাবিতে কোলকাতায় মুসলিম লীগের পরিকল্পিত নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রস্তুতি যখন ষোল কলায় পূর্ণ ঠিক সেই সময় ১৫ আগষ্ট সন্ধ্যায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কোন রূপ আমল না দিয়ে নেহেরুজী বোম্বেতে মি. জিন্নাহ্‌র বাসভবনে বসে একত্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে তোষামুদে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। জিন্নাহ্‌র মন ছিল কোলকাতার দিকে। কাজেই আশি মিনিটের এই আলোচনায় ফল হয়েছিল একটি বড় আকারের শূন্য।

'The Last Days of the British Raj'-এর লেখক লিওনার্ড মোস্‌লে কিন্তু বিদেশী হয়েও পরবর্তীকালে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর মূল্যায়ন করে বলেছেন —

"১৯৪৬ সনের আগষ্ট মাসের ঐ কুৎসিত ও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ কলিকাতাকে যে ৭২ ঘন্টার জন্য অস্থিময় কবরখানায় পরিণত করিয়াছিল উহা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, উহা নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করা ছাড়াও বেশি কিছু করিয়াছে। উহা মানুষের আশাও হত্যা করিয়াছে। উহা ভারতের আকৃতি ও ইতিহাসের গতি বদল করিয়া দিয়াছে। চৌরঙ্গী স্কোয়ারে পুরুষ, নারী ও শিশুর পুঁতিগন্ধময় মৃতদেহগুলি নর্দমায় পড়িয়াছিল যে পর্যন্ত না ভারতের বিশ্বস্ত নোংরা-পরিষ্কারক শকুন উহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। ..."

এই নারকীয় দাঙ্গার বিবরণ দিয়েই লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯০০-১৯৭৯) অখণ্ড ভারত তত্ত্বে অনড় গান্ধীজীকে ঘায়েল করে দিতে পেরেছিলেন। তিনি বলছেন, **'গান্ধীজীর একমাত্র অবদান, যা তিনি অনেক আগেই আমাকে বলেছেন, তা হচ্ছে আমি যেন ভারত-বিভাজনের কথা স্বপ্নেও না ভাবি।' আমি বললাম, 'অন্য কোন পথ পেলে আমি কোন ক্রমেই ভারত ভাগের দিকে যাবো না।'**


লর্ড মাউন্টব্যাটেন

কিন্তু 'আপনি ১৬ আগষ্টের (১৯৪৬) কথা ভুলে যাবেন না যেদিন মি. জিন্নাহ্ কেবল মাত্র মহড়া হিসাবে কোলকাতায় ৫ হাজার লোককে খুন করেছিলেন এবং ১৫ হাজার লোককে আহত করেছিলেন। আমি মনে করি মি. জিন্নাহ্‌কে মাঝ পথে থামিয়ে দিতে না পারলে তিনি 'সিভিল ওয়ার' করবেন। এ ক্ষমতা তাঁর আছে।' উত্তরে গান্ধীজী বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি।' ['Mountbatten and The Pertition of India. Collins & Lapierre, Vol. 1, 1992, p-33)]

কোলকাতার মহাদাঙ্গার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ২৮ আগষ্ট (১৯৪৬) গান্ধীজী অন্ধ এবং কালা সেজে বললেন, "এখন আমার নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়।" তিনি আরও বলেন, "আমরা ভয় ভীত হয়ে পালিয়ে যাই। এটা উচিত নয়। যারা পালিয়ে যায় ঈশ্বরের উপর তাদের বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর যখন আমাদের অন্তরে আছেন, তখন পালিয়ে যাবার প্রয়োজন কোথায়? মানুষ যখন মারা যায়, তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই এটা ঘটে। আমাদের যদি কেউ পেটায় তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরই এটা ঘটান। যে ব্যক্তি সব সময়ই ঈশ্বরের কথা ভাবে সে পালিয়ে বাঁচতে যাবে কেন?" (সহায়ক গ্র.৩৫, ৮৫তম/পৃ-২২০)

দাঙ্গার চতুর্থ দিনে হিন্দু ও শিখেরা প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ নিতে শুরু করলে সুরাবর্দি সাহেব আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেননি। তড়িঘড়ি করে নামিয়ে দিলেন পুলিশ ও মিলিটারী। থেমে গেল দাঙ্গা। এরপর ডিসেম্বর মাসে মি. জিন্নাহ্ গিয়েছিলেন লণ্ডনে। ওখানে উনি ব্রিটিশ কেবিনেটের এক মন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন হিন্দুরাই আগষ্টে কোলকাতার দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল। ('Jinnah had argued that the Hindus had organised the Calcutta riots in August.' Tranfer of Power, Vol. 9, page- 254.)। পাকিস্তানের কোন কোন ইতিহাস বই-এ এই তথ্য এখন ফলাও করে লেখা হচ্ছে। শুধু পাকিস্তানেই নয়, এই কোলকাতায়ই পাকিস্তানি ঐ সুর বাজতে শুরু করেছে। জিন্নাহ্-যোগেন্দ্র ভক্তদের কেউ কেউ ১৯৪৬-এর কোলকাতা-দাঙ্গার জন্য হিন্দুদের দায়ী করার পাঁয়তারা কষছেন।

কোলকাতা মহাদাঙ্গার পরেও হিন্দুরা ভারত ভাগের দিকে তেমন এগোচ্ছেন না। দু'একজনে বাংলা ভাগের কথা বলছেন মাত্র। কি করা যায়? হ্যাঁ, আর একটা হিন্দু গণহত্যা ঘটাতে হবে। যথারীতি পরিকল্পনা দাঁড় করিয়ে ৫৪ দিন পরে মুসলিম লীগের প্রাক্তন এম. এল. এ. নোয়াখালির 'পীর' বংশের সন্তান কুখ্যাত জেহাদী দাঙ্গাবাজ গোলাম সরোয়ারের নেতৃত্বে ওখানকার হিন্দু নিধন যজ্ঞের কুৎসিত উদ্বোধন হয় '৪৬-এর ১০ অক্টোবর। সেদিন ছিল বৃস্পতিবার। হিন্দুদের লক্ষ্মীপুজোর দিন। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড সহ তার কয়েক হাজার প্রশিক্ষিত গুণ্ডা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে একাজে অংশ নেয়। থানা-পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। নোয়াখালি ও তদানীন্তন ত্রিপুরা জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, সোনাইমুরি, রাইপুর ও সেনবাগ থানা সহ আরও অনেক

এলাকা নিয়ে বিশাল অঞ্চল ঘেরাও করে হিংসার তাণ্ডব চললো অনেক দিন ধরে। হিন্দুদের ধর্মস্থান অপবিত্র করা ও ধ্বংস করা ছাড়াও অত্যাচারের এমন কোন ধরণ বাকি নেই যা এখানে ঘেরাও হওয়া হিন্দুদের উপর প্রয়োগ করা হয়নি। হত্যা, লুঠ পাট, গণধর্ষণ, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্মান্তরকরণ। হিন্দু অঞ্চল ঘেরাও করে অর্থাৎ পালিয়ে যাওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে, অসংখ্য হিন্দু মেয়েকে তারা বিয়ের নামে রক্ষিতা করে নিয়েছে। হিন্দুরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তাগুলি খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। জলপথে যাতে অপবিত্র পৌত্তলিক হিন্দুরা পালিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল নৌকার মাঝিদের দিয়ে। ঐ মাঝিরা সবাই ছিল মুসলমান। দু'চারজন সাহসী ব্যক্তি ঐ এলাকায় গিয়েছিলেন বন্ধু বা আত্মীয়দের সাহায্য করার জন্য। তাঁদের অনেকেই খুন হয়ে গেছেন এবং দু'চার জন আহত হয়ে ফিরে এসেছেন। ['Gandhi : His Life & Thought' by A. Kripalini, p- 255]

১৯৪০-এর পর পাকিস্তান আদায়ের জন্য (লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান) মুসলিম লীগ তৈরী করে 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড'। এর প্রচলিত নাম ছিল 'আজরাইল বাহিনী'। এদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল না। এদের শিক্ষার ভার ছিল পীর ও কট্টর মোল্লাদের উপর। পাঞ্জাবের তৎকালীন ছোটলাট জেনকিন্স এই ন্যাশনাল গার্ডকে মুসোলিনী ও হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর সমগোত্রীয় মনে করতেন। (জিন্নাহ্ঃ পাকিস্তান-নতুন ভাবনা, পৃ-২৬২)। বস্তুত এদের দানবীয় কাজ-কর্মের ফলেই পাকিস্তান সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়েছে। মি. লিয়াকত আলি খাঁন ঐ ন্যাশনাল গার্ডকে লীগের 'অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' বলে ঘোষণা করে বলেছিলেন, ন্যাশনাল গার্ডদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ মুসলিম লীগের উপর আক্রমণ বলে ধরে নেওয়া হবে। [Pyarelal's 'Mahatma Gandhi-Last Phase-Vol.II, p-9] মহাত্মাজী তখনও অন্ধ। শুধু অন্ধ নন, কালাও।

লীগের এই সব দানবীয় কাজ-কর্মের প্রাণ ভ্রমরা লুকিয়ে ছিল (এখনও আছে) জেহাদের মধ্যে। জেহাদের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে ইসলাম ধর্ম প্রচার, প্রসার ও রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং 'বিধর্মীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া'। দলবদ্ধ গুণ্ডামীর ক্ষেত্রে (বাবাসাহেবের ভাষায় 'Gangsterism') মুসলিম মৌলবাদীর শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য অস্ত্র হচ্ছে 'জেহাদ' (পরিশিষ্ট-৭)। বিগত ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধে তথাকথিত প্রগতিশীল সাদ্দাম হোসেন শেষ পর্যন্ত ঐ জেহাদের ডাক দিয়েছিলেন। ২০০৩-এর ২৫ মার্চ কাশ্মীরের নন্দিমার্গে ২৪ জন হিন্দুকে খুন করেছে ওখানকার পাকিস্তানপন্থী জঙ্গী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা। তাদের প্রধান হাফিজ সঈদ বলেছেন, কাশ্মীরে হিন্দুদের হত্যা ভারতের বিরুদ্ধে তাদের ধর্মীয় জেহাদেরই অঙ্গ। এক প্রশ্নের উত্তরে লস্কররা বলেছে, "ভারতীয়রা একটা ভাষাই বোঝে। সেটা হল জেহাদের ভাষা। তাই প্রত্যুত্তরে হিন্দুদের হত্যা করা ছাড়া আমাদের কোনও উত্তর নেই।"

'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধই ইসলাম ধর্মের প্রাণ। মুসলমানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদিস 'সহি আল বুখারী'র (প্রথম খণ্ড, পৃ-xxvi) ভাষ্য অনুসারে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, পরে খোদা যুদ্ধের অনুমতি দেন। আরও পরে খোদা যুদ্ধকে

বাধ্যতামূলক করেন। জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ করতে হবে দু'দল মানুষের বিরুদ্ধে —

ক) যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে; এবং

খ) যারা খোদা ছাড়া অন্য কারও (দেব-দেবী) উপাসনা করবে, তাদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধ চলবে ততদিন যতদিন না খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

যারা জেহাদে অংশ গ্রহণ করবে খোদা তাদের সকল প্রকার পাপ ক্ষমা করে দেবেন। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের স্থান হবে স্বর্গের এমন সব বাগিচায় যার তল দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। চিরকাল বসবাসের জন্য তাদের স্বর্গে একটি উত্তম ঘর দেওয়া হবে। (কোরান-৬১/১২) জেহাদের বিকল্প কিছু নেই। (হাদিস বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ-XXX) কোন মুসলমান শাসক যখন পৌত্তলিকদের কোন দেশ জয় করবে তখন তাদের অধিবাসীদের তিনটি পথের একটি বেছে নিতে বলা হবে —

ক) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা;

খ) জিজিয়া কর দিয়ে বেঁচে থাকা; অথবা

গ) তরবারির আঘাতে মৃত্যু বরণ করা।

মুসলমানরা আল্লাহ্‌র শত্রুদের উপর যে কোন প্রকার অত্যাচার চালাতে পারবে। যেমন, ঘরবাড়ীতে আগুন লাগানো, জলপ্লাবন ঘটানো, গাছ-পালা কেটে ফেলা, খাদ্য-শস্য নষ্ট করে দেওয়া ইত্যাদি। [Dictionary of Islam by T.P. Hughes, 1999, pp-243 & 245]

দুনিয়ার সকল মুসলিম পণ্ডিত বিতর্কহীন ভাবে একমত হয়ে বলেছেন, 'জেহাদ হচ্ছে হজ, ওমরাহ হজ, নফল-নামায, রোজা প্রভৃতির চেয়েও উপরের কাজ।' [Al-Bukhari, Vol.1, p-xxxiii]

মুসলিম লীগের সমর্থক পত্রিকা সেদিনের স্টেট্‌স্‌ম্যান নোয়াখালিতে প্রায় ৪০০ লোকের নিহত হওয়ার খবর সহ নানা প্রকার আমানুষিক নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে ২০ অক্টোবর (১৯৪৬) জানাচ্ছে, "রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, রাইপুর, লক্ষ্মীপুর এবং সেনবাগ থানা এলাকায় গত দশ দিন ধরে ব্যাপক অত্যাচারে মানুষ হত্যা, তাদের সম্পদ লুট, বাড়ীঘর পোড়ানো, সুরক্ষার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাদের নিংড়ে অর্থ গ্রহণ, মহিলাদের অপহরণ এবং জোরপূর্বক তাদের নতুন বিশ্বাসে ধর্মান্তরকরণ শেষ করে উত্তেজিত অত্যাচারী জনতার অধিকাংশ এখন ত্রিপুরা জেলার ফরিদগঞ্জ-চরহাইম-চাঁদপুর এলাকায় ঢুকে পড়েছে। নোয়াখালি জেলায় দখলকৃত এলাকায় পাহারা দেওয়ার জন্য রেখে যাওয়া হয় তাদের একটা অংশ। উদ্দেশ্য ওখানকার অধিবাসীরা তাদের কর্তৃত্ব মানতে না চাইলে আবার চালাতে হবে অত্যাচারের রোলার।"

নোয়াখালির ধ্বংসযজ্ঞ যে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং বাংলার লীগ সরকারের পূর্ব পরিকল্পিত এবং গভর্ণর বারোজ সাহেবের আশীর্বাদপুষ্ট ছিল এটা অত্যন্ত পরিষ্কার। ধ্বংসলীলা শুরু হওয়ার পরপরই প্রিমিয়ার সুরাবর্দি সাহেব এবং গভর্ণর বারোজ সাহেব চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। সম্ভবত ঐ কু-কর্ম ঠিকমত চলছে কিনা তা দেখার জন্য।


আচার্য কৃপালনী


শরৎচন্দ্র বসু

ওদিকে গান্ধীজীর পরামর্শে কংগ্রেস সভাপতি আচার্য জে. বি. কৃপালনী (১৮৮৮-১৯৮২) শরৎ বসুকে (১৮৮৯-১৯৫০) নিয়ে ১৯ অক্টোবর প্লেনে চড়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। পথে অল্প সময়ের জন্য কুমিল্লায় নেমেছিলেন। তখন কয়েক হাজার ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু তাঁদের সঙ্গে দেখা করে মুসলিম গুণ্ডাদের পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা দেন। এরপর তাঁরা চট্টগ্রামে গিয়ে বারোজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে সুরাবর্দী সাহেবও ছিলেন। দুর্ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে বারোজ সাহেব বললেন প্রিমিয়ার তাঁকে বলেছেন 'সব কিছুই শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল ভাবে চলছে।' কৃপালনী হিন্দু মহিলাদের অপহরণ প্রসঙ্গ তুললে গভর্ণর বললেন, 'এ সব হবারই কথা। কারণ, হিন্দু মহিলারা মুসলমান মহিলাদের তুলনায় দেখতে সুন্দরী।' ['Gandhi : His Life and Thought' by A.Kripalani, p-255-56]

এগারো দিন ধরে নোয়াখালিতে হিন্দু নিধনযজ্ঞ ও হিন্দু নারী ধর্ষণ চলার পরে সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট করার জন্য ২১ অক্টোবর কয়েকজন মন্ত্রী ও লীগ নেতাদের একটি টিম পাঠানো হল নোয়াখালিতে উপদ্রুত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার লীগের মনোনীত সদস্য মি. যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল।

অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, মুসলিম লীগের পাঠানো যোগেনবাবুর নেতৃত্বাধীন তদন্তকারী দল অত্যাচারিত বিধ্বস্ত অঞ্চলে আদৌ প্রবেশ করেননি। তারা কয়েকটি উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে এসে এবং প্লেনে উপদ্রুত অঞ্চলে এক চক্কর মেরে তদন্তের প্রহসন করে কোলকাতায় এসে তাঁদের তদন্ত রিপোর্ট পেশ করলেন ঃ —

" ..... পরিস্থিতি তেমন জরুরী বা ভয়াবহ নয়। ধর্ষণ এবং অপহরণ আদৌ হয়নি। মৃত্যুর সংখ্যা কুমিল্লায় ১৫ এবং নোয়াখালিতে ১০০-এর কম। সাধারণ ভাবে হত্যা এবং অগ্নিসংযোগ ঘটেনি। জমিদার মহাজনদের দু'চারটা বাড়ী লুট হয়েছে। পুড়িয়ে দেওয়া বাড়ীর সংখ্যা দু'শতাধিক নয়। ক্যাম্পে থাকা উদ্বাস্তুদের কাউকে আহত অবস্থায় দেখা যায়নি। অবশ্য ধর্মান্তরিতকরণ ও জবরদস্তিমূলক বিবাহের কিছু ঘটনা আছে।" [The Statesman, dt. 25.10.'46.]

গান্ধীজী নোয়াখালির দুর্গত এলাকায় যাওয়ার পথে কোলকাতায় (সোদপুরে) এলেন অক্টোবরের শেষে। লীগ বা সুরাবর্দী কারও কাছে এ কাজ মোটেই ভালো লাগছিল না। কিন্তু সরাসরি বাধা দিতেও পারছিলেন না। তাই যতটা সম্ভব দেরী করাবার ফন্দি ফিকির খুঁজছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ৬ নভেম্বর (১৯৪৬) গান্ধীজী নোয়াখালির উদ্দেশ্যে কোলকাতা ত্যাগ করলেন। তিনি সঙ্গে করে ২১-খানা বই নিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে নবী মোহাম্মদের বাণী সম্বলিত একটি বই ছিল। কিন্তু কোরান ছিল না। তার কারণ, গান্ধীজীর চরিত্র যত

দলেও হোক, কোরানের বিচারে তিনি একজন পতিত মুসলমানের চেয়েও নিকৃষ্ট। আর অপবিত্র মানুষের অধিকার নেই কোরান স্পর্শ করার। 'এই মহাসম্মানীয় কিতাব পবিত্র লোক ছাড়া কেউ স্পর্শ করবে না' (কোরান- ৫৬/৭৭ ও ৭৯)।

১১ নভেম্বর গান্ধীজী এক জনসভায় যোগ দিলেন নোয়াখালির দত্ত পাড়া গ্রামে। সভা লোকে লোকারণ্য। শ্রোতারা সকলেই মুসলমান। সভার শেষের দিকে সমবেত জনতার কাছে একটি প্রশ্ন তুলে ধরেন গান্ধীজী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি চান না যে, যে সমস্ত হিন্দুরা তাঁদের ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন তারা আবার স্ব স্ব গ্রামে ফিরে আসুক এবং আপনাদের সঙ্গে আগের মত পাশাপাশি শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বসবাস করুক?'

সভা নীরব। গান্ধীজী সোচ্চারে বললেন, 'পাকিস্তান হওয়া না হওয়ার ঝগড়া নিয়ে আমি এখানে আসিনি। জনগণ চাইলে ওটা হবে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি কেবল আপনাদের সহজ সরল কথাটা জানতে চাই যে, হিন্দুরা ফিরে আসুক এটা আপনারা চান কিনা।'

গান্ধীজী একটু বিরতি দিয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে আবার বলতে শুরু করলেন, 'হিন্দুরা ফিরে আসুক এটা যদি আপনারা না চান তবে তাও বলুন। আমি আপনাদের কথাটা ওদের জানাবো যাতে আর ওরা এখানে ফিরে না আসে।' এরপরেও কোনো উত্তর এলো না। ১২ নভেম্বর স্টেটসম্যান লিখেছে — 'সভার সকলে গান্ধীজীর কথা নীরবে শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন।' ["The meeting listened to him in silence and then dispersed." --The Statesman, 12.11.1946]

এ ছাড়া তিনি জীবনে অনেক সৃষ্টিছাড়া কাজ করেছেন; অনেক আজগুবি কথা বলেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব শ্রীনির্মল কুমার বসু বেশ কিছুদিন তাঁর শান্তি পদযাত্রার সঙ্গী ছিলেন। শ্রীবসু লিখেছেন, "গান্ধীজী হিন্দুদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন অহিংস ধর্ম অনুসারে তারা আক্রান্ত হয়েও আক্রমণকারীকে আঘাত করবে না। নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকবে, তবু প্রাণ ভয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে না বা বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবে না। স্ত্রীলোক হলে প্রাণ দেবে, মান-মর্যাদা (অর্থাৎ সতীত্ব) বর্জন করবে না।" (স.গ্র.-৯, ৪র্থ/পৃ-৪২৫) অথচ বাস্তব সত্য এই, সেদিন হাজার হাজার হিন্দু রমণী সতীত্ব হারিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। শত শত মহিলা প্রাণ দিয়েছেন। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১-এ, বাংলাদেশে।

১৯৪৭-এর ৩১ মার্চ তারিখেও গান্ধীজী প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, "আমার মৃতদেহের উপর দিয়া ছাড়া কংগ্রেস ভারতে দুইটি রাজ্য অর্থাৎ পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি উহাতে সম্মতি দিব না।" (স.গ্র.-৯/পৃ-৪৩৬) ৯ এপ্রিল তিনি বললেন, দেশ-ভাগ (অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্ম) অর্থ হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট অসত্য ('Partition means a patent untruth', স.গ্র.- ৩৫; ৭১তম/পৃ-৪১২) ১৯৪৭-এর ২ জুন সকাল

পর্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল যে, তিনি একাই ভারত বিভাজন আটকে দেবেন। সুতরাং, এ কথা পরিষ্কার যে, ভারত ভাগ হলে পাকিস্তান অংশে বসবাসরত হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধদের অবস্থা কি হবে তা' তিনি ভাবতে যাননি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কিছুটা ভেবেছিলেন বোধ হয়। তাই পার্টিশন কাউন্সিলের যৌথ ঘোষণায় উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হিন্দু মহাসভাও অখণ্ড ভারত তত্ত্বে অটল ছিল। ১৯৪০-এর ৬ এপ্রিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যার্জী শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেছিলেন, পাকিস্তান আন্দোলনকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত হবে না। এই ধ্বংসাত্মক দাবিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিতে হবে। তবে পরবর্তীকালে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁব চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গের তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত 'বেঙ্গল পার্টিশন



ড. মুখার্জী

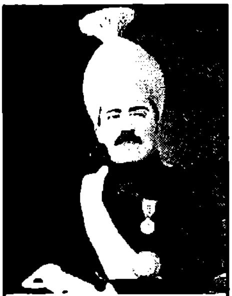


বীর সাভারকার

কনভেনশনে' ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (১৯০১-১৯৫৩) ভারত বিভাজন এবং তার সঙ্গে বাংলা ভাগের দাবী জানান। বার সাভারকার (১৮৮৩-১৯৬৬) টেলিগ্রাম করে শ্যামাপ্রসাদবাবুকে সমর্থন করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবুরা সেদিন ড. আম্বেদকরের তত্ত্বের প্রতিধ্বনি করে প্রস্তাবিত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময়ের দাবিও করেছিলেন। স্বাধীনতার পরেও বিভিন্ন মহল থেকে অনুরূপ দাবি উঠেছিল।

ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "যখন স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত এবং চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল তখন পশ্চিম বাংলায় আন্দোলন আরম্ভ হইল যে, যত সংখ্যক হিন্দু বিতাড়িত হইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে সেই সংখ্যক মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে পাঠাইয়া (পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত) নবাগত হিন্দুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল গান্ধীজীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন যে, ইহা ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাজ্যে (secular state of India) অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী (*শ্রীনেহেরু*) বিধানচন্দ্র রায়কে নির্দেশ দিলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লওয়া বন্ধ করিতে হইবে। যে দু'খানি চিঠিতে নেহেরু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা চিরকাল মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলালের দুরপনেয় কলঙ্ক ও নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে।" (স.গ্র.-৯/পৃ-৪৩৮-৩৯)

ড. আম্বেদকর তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি নেহেরু সরকারের গড়িমসি উপেক্ষা করে পাকিস্তান ও হায়দরাবাদে আটকে পড়া হিন্দুদেরকে ভারতে চলে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঐ দিন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হায়দরাবাদের ***নিজামকে 'ভারতের শত্রু'*** বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "...I ask the Scheduled Castes



হায়দরাবাদের ৭ম নিজাম

in Hyderabad not to side with the Nizam and bring disgrace upon the community by siding with one **who is the enemy of India.**" [D. R. Jatav's 'Dr. Ambedkar's Role in National Movement', p-198]



ড. আম্বেদকর

ভারত বিভাজনের দলিল

ভারত বিভাজনের দলিলের সরকারী নাম *'H.M. Government's Statement, 3 June 1947'* এবং এর প্রচলিত 'নাম পার্টিশন প্ল্যান' বা 'মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান' (পরিশিষ্ট -'৫')। ২২-টি ধারা বিশিষ্ট এই প্লানে বলা হয়েছে —

(ক) ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের বেশির ভাগ প্রতিনিধিবৃন্দ অখণ্ড ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনার কাজে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান প্রতিনিধি এই গণ পরিষদে (Constituent Assembly) যোগদান করেননি। (ধারা-২)

(খ) ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের জন্য চূড়ান্ত সংবিধান রচনা করবেন না। এ কাজ করার দায়িত্ব ভারতবাসীর। অখণ্ড ভারত গঠনের পথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়ার কাজে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করবেন না। (ধারা-৩)

(গ) গণ-পরিষদের কাজে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করার কোন ইচ্ছা নেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের। তবে যেসব এলাকার মানুষ এদের রচিত সংবিধান মেনে নেবেন না, তাঁদের উপর তা' জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়ার জন্য ঐ সব এলাকার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া হবে যে, তাঁরা কি —

(১) বর্তমান কার্যরত গণ-পরিষদে যোগ দেবেন, না

(২) একটি নতুন এবং আলাদা গণ-পরিষদে যোগ দেবেন?

এই প্রশ্ন দু'টোর উত্তর পাওয়ার পরই এটা ঠিক করা সম্ভব হবে যে কার বা কাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এখানে পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে, তৎকালীন কার্যরত গণ-পরিষদে যোগদানের অর্থ ছিল অখণ্ড ভারতকে সমর্থন করা এবং নতুন একটি গণ-পরিষদে যোগদানের অর্থ ছিল ভারত বিভাজনকে সমর্থন করা।

ভারত ভাগ হলে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হবে — এটাই হচ্ছে বৃটিশ সরকার এবং অধিকাংশ হিন্দু ও শিখদের সর্বশেষ ঘোষিত নীতি। কিন্তু মুসলিম লীগ এবং তাদের সমর্থক মি. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং তফসিলী হিন্দুদের মধ্যে তাঁর অনুগামীরা

ছিলেন এই নীতির বিরুদ্ধে। তাঁদের বক্তব্য ছিল — 'ভারত ভাগ হবে এবং গোটা বাংলা ও পাঞ্জাব পাকিস্তানের অংশে যাবে'। এটা ঠেকাতেই প্লানের রচয়িতারা বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য ৫-টি ধারা (৫-৯) যুক্ত করেছেন এবং ধারাগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, মুসলিম লীগ এবং তাদের সমর্থক তপসিলী এম-এল-এ-রা যেন কোনক্রমেই গোটা বাংলা ও গোটা পাঞ্জাবকে পাকিস্তানে নিয়ে যেতে না পারেন। তাই কাকতালীয় হলেও ৭ নং ধারাটির মাধ্যমে বাংলার এম-এল-এ-দের কাছে একটি সুবর্ণ সুযোগ সেদিন এসেছিল, যে-টি প্রয়োগ করে একমাত্র তারাই দেশ-ভাগ অর্থাৎ ভারত ভাগ আটকে দিতে পারতেন। ঠিক আটকাতে না পারলেও বড় ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারতেন অবশ্যই। কারণ, ৭নং ধারাটিতে বলা হয়েছে যে, বঙ্গীয় আইন সভার একজন সদস্যও যদি দাবি করেন তাহলে ইওরোপীয় সদস্যগণ বাদে অন্যান্য সদস্যরা একত্রে বসে প্রথমেই ঠিক করে নেবেন যে, সমগ্র বাংলা কোন গণ-পরিষদে যোগ দেবে — তখনকার কার্যরত গণ পরিষদে, না নতুন একটি গণ পরিষদে। সেদিন অধিকাংশ এম. এল. এ-রা তখনকার কার্যরত গণ পরিষদে যোগ দিলে পশ্চিমবঙ্গ তো ভাগ হতই না; এমন কি ভারত ভাগ নাও হতে পারত।

১৯৪৭-এর ২০ জুন দুপুরে বঙ্গীয় আইন সভায় সর্বপ্রথমে এই ৭ নং ধারা অনুসারেই ভোট হয়। তার আগেই মি. জিন্নাহ্ হুইপ জারি করে বলেছিলেন, মুসলিম লীগ এবং তাদের সমর্থক এম-এল-এ-রা অতি অবশ্যই ভারত ভাগের পক্ষে এবং বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দেবেন। ২৫০ জন সদস্য বিশিষ্ট আইন সভায় ২১৬ জন সদস্য প্রথম ধাপের ভোটে অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ১২৬ সদস্য একটি নতুন এবং আলাদা গণ-পরিষদ গঠনের পক্ষে অর্থাৎ ভারত ভাগের পক্ষে ভোট দেন। গভর্নর এস. বারোজ সংগে সংগে টেলিগ্রাম করে মাউন্টব্যাটেনকে এই ভোটের ফলাফল জানিয়ে দেন।

Telegram, L/P&J/10/81: f 224, CALCUTTA, 20 June, 1947, 3.15 pm, Recieved in India Office: 20 June, 3.50 pm.

No. 978-S. Joint meeting of Members Bengal Legislative Assembly this afternoon decided under paragraph seven of H.M.G's statement by 126 votes to 90 votes to join a new Constituent Assembly. Divisions of separate meetings expected later this afternoon. [D.No. 277 of T.P. Vol. XI, p- 536]

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেদিন কমিউনিষ্ট সদস্যরা (সর্বকমরেড জ্যোতি বসু, রতন লাল ব্রাহ্মণ এবং রূপনারায়ণ রায়) প্রথম ধাপের ভোটে অংশগ্রহণ করেননি। কোন এক অজ্ঞাত কারণে ফজলুল হক সাহেব (১৮৭৩-১৯৬২) ছিলেন কোলকাতার বাইরে। যে ১২৬ জন বঙ্গবীর (??) সেদিন সংখ্যালঘু বিনিময়ের কথা মুখে না এনে ভারত ভাগের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ১২০ জন মুসলমান, ৫ জন তফসিলী হিন্দু এবং ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান। **তফসিলী হিন্দুরা হচ্ছেন, সর্বশ্রী হারাণচন্দ্র বর্মন, দ্বারিকানাথ বারুরী, ড.**

ভোলানাথ বিশ্বাস, গয়ানাথ বিশ্বাস এবং নগেন্দ্রনারায়ণ রায় (সহায়ক গ্রন্থ '০২', পৃ-১০৯)। ভোটের মাধ্যমে এনারা বললেন, ভারত ভাগ হবেই এবং সমগ্র বাংলাই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঠিক তখনি বঙ্গীয় আইন সভা অস্থায়ী ভাবে দু'টো অংশে ভাগ হয়ে গেল ঃ পূর্ববঙ্গ আইন সভা এবং পশ্চিমবঙ্গ আইন সভা। এই পর্যায়ে উভয় সভায় প্রথমে প্লানের ৬ নং ধারা অনুসারে ভোট হয়। ৬ নং ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় '৫৮-২১' ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বাংলা ভাগ হবে এবং ৮ নং ধারা অনুসারে অনুরূপ সংখ্যক ভোটে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ তৎকালীন গণ-পরিষদে যোগদান করবে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। [Telegram No. 979-S. CALCUTTA, *20 June, 1947, 4.40 pm,*
Recieved in India Office: 20 June, 5 pm., [Document No. 278 of Transfer of Power, Vol. XI, page- 536]

সেদিনের ঐ ভোটে যে ২১ জন সদস্য পশ্চিমবঙ্গকেও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই মুসলমান এবং মুসলিম লীগের সদস্য। যে ৫৮ জন হিন্দু এম. এল. এ পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের মধ্যে রাখলেন তাঁদের মধ্যে ৪৮ জন ছিলেন কংগ্রেসী, ৪ জন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, একজন ভারতীয় খৃষ্টান এবং ২ জন কমিউনিষ্ট (কমরেড জ্যোতি বসু এবং রতন লাল ব্রাহ্মণ)। এ ছাড়া ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, শ্রীমুকুন্দ বিহারী মল্লিক এবং বর্ধমানের মহারাজা।

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার অনুরূপ পূর্ববঙ্গ আইন সভাতেও একই সময় মাউন্টব্যাটেন প্লানের ৬ ও ৮ নং ধারা অনুসারে ভোট হয়। ৬ নং ধারা অনুসারে ভোট দিতে গিয়ে পূর্ববঙ্গ আইন সভার ৫ জন তফসিলী, ১০০ জন মুসলমান এবং ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান (মোট ১০৬ জন) বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দেন। ৮নং ধারা অনুসারে ভোট গ্রহণের সময় ঐ ১০৬ জন সদস্যের সঙ্গে **কমিউনিষ্ট এম. এল. এ কমরেড রূপনারায়ণ রায়ও পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ভোট দেন।**

সেদিন বাংলার ১ জন মুসলমান এম, এল, এ-ও কার্যরত গণ-পরিষদে যোগদানের পক্ষে ভোট দেননি। অর্থাৎ অখণ্ড ভারতের পক্ষে ভোট দেননি। এখানে একটি মজার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। বর্তমানে ভারতের কোন কোন রাজনৈতিক দল 'দলিত মুসলিম ঐক্য' গড়ে দিল্লীর ক্ষমতা দখল করতে চান। এদের মধ্যে অনেক নেতা ঐদিনের ভোটাভুটির ইতিহাসকে উল্টে দিয়ে প্রচার করছেন যে, বাংলার মুসলমান এম-এল-এ-রা ভারত ভাগ চাননি, যোগেনবাবু এবং তাঁর অনুগামীরাও ভারত ভাগ চাননি।

মাউন্টব্যাটেনের প্লানের শর্ত ছিল এই যে, অস্থায়ীভাবে গঠিত বাংলার দু'টো আইন সভার মধ্যে একটিতেও যদি অধিকাংশ এম, এল, এ-রা বাংলা ভাগের পক্ষে মতামত জানান, তবে বাংলা ভাগ হবে। এই শর্ত অনুসারেই ভারত ভাগের সঙ্গে বাংলাও ভাগ হয়েছে এবং পশিচমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৪৭-এর ২৩ জুন '৯১-৭৭' ভোটে পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় ঠিক হয় যে, পাঞ্জাবকে ভাগ করা যাবে না। সমগ্র পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ঠিক তখনই শিখ ও হিন্দু প্রধান এলাকার এম, এল, এ-রা '৫২-৫০' ভোটে ঠিক করেন যে, পাঞ্জাবকে ভাগ করতে হবে এবং পূর্ব পাঞ্জাব ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে। প্লানের শর্তানুসারে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হয়।

২৬ জুন সিন্ধু ব্যবস্থাপক সভায় ভোট গৃহীত হয়। এখানে '৩০-৩২' ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিন্ধু পাকিস্তানে যোগ দেবে। বেলুচিস্তানে মতামত নেওয়া হয় ২৯ জুন। এখানকার হিন্দু ও পার্শী সদস্যরা (৭ জন) সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। বাকী সদস্যরা একযোগে মতামত দেন যে, বেলুচিস্তান পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে।

জুলাই মাসের প্রথমে সিলেট জিলায় গণভোট গৃহীত হয়। অত্যন্ত জটিল অবস্থার মধ্যে সিলেটবাসীরা '২,৩৯,৬১৯ - ১,৮৪,০৪১' ভোটের ব্যবধানে পূর্ব পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। *এখানকার ভোটে মুসলিম লীগের সহযোগী হিসেবে যোগেনবাবু অসামান্য অবদান রেখেছেন। সেদিন লীগের কারসাজিতে লক্ষাধিক হিন্দু ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন।*

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় জুলাইয়ের ৬ থেকে ১৭ তারিখের মধ্যে। এখানকার ভোটাররা '২,৮৯,২৪৪ - ২,৮৭৪' ভোটের ব্যবধানে পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (স. গ্র. ২৫/পৃ- ৩৮৭-৩৮৯)

উপরে বর্ণিত ভোটাভুটির পর আনুষ্ঠানিক ভাবে অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করে পূর্ব পাঞ্জার ও পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গ চলে যায় পাকিস্তানে। ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে ড. আম্বেদকর যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা' বাস্তবে রূপায়িত হ'ল। ব্যতিক্রম ঘটল সংখ্যালঘু বিনিময়ের ব্যাপারে। **এই সংখ্যালঘু বিনিময় না হওয়ার জন্যই উদ্বাস্তু সমস্যা করুণতম রূপ পেল**। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় হলে তখনই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আমাদের বিশ্বাস, বাংলাদেশের শেষ হিন্দু ও বৌদ্ধটি দেশত্যাগ বা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত উদ্বাস্তু সমস্যা থেকেই যাবে।

অনেকে বলে থাকেন, দ্বি-জাতি তত্ত্ব একটি মিথ্যা তত্ত্ব। অনেকে বলেন এটি মি. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বা কবি আল্লামা ইকবালের আবিষ্কার। আমাদের দৃষ্টিতে এই 'ধারণা' মোটেই ঠিক নয়। মহাবিশ্বের চন্দ্র-সূর্য্যের অস্তিত্ব যতটা সত্য কোরানে বর্ণিত দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঠিক ততটাই সত্য। কোরান অনুসারে 'ইসলাম খোদার একমাত্র মনোনীত ধর্ম।' (কোরান ৩/১৯)। ধর্ম হিসেবে ইহুদি এবং খ্রীষ্টধর্মকে আংশিক ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইসলাম। অন্য কোন ধর্মকে আদৌ স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। নবীজী প্রচার করেছেন, স্বয়ং খোদা ইসলামের মূল নীতিগুলো জিব্রাইলের মাধ্যমে

তার কাছে পাঠিয়েছেন। এই নীতিগুলো পরে 'কোরান' নামে একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। *'এই কোরান পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয়'*। রক্ত মাংসে গড়া কোন মানুষ কোনদিন এই গ্রন্থের একটি অক্ষর বা একটি বিরতি চিহ্নও পরিবর্তন করতে পারবে না। এই গ্রন্থে খোদা সমগ্র বিশ্ববাসীকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন — 'বিশ্বাসী' এবং 'অবিশ্বাসী'। মুসলমানরা বিশ্বাসী এবং অমুসলমানরা অবিশ্বাসী। এই তত্ত্বের নাম 'দ্বি জাতি তত্ত্ব'। মুসলমানদের কাছে এটি একটি 'চির সত্য' (Universal Truth)। ইসলামের আবির্ভাবের পরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে এই দ্বিজাতি-তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে 'আমরা একটি জাতি, আর তোমরা অন্য একটি জাতি' — একথা বলেই ইসলাম থেমে থাকেনি; 'বিশ্বের সমগ্র অবিশ্বাসীদের মহাসত্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা এবং সমগ্র পৃথিবী থেকে পৌত্তলিকতা নির্মূল করা মুসলমানদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য' — এই বিধানও জারি করেছে। পৃথিবীতে শেষ অবিশ্বাসী ব্যক্তিটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের ঐ পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মুসলমানদের দৃষ্টিতে কোরান হচ্ছে 'পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান,' (Complete Code of Life) আমরা দীর্ঘদিন ধরে কোরান পড়ে এই বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করছি। আমাদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার ব্যাপারে কোরান 'একক এবং অদ্বিতীয়'। একজন মুসলমানের ইহকালে এবং পরকালে কী কী প্রাপ্য কোরানে তা' সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই বিধানগুলো এতই আকর্ষণীয় যে, দিনে দিনে পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। ইহকালে পঞ্চ ইন্দ্রিয় সুখের অঢেল সুযোগ এবং পরকালে স্বর্গলাভের শতকরা ১০০ ভাগ গ্যারান্টি আছে ইসলাম ধর্মে। তাছাড়া তত্ত্বগতভাবে কোরানে জন্মভিত্তিক জাতব্যবস্থা নেই; নেই অস্পৃশ্যতার মত মহাপাপ। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক বিপ্লব। এর চেয়েও বড় বিপ্লবের কথা আছে কোরানে। কোরানের পরিষ্কার নির্দেশ —

(১) **এই বিশ্ব এবং মহাবিশ্বের একমাত্র মালিক মহান্ খোদাতা'লা।**
'যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসেরই মালিক হইতেছেন আল্লাহ্ এবং যাবতীয় ব্যাপার ও বিষয়সমূহ খোদারই দরবারে পেশ হইয়া থাকে।' (কোরান ৩/১০৯, ৪/১২৬, ১৩১, ১৩২, এবং ৫/৪০)

(২) **"আকাশমণ্ডল ও যমীনের বাদশাহী আল্লারই জন্য ..... "**
(কোরান ২৪/৪২; অনুরূপ বিধান, ২/১০৭ এবং ২৪/৬৪)

(৩) **"..... যমীনের উত্তরাধিকারী আমাদের নেক বান্দাগণ হইবে।"**
(কোরান ২১/১০৫)

(৪) **"এই পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল।"**
(হাদীস সহি মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯৬৩)

বিভাজন-পূর্ব ভারতে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৮৫৬-১৯২৬), লালা লাজপত রাই (১৮৬৫-

১৯২৮), কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) এবং ড. আম্বেদকর ছাড়া অন্য কোন হিন্দু চিন্তাবিদ কোরানে এবং হাদিসে বর্ণিত ঐসব বিধান সমূহের তাৎপর্য ঠিক ঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তা' যদি পারতেন তাহলে দেশ ভাগ মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু বিনিময়ের দাবি করতেন। দুঃখের বিষয় চল্লিশের দশকে ডান বাম নির্বিশেষে প্রায় সকল হিন্দু রাজনীতিবিদ কোরান এবং হাদিসের উল্টো অর্থ করেছিলেন। কমিউনিষ্ট নেতারা ধর্মকে আফিম হিসেবে ঘোষণা করেও ইসলামের মধ্যে উদারতা এবং মহানুভবতার মতো অমৃত আবিষ্কার করেছিলেন। প্রথম শ্রেণির কমিউনিষ্ট তাত্ত্বিক কমরেড মানবেন্দ্রনাথ রায় বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের অবদান খুঁজে পেয়েছেন অনেক আগেই। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাননি চল্লিশের দশকের কমিউনিষ্ট নেতারা। তাই তাঁরা সংখ্যালঘু বিনিময়ের বিধান ছাড়াই 'দেশ-ভাগ' সমর্থন করেছিলেন। বর্তমান ভারত ভূ-খণ্ডে বসবাসরত হিন্দু কমিউনিষ্টরা ইসলাম ও নবীর মধ্যে উদারতা আর মানবতা খুঁজে পেলেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হিন্দু কমিউনিষ্টরা ইসলামের কাছ থেকে পেয়েছেন হত্যা, লুণ্ঠন আর নারী-ধর্ষণের মতো নৃশংসতা আর বর্বরতা। তাই পূর্ববঙ্গের অনেক কমিউনিষ্ট নেতাই ওখান থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। মুসলিম কমিউনিষ্টরাও খুব একটা ভাল ব্যবহার পাননি ওখানে।

'কোরান সার'-এর লেখক আচার্য বিনোবা ভাবে (১৮৯৫-১৯৮২) এবং গান্ধীজী নিজেদের ইচ্ছামত কোরানের ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যান্য হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর সিংহভাগ মনুসংহিতার পরিধির মধ্যে তাঁদের ধর্ম ও রাজনীতি চর্চা আবদ্ধ রেখেছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন হিন্দু গীতা পড়েছিলেন। কোরান হাতে নিয়ে মুসলমানরা একদিন সমগ্র ভারত দখল করতে পারে এবং এই ধ্বংসাত্মক কাজকে প্রতিহত করতে যে সমগ্র হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে — এই চিন্তাধারা অধিকাংশ হিন্দু নেতার মনে আসেনি। তাই কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনের মতো চরম সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৩-এ 'বেঙ্গল চুক্তি'-র মতো তোষণমূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫)। তারও আগে ১৯১৬ খৃ. লখ্নৌ চুক্তির নামে ভারতের মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত ভাবে মেনে নেয় কংগ্রেস। কিন্তু ভারতের কালব্যাধি জন্ম-ভিত্তিক জাতব্যবস্থা এবং অস্পৃশ্যতা দূর করে সমগ্র হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। যেটুকু যা' করেছে তা' নিরামিষ ভঙ্গ করা মাত্র।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে খুব বড় বড় কথা বলেছেন গান্ধীজী। যেমন, "যদি অস্পৃশ্যতা বেঁচে থাকে তা'হলে হিন্দু ধর্মের মৃত্যু হবে।" (স.গ্র.-০৫/পৃ-৮৭) "অস্পৃশ্যতা টিকে থাকার চেয়ে হিন্দু ধর্মের মৃত্যুও শ্রেয়।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৮৭) কিন্তু বাস্তবে অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার কাজকে নিতান্তই গৌণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে এর ভার দেওয়া হয়েছিল হিন্দু মহাসভার উপর। কংগ্রেস দায়িত্ব নিয়েছিল মুসলিম তোষণের। এই

১৯৭৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কর্ণধারবৃন্দ



জেনারেল এরশাদ



জেনারেল জিয়াউর রহমান

জিয়া পত্নী বেগম খালেদা ২০০১-এ দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণের লগ্নে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ইতিহাস সৃষ্টি হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এই সময় বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ছিলেন শতকরা দশ জনের কম। কিন্তু ধর্ষিতা মহিলাদের শতকরা ৯৮.৬৮ ভাগ ছিলেন সংখ্যালঘু।



বেগম খালেদা জিয়া

মুজিব তনয়া সেখ হাসিনা



ধর্মান্ধতার গাঢ় অন্ধকার থেকে আলোর পথে পদক্ষেপ নিতে গিয়ে পরিবারের প্রায় সকল সদস্য-সদস্যা সহ খুন হয়েছিলেন সেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর কন্যা সেখ হাসিনার দিকে তাকিয়ে এখনও প্রায় দুই কোটি সংখ্যালঘু প্রাণে বাঁচতে চাইছেন। কিন্তু ম্যাডাম হাসিনা জামাতীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গত ৩০-০৬-২০১১ তারিখে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করলেন এবং ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির দ্বার খুলে দিলেন।



গুজরাটের দুই রাজনীতিবিদ : হিংসায় বিশ্বাসী মি. মহম্মদ আলি জিন্না এবং অহিংসায় বিশ্বাসী মি. এম. কে. গান্ধী। জিন্না সাহেবের উক্তি, 'হয় আমরা পাকিস্তান আদায় করে নেব, নয়ত ভারতকে ধ্বংস করে দেব।' গান্ধীজীর উত্তর, 'জিন্না, মেরে ভাই, তোম প্রধানমন্ত্রী হো।'



মি. জিন্না ১৯৪৬-র ১৬ আগস্ট কলকাতায় পাঁচ হাজার হিন্দু খুন করে এবং ১৫ হাজার হিন্দুকে আহত করে পাকিস্তান আদায় করে নিয়েছেন। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় সব হিন্দু এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু এভাবেই চলে আসেন ভারতে।

মুসলিম তোষণ যে কত মারাত্মক তা সেদিন ড. আম্বেদকর ছাড়া কেউ বুঝতে যাননি। তোষণকারী হিন্দুরা যে খুবই দুর্বল তা' সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন মি. জিন্নাহ্। তাই তিনি ১৯৩৯ খ্রী. তৎকালীন ভারতের ২৪% মুসলমানদের জন্য ভারতের শাসনক্ষমতাসহ সর্বক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ অংশ চেয়েছিলেন। এই ঘটনা উল্লেখ করে ড. আম্বেদকর মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের মুসলমানরা এখন হিটলারের ভাষায় কথা বলছেন। হিটলারের অনুকরণে মুসলমানরা সূর্যের মধ্যে একটি জায়গা চাইছেন। (স.গ্র.-১, ৮ম/পৃ-২৬৪)

১৯৪২ খ্রী. কংগ্রেস ইংরেজদের বলেছিল, 'ভারত ছাড়ো'। তখন জিন্নাহ্ বলেছিলেন, 'ভাগ কর এবং ভারত ছাড়ো'। তিনি খোদার নামে শপথ করে বলেছিলেন 'হয় আমরা ভারত ভাগ করব, নয়ত ভারতকে ধ্বংস করব'। [' We shall have India divided.' he *(Mr. Jinnah)* vowed, 'or we shall have India destroyed.' – 'Freedom at Midnight' - by Collins and Dominique Lapierre. page 29] এর উত্তরে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী এবং অহিংসার পূজারী গান্ধীজী বলেছিলেন, 'জিন্নাহ্, মেরে ভাই, তোম প্রধানমন্ত্রী হো'।

কোরান (৩/১১০) অনুসারে পৃথিবীর বুকে মুসলমানরাই সর্বোৎকৃষ্ট জনগোষ্ঠী। পৃথিবীর শাসন করার অধিকার আছে একমাত্র মুসলমানদের। মুসলিম লীগের মোহাম্মদ আলি এবং শওকত আলিকে (এরা সহোদর দু'ভাই) গান্ধীজী নিজের ভাইয়ের মতো বিশ্বাস করতেন এবং ভালবাসতেন। মোহাম্মদ আলি কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ১৯২৩-এ তিনি কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। এই মোহাম্মদ আলী ১৯২৪ খ্রী. আজমীঢ়ে এবং আলিগড়ে বলেছিলেন "গান্ধীজীর চরিত্র যত পবিত্রই হোক না কেন, তিনি আমাদের কাছে একজন চরিত্রহীন মুসলমানের চেয়েও নিকৃষ্ট"। (স.গ্র.-১, ৮ম/৩০২) এর এক বছর পরে লক্ষ্ণৌ এর এক জনসভায় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি এ কথা বলেছেন কিনা। উত্তরে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন এবং আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন "আমার ধর্মবিশ্বাস ও রীতি অনুযায়ী একজন লম্পট ও জঘন্য চরিত্রের মুসলমানও আমার কাছে গান্ধীজীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" (গ্রন্থ ও পৃষ্ঠা-পূর্বোক্ত)। মি. মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ সমগ্র হিন্দু জাতিকে মনুষ্যেতর জীব বলে মনে করতেন। (স গ্র. ২৬,১০ম/ পৃ-১৯০) বস্তুত কোরান মেনে চলা যে কোন মুসলমানকেই এই ধরনের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ —

১. কোরান ৯/২৮ নং আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, 'প্রতিমা পূজারীরা অপবিত্র জীব'।
২. "..... একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোন উচ্চবংশীয় মুশরিক (পৌত্তলিক) অপেক্ষা অনেক ভাল।" (কোরান- ২/২২১)
৩. কোরানের ৮/৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যমীনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হইতেছে

সেই সব লোক যাহারা মহাসত্যকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে;
পরে তাহারা কোন প্রকারেই তাহা কবুল করিতে প্রস্তুত হয় নাই।''

মুসলমানরা দেশের শতকরা মাত্র ২৪ জন হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রথম শ্রেণির নেতা সেদিন কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক গান্ধীজীকে এক লম্পট ও জঘন্য চরিত্রের মুসলমান অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করতেন এবং তা' প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন। এরা নিজস্ব আবাসভূমি পেলে সেখানকার হিন্দুদের উপরে কি ধরনের অত্যাচার করতে পারবে এবং কোরান ও হাদিসকে কত কঠোর ভাবে অনুসরণ করতে পারবে, তা' বোঝার মতো কোন হিন্দু নেতা তখন ছিলেন না। ব্যতিক্রম ছিলেন ড. আম্বেদকর এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

ভারত বিভাজনের কথা ঘোষণার পর মি. জিন্নাহ্ পাকিস্তান গণ-পরিষদের দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে মুসলিম লীগের সহযোগী সদস্য মি. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে পাশে বসিয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে বিশ্ববাসীকে একটি ধোঁকা দিলেন। বললেন, রাষ্ট্রীয় জীবনে পাকিস্তানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সবাই সমান অধিকার পাবেন। সবাই নিজেদেরকে পাকিস্তানী বলে পরিচয় দেবেন। হিন্দু নামক 'মানবেতর' জীবরা যে কোনক্রমেই সমান অধিকার পেতে পারে না, এই বোধশক্তি ছিল না আমাদের নেতাদের। সেদিনের ঐ প্রতিশ্রুতি যে নিছক ধোঁকা ছিল তা' প্রমাণিত হতে শুরু করে কয়েক দিনের মধ্যেই।

১৯৪৮-এর ৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি পাকিস্তান গণ-পরিষদে একটি প্রস্তাব আনেন যাতে বলা হয় ''ইসলামে বর্ণিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে।'' বলা বাহুল্য এই প্রস্তাবে মি. জিন্নাহ্র পূর্ণ সম্মতি ছিল। সম্মতি ছিল তৎকালীন আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলেরও। এর পর পরই রাষ্ট্রীয় মদতে মুসলিম গুণ্ডারা হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও নারীধর্ষণ। এর সঙ্গে থাকে ধর্মান্তরকরণ। প্রতিবাদের এতটুকু সাহস ছিল না ক্যাবিনেট র‍্যাঙ্কের মন্ত্রী (আইনমন্ত্রী) যোগেনবাবুর।

১৯৪৯-এর আগষ্ট থেকে ১৯৫০-এর ১৮ মার্চ পর্যন্ত হিন্দুদের উপর সংঘটিত পাশবিক অত্যাচার ও খুনের (one-sided diabolical killing and persecution of Hindus by Muslims) তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ (সর্বশ্রী বসন্তকুমার দাস, গণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মুনীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, হারাণচন্দ্র ঘোষদস্তিদার এবং মনোরঞ্জন ধর) প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর কাছে একটি 'স্মারক লিপি' দেন (স.গ্র.-৩১/১০৬-১২৫)। এই স্মারক লিপিতে উল্লেখ করেন যে, ১৯৪৯-এর আগষ্ট মাসে সিলেট জিলার বিয়ানিবাজার ও বরলেখা থানায় একতরফা ভাবে হিন্দু নিধন শুরু হয়। অবস্থা চরমে পৌঁছায় ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে। ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ রাতে এবং ৭ তারিখ বিকেলে রেডিও পাকিস্তান থেকে বারবার প্রচারিত একটি ঘোষণায় বলা হয়, ''ভাইসব, আপনারা শুনছেন

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে আমাদের মুসলমান ভাইদের উপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে। আপনারা কি প্রস্তুত হবেন না? আপনারা কি শক্তি সঞ্চয় করবেন না?" (স. গ্র.-৩১/পৃ-১১০) ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে ওখানকার চারজন মুসলমান মহিলার হাতে শাঁখা পরিয়ে, কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে এবং তাদের কাপড়ে লাল রঙ লাগিয়ে ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের চারদিকে ঘোরানো হয়। বলা হয় যে, কোলকাতায় এদেরকে হিন্দু বানিয়ে এদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। বেলা ১১ টার সময় সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীবৃন্দ অফিস ত্যাগ করে ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত হয়ে সভা করে। ঐ সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরে হিন্দু হত্যা এবং হিন্দুদের দোকান ও বাড়ীঘর লুঠপাট শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ। ট্রেন ও স্টীমারে করে যে সব হিন্দুরা ঢাকায় আসছিলেন, স্টেশনে তাদেরকে খুন করা হয়। প্রায় ৭ ঘন্টা ধরে এক তরফা ধ্বংসলীলা চলার পরে মিলিটারী নামে। দেশের সর্বত্রই অনুরূপ ঘটনা ঘটে। স্মারক-লিপিতে ঢাকা ছাড়াও সিলেট, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ (বরিশাল), চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা জেলায় সংঘটিত পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া হয় এবং এর প্রতিকার ও প্রতিবিধানের জন্য ২২-দফা পরামর্শ দেন পূর্বোক্ত নেতৃবৃন্দ। লিয়াকত আলী সাহেব স্মারকলিপিটি গ্রহণ করে হিন্দুদের কৃতার্থ করেন মাত্র। বরিশালের মি. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেন। এর কয়েক মাস পরে তিনি যখন মনে করলেন যে, তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন তখন ভারতে পালিয়ে এসে পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ পত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেন।

সেদিন ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা অনুধাবন করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু আলোচনার জন্য পাক-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে আমন্ত্রণ জানান। খান সাহেব দিল্লীতে এসে প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির নাম 'নেহেরু লিয়াকত চুক্তি' বা 'দিল্লী-চুক্তি'। এই চুক্তি থেকে প্রধান তিনটি বক্তব্য আমরা এখানে তুলে ধরছি —

(১) উভয় সরকার নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘুদের যাবতীয় নিরাপত্তার বিধান করবে যাতে করে উভয় দেশের সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য না হন।

(২) ইতিমধ্যে যাঁরা দেশ ত্যাগ করেছেন তাঁরা যাতে নিজ নিজ দেশে ফিরে যান, তার জন্য তাঁদেরকে বোঝাতে হবে, উৎসাহিত করতে হবে। ১৯৫০-এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যাঁরা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবেন, তাঁদের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। উভয় সরকারের একজন করে মন্ত্রী (মোট ২ জন) উপদ্রুত অঞ্চলে অবস্থান করে সংখ্যালঘুদের মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন যাতে করে উদ্বাস্তুরা নিজ নিজ দেশে ফিরে যান।

(৩) একান্তই যারা দেশত্যাগ করতে চান তাঁরা সে সুযোগ পাবেন। তাঁরা যত খুশি অস্থাবর সম্পদ নিয়ে যেতে পারবেন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত স্বর্ণালংকার থাকবে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নগদ ১০০ টাকা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নগদে ৭৫ টাকা নিয়ে যেতে পারেন। অতিরিক্ত স্বর্ণালংকার এবং নগদ টাকা ব্যাংকে জমা রেখে আসতে হবে। *(নগদ টাকাকে অস্থাবর সম্পদ হিসেবে ধরা হয়নি - লেখক।)*

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরে ভারত সরকার প্রথমে তাঁদের মন্ত্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস এবং পরে অন্য এক মন্ত্রী শ্রী এ. কে. চন্দকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছিলেন ওখানকার সংখ্যালঘুদের এই কথা বোঝাতে যে, তাঁরা যেন এখনই ভারতে চলে না আসেন। আমাদের মতে এটিও এক ধরনের রাজনৈতিক ধাপ্পা। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পূর্ববঙ্গে মান-সম্মান ও সম্পদ হারিয়ে ধর্ষিতা হওয়ার ভয়ে যে সকল হিন্দু-বৌদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধিরা এখানে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে বরিশালের প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীসতীন সেনের (জন্মস্থান ঃ ফরিদপুর) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকটা উদারপন্থী বলে পরিচিত বরিশালের বি. ডি. হাবিবুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীসেন পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন এখানে আগত উদ্বাস্তুদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিতে। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সেন মহাশয়ও সেদিন ইসলামের স্বরূপ বুঝতে পারেননি। পরে পাকিস্তান সরকার তাঁকে বিনা অপরাধে দীর্ঘদিন জেলে পুরে রাখেন। জেলে বসেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে এই যে, মৃদু বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এই মৃত্যুর কারণ খুঁজে বার করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল; কিন্তু তার রিপোর্ট আর প্রকাশিত হয়নি।

অন্ততঃ ৪ জন বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রী সেদিন নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। এঁরা হলেন— সর্দার প্যাটেল, ড. আম্বেদকর, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী। সর্দার প্যাটেল শেষ পর্যন্ত নেহেরুকে সমর্থন করেছিলেন। ড. আম্বেদকর নীরব ছিলেন এবং ড. মুখার্জী ও শ্রীনিয়োগী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁরা এই অভিযোগ এনেছিলেন যে, নেহেরু পূর্ববঙ্গের ১ কোটি ১১ লক্ষ হিন্দুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন (স.গ্র-৩৪, পৃ-২৮১)। দুঃখের বিষয় আজ দলিত মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তারা এই ইতিহাসকে উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারা শ্যামাপ্রসাদবাবুকে উদ্বাস্তু স্বার্থ বিরোধী আখ্যা দিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন। এরা দিনের পর দিন মিথ্যা তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তির উপরে ভারতের পার্লামেন্টে দীর্ঘ আলোচনা হয় ১৯৫০-এর আগষ্ট মাসের প্রথমে। পণ্ডিত নেহেরু ৭ এবং ৯ আগষ্ট পার্লামেন্টে সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। সেদিন বিরোধী দলনেতা ড. মুখার্জী উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের জন্য তিনটি পথ দেখিয়েছিলেন —

১) ভারত ও পাকিস্তানের পুনর্মিলন;

২) সংখ্যালঘু বিনিময়।

৩) ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা পুনঃ নির্ধারণ।

জবাবী ভাষণে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে, ১ ও ৩ নং পথে অগ্রসর হওয়ার অর্থ যুদ্ধ করা। আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। ২নং পথে যাওয়ার অন্তরায় দু'টো— অর্থের অভাব এবং এ পথ ভারতের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। (স.গ্রন্থ-৩০/২৯৫)

পণ্ডিত নেহেরুর এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মানবিক মূল্যবোধ সমন্বিত ভাষণ সেদিন পূর্ববঙ্গে আটকে পড়া প্রায় দেড় কোটি সংখ্যালঘুকে এমন একটি নরকে নিক্ষেপ করেছিল যেখানকার নিত্যসঙ্গী হচ্ছে 'হত্যা, লুণ্ঠন আর নারী ধর্ষণ'। এর বিকল্প ছিল ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া। আমরা যারা এসব সহ্য করতে পারিনি বা পারছি না তারাই এখানে চলে এসেছি এবং এখনও আসছি। ওখানকার শেষ হিন্দু ও বৌদ্ধটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই চলে আসা অব্যাহত থাকবে।

মি.যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তফসিলী হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলে মাতৃভূমিতে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি গোপনে মুসলিম লীগের সহযোগী সদস্যপদ (Associated Membership) গ্রহণ করে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনকে সমর্থন করেছিলেন। তিনিই একমাত্র হিন্দু যিনি গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পাকিস্তানের অর্থ করেছিলেন 'পবিত্র-ভূমি'। এই পবিত্র ভূমিতেই তিনি তফসিলীদের 'আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ'* দেখতে পেয়েছিলেন। কোরান যে তফসিলীদেরও অপবিত্র বলে ঘোষণা করেছে তা মি. মণ্ডলের খেয়াল ছিল না। তবে তাঁর 'সুখ-স্বপ্ন' ভাঙতে দেরি হয়নি। তিনি ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর মাসে। কারণ তিনি ছিলেন পৌত্তলিক। ইসলামের বিধান অনুসারে **পৌত্তলিকতায় ক্ষীণতম বিশ্বাসীরাও অপবিত্র**। তাঁরা কাফের। আল্লাহ্ এবং রসুলে অবিশ্বাসী এই সব কাফেরদের জন্য মহান খোদাতালা আগুনের কুণ্ডলী প্রজ্বলিত করে রেখেছেন। কোরানে (৪৮/১৩) বলা হয়েছে, ''আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের প্রতি যে সব লোক ঈমানদার নয় (অর্থাৎ বিশ্বাসী নয়) এমন কাফেরদের জন্য আমরা দাউ দাউ করিয়া জ্বলা অগ্নিকুণ্ডলি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।''

আজ যোগেন্দ্র অনুগামীদের একটি অংশ দলিত-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী। তাদের

---

*মুষ্টিমেয় কয়েকজন অন্ধ অনুগামী বাদে সকল স্তরের হিন্দু 'আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' সম্পর্কিত এই মন্তব্যকে আজও তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছেন। তাঁর ঐ মন্তব্য রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং অন্ধ আবেগের ফসল, যা কয়েক লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসীর চরম ক্ষতি করেছে। কিন্তু গান্ধীজী কতটা উপকার করেছেন আমাদের? ভারত-ভাগ অবশ্যম্ভাবী জেনেও হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তিনি কি আমাদের অনেক অনেক বেশি ক্ষতি করেননি? যোগেনবাবু তবু মুসলিম দর্শনকে **'ন্যায় ও শুভ চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত যাবতীয় নীতিমালার পক্ষে ক্ষতিকারক'** বলে চিহ্নিত করে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু গান্ধীজী যে পাপ করে গেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তো কেউ এগিয়ে আসছেন না।

মতে কোরানে এ ধরনের বিধান থাকতে পারে না। আর থাকলেও ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানরা 'অতি ভাল মানুষ'। এ সব বিধান কাজে লাগাতে যাবে না। সুতরাং দলিত-মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলে হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করতে হবে এবং দিল্লীর ক্ষমতা দখল করতে হবে।

যোগেনবাবু ছাড়া কিছু সংখ্যক হিন্দু নেতা মুসলিম লীগের বিন্দুমাত্র সমর্থক না হয়েও ১৯৪৭-এর পরেও পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কারণ —

১) তাঁরা মনে করেছিলেন হিন্দুরা যেমন রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মকে পরিহার করে চলতে পারেন মুসলমানরাও তেমনি পারবেন। এর ফলে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য গড়ে উঠবে।

২) তাঁরা ভেবেছিলেন 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ভুল। তাই ভারত বিভাজন বেশি দিন স্থায়ী হবে না। ঋষি অরবিন্দের জন্মদিনের বাণী ('বিভাজন রেখা মুছে যাবেই') তাঁদেরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

এ সব কারণে সেদিন যাঁরা ওখানে থেকে গেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), সতীন সেন, মনোরঞ্জন ধর, ফণিভূষণ মজুদার, মুনীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, মণি সিং, প্রাণকুমার সেন, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার যোগেন্দ্র অনুগামী কয়েকজন নেতা ওখানে ছিলেন এই আশায় যে, মুসলিম লীগের শাসনে তারা 'দুধে-ভাতে' থাকতে পারবেন।

বরিশালের শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার ১৯৪৭-এ কোলকাতার একটি কলেজে পড়তেন। দেশ-বিভাজনের পরে মাতৃ-ভূমির টানে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে তিনি ১৯৫২-এ নিজের জন্মভূমিতে (ব্যাসকাঠী, বরিশাল) ফিরে গিয়ে রাজনীতি শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সর্বশ্রী নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, নীরোদবিহারী মজুমদার, রত্নেশ্বর সরকার, নির্মলেন্দু দাস, বিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস, ডা. কালিদাস বৈদ্য, শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সুতার, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (পিরোজপুর), ডা. হরিপদ সিকদার এবং আরও অনেকে। শ্রীসুতার মনে করতেন, বরিশালের ব্যাসকাঠীই তাঁর বিধিদত্ত ঠিকানা। তিনি ১৯৫৪-এ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এম. এল. এ. নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সহযোগী হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন তিনি। ১৯৭৩-এ বাংলাদেশের এম-পি. হন। সাম্রাজ্যবাদী আর মৌলবাদী চক্র ১৯৭৫-এ ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করে। শ্রীসুতার অনেকটা আকস্মিকভাবে ২৯ জুলাই (১৯৭৫) ভারতে চলে আসেন। তা নাহলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেই হয়ত তাঁকে মৃত্যুর পরপারে চলে যেতে হত। তখন থেকেই শ্রীসুতার বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবেই কোলকাতায় বসবাস করা শুরু করেন। তাঁর সাথীরাও চলে এসেছেন এখানে। শ্রীসুতারের পাশপোর্টটি বাতিল করে দিয়েছিল খুনী খোন্দকার মোশতাক আহমেদের সরকার।

১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা ছিলেন জার্মানীতে।

তাই তাঁরা প্রাণে বেঁচে গেছেন। যতদূর মনে পড়ে '৭৭-এর প্রথমে শেখ হাসিনা কলকাতায় আসেন। ভারত সরকার তার জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এর সব কিছুতেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন শ্রীসুতার। সুতারবাবুর পক্ষে ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেছেন শ্রীনির্মলেন্দু দাস।

আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সঙ্গে আলোচনার জন্য শ্রীসুতার সর্বশেষে দিল্লী যান ২০০২-এর ১৯ বা ২০ নভেম্বর। ২৯ তারিখ আলোচনা বৈঠকের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে তিনি মারা যান। বিধিদত্ত ঠিকানায় ফিরে বসবাস করার আর কোনো সুযোগ থাকল না তাঁর। আমরাও আর জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারব না।

বাংলাদেশ ১৯৭১-এ পাকিস্তানী জঙ্গীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে বটে; কিন্তু বাংলাদেশ তার ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি, এ কথা আমরা পূর্ববর্তী সংস্করণে বলেছিলাম। এবারেও বলছি। কারণ কোরান এবং হাদিস নিরন্তরভাবে ধর্মান্ধ মৌলবাদী সৃষ্টি করে যাবেই। এ সম্পর্কে আমরা একটু পরে আরও কিছু তথ্য পেশ করবো। তার আগে মি. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কেন পাকিস্তান নামক 'পবিত্র-ভূমি' ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তা বলে নিচ্ছি।

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৫০-এর ৮ এপ্রিল 'নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের ধন, মান ও প্রাণ রক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। তবুও যোগেনবাবুর মতো মুসলিম লীগের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকেও ভারতে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। ভারতে এসে তিনি পাকিস্তান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন (৮ অক্টোবর, ১৯৫০)। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে উদ্দেশ্য করে লেখা ৮০০০ শব্দ সম্বলিত ইতিহাসের দীর্ঘতম এই পদত্যাগ-পত্রে তিনি মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের বিধান, মুসলিম মানসিকতা এবং মুসলিম রাজনীতির কৌশল বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা পাঠকমণ্ডলীকে এই পদত্যাগ পত্রটি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি (স.গ্রন্থ-'৩০' এবং দেবজ্যোতি রায়ের 'মুসলিম রাজনীতি ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ')। মি. মণ্ডল বলেছেন, 'মুসলিম শাসনে অমুসলমানদের কোন স্থান নেই'। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পর তাঁকে মিথ্যা এবং অর্ধসত্য সম্বলিত বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এছাড়া তিনি যে সমস্ত নির্মম ও পাশবিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার কয়েকটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ—

১। "প্রথম ঘটনাটি ঘটে গোপালগঞ্জের দীঘারকুল গ্রামে। একটি মিথ্যা অজুহাতকে কেন্দ্র করে ওখানকার এস. ডি. ও. নমঃশূদ্রদের শায়েস্তা করার জন্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করেন। ..... স্থানীয় মুসলমানরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ওরা কেবল নমঃশূদ্রদের উপর চড়াও হয়ে ক্ষান্ত হল না, তাদের নারী-পুরুষদের নির্মমভাবে প্রহার করল। তাদের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করল; মূল্যবান আসবাবপত্র লুঠ করে নিয়ে গেল। নির্মম প্রহারের ফলে এক গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পৈশাচিক অত্যাচারের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মানুষের

মনে ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার হল।" (পদত্যাগ পত্র, অনুচ্ছেদ-১১)

২। পাশবিক অত্যাচারের দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৯-এর প্রথম দিকে; যোগেনবাবুর জন্মস্থান বরিশালের গৌরনদী এলাকায়। অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে যোগেনবাবু প্রথমে জিলা কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখেন। কিন্তু তারা ঐ চিঠির প্রাপ্তি স্বীকারও করেননি। তারপর তিনি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী সহ পাকিস্তানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি।

সিলেট জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যোগেনবাবু সম্ভব অসম্ভব এবং নৈতিক অনৈতিক সব কিছুই করেছিলেন। সেই যোগেনবাবু সিলেটবাসী হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর পদত্যাগ পত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদে। তিনি লিখেছেন —

৩। "সিলেট জিলার হবিগঞ্জের নিরপরাধ হিন্দুদের, বিশেষত তফসিলী জাতির হিন্দুদের উপর পুলিশ ও মিলিটারীর সম্মিলিত বর্বর অত্যাচারের কাহিনী এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অসহায় নিরাপরাধ নারী-পুরুষের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাবার পর বেশ কিছু নারীর সতীত্ব হরণ করা হয়। তারপর পুলিশ ও স্থানীয় মুসলমানরা ওদের ঘরদোর ভেঙ্গে দেয় এবং সহায় সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যায়। এরপর ঐ এলাকায় বসে মিলিটারী চৌকি। মিলিটারীরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে এবং তাদের খাদ্য খাবার জোর করে কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত থাকল না; তাদের যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য **হিন্দু মেয়েদেরকে রাতের বেলা মিলিটারী ক্যাম্পে পাঠাতে বাধ্য করেছে।** আমি এই ঘটনাটি আপনার গোচরে এনেছিলাম। এ ব্যাপারে তদন্ত করাবেন; এই আশ্বাস আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা আপনি কিছুই করেননি।" *(এই চরম অপমান হজম করেও মি. মণ্ডল মন্ত্রীত্ব করে যাচ্ছিলেন।)* ক্ষুব্ধ এবং অসহায় যোগেনবাবু লিখেছেন —

৪। "হিন্দুরা ব্যাপক হারে দেশ ত্যাগ শুরু করেন মার্চের শেষের দিকে। মনে হচ্ছিল অল্প সময়ের মধ্যেই সকল হিন্দু ভারতে চলে যাবেন। ভারতে যুদ্ধের পদধ্বনি শোনা গেল। পরিস্থিতি চরমতম অবস্থায় পৌছাল। একটি জাতীয় বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। ৮ এপ্রিলের দিল্লী চুক্তির ফলে এই বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। ... আমি আশা করেছিলাম যে, পূর্ববঙ্গ সরকার এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দিল্লী চুক্তি বাস্তবায়িত করবেন। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, পূর্ববঙ্গ সরকার কিংবা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দিল্লী চুক্তি কার্যকর করার ব্যাপারে আদৌ আগ্রহান্বিত নন। .... দিল্লী চুক্তির পর যে সব হিন্দুরা নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে এসেছিলেন, তাদের ঘর-বাড়ী, জমি-জমা (যা' আগেই মুসলমানরা দখল করেছিল) কিছুই প্রত্যর্পণ করা হয়নি।" (২৩ নং অনুচ্ছেদ)

৫। "মোহাম্মদী নামের একটি মাসিক পত্রিকার বৈশাখ মাসের (এপ্রিল, ১৯৫০) সংখ্যায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা আক্রাম খাঁয়ের সম্পাদকীয়

বিবৃতি পাঠ করে মুসলিম লীগ নেতাদের মনোভাব সম্পর্কে আমার সন্দেহ সুদৃঢ় হল। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী ডা. এম. এ. মালেক ঢাকা থেকে প্রচারিত বেতার ভাষণে বলেছিলেন — "এমন কি পয়গম্বর মোহাম্মদ আরববাসী ইহুদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।" মাওলানা আক্রাম খাঁ মন্তব্য করলেন — "ডা. মালেক তাঁর ভাষণে আরববাসী ইহুদীদের উল্লেখ না করলেই ভালো করতেন। একথা সত্য যে, পয়গম্বর মোহাম্মদ ইহুদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এটা ছিল ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। কিন্তু শেষ অধ্যায়ে মোহাম্মদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আছে যে, সকল ইহুদীদেরকে আরব থেকে বিতাড়িত কর।" (অনু-২৪)

৬। "দিল্লী চুক্তির ফলে পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি বলব যে, বর্তমান অবস্থা কেবলমাত্র অসন্তোষজনকই নয়, পরিপূর্ণ ভাবে নৈরাশ্যজনক। তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং ভয়াবহ। .... পূর্ববঙ্গ সরকার ও মুসলিম লীগের কাছে চুক্তিটি একটি বাজে কাগজ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।" (অনু-২৯)

(উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৭-এর পার্টিশান কাউন্সিলের যৌথ ঘোষণা পত্রেও খুব শক্ত-পোক্ত ভাষায় সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটিও বাজে কাগজে পরিণত হয়েছিল।)

৭। "মুসলিম লীগ নেতারা বারবার ঘোষণা করছেন যে, পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র এবং এটি মুসলিম রাষ্ট্রই থাকবে। ইসলামকে সকল পার্থিব বিপদের সার্বভৌম প্রতিকার বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের নীরস বিতর্কের মধ্যে আপনারা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের গণতান্ত্রিক সমন্বয় সাধনের কথা বলেছেন। মহান শরিয়তী বিধানে কেবলমাত্র মুসলমানদেরই শাসক হওয়ার কথা আছে। হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মের সংখ্যালঘুরা 'জিম্মী' হিসেবে বসবাস করবেন। এই জিম্মীরা কিছু মূল্যের বিনিময়ে সুরক্ষা পাবে। এই মূল্য জিনিসটা যে কি, তা সকলের চেয়ে আপনি ভাল জানেন মিস্টার প্রাইম মিনিষ্টার। উদ্বিগ্নভাবে দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা ভাবনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পাকিস্তান হিন্দুদের জন্য নয়। এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ ধর্মান্তরকরণ বা বিলীন হয়ে যাওয়ার মতো অশুভ সম্ভাবনা দ্বারা আচ্ছন্ন (.... their future is darkened by the ominous shadow of conversion or liquidation) বিরাট সংখ্যক বর্ণ হিন্দু এবং রাজনীতি সচেতন তফসিলী পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছেন। এই ভেবে আমি ভীত যে, এই অভিশপ্ত প্রদেশে এবং পাকিস্তানে যে সকল হিন্দুরা বসবাস করতে বাধ্য হবেন, তাঁদেরকে ধীরে ধীরে এবং সুপরিকল্পিতভাবে তারা ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হবে, নয়তো সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। এটা সত্যই আশ্চর্যজনক ঘটনা যে, আপনার মত একজন শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান


যোগেন্দ্র মণ্ডল ও লিয়াকত আলি খান

এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি আজ এমন দর্শনের প্রচারক হয়ে গেলেন, **যে দর্শন মানবতার পক্ষে ভয়াবহ বিপজ্জনক এবং যে দর্শন ন্যায় ও শুভ চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত যাবতীয় নীতিমালার পক্ষে ক্ষতিকারক।**"

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭-এর মধ্যে কয়েকটি মারাত্মক আইন পাশ করে পাকিস্তান সরকার তাদের সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করে। এর মধ্যে এখানে আমরা পাঁচটি আইন উল্লেখ করছি —

1. The East Bengal (Emergency) Requisition of Property Act, Act XIII of 1948.
2. East Bengal Evacuees Administration of Property Act, Act VIII of 1949.
3. East Bengal Evacuees Administration of Immovable Property Act, Act XIV of 1951.
4. East Bengal Prevention of Transfer of Property and removal of Documents and Records Act of 1952.
5. Pakistan Administration of Evacuees Property Act, Act XII of 1957.

১৯৫১-এ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি সা'দ আকবর বাবরাক নামে এক আফগান ঘাতকের গুলিতে নিহত হলে প্রধানমন্ত্রী হন ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি পরামর্শ দেন যে, **পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান এবং অনধিক পাঁচজন ইসলামী আইনে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা-মণ্ডলী রাষ্ট্রপ্রধানকে সাহায্য করবেন।**

১৯৫৬-এ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানেই পাকিস্তানকে 'মুসলিম প্রজাতন্ত্র' (Islamic Republic of Pakistan) বলে ঘোষণা করা হয়। আরও ঘোষণা করা হয় যে, মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী কেউ রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবেন না এবং দেশে কোরান ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী কোন আইন পাশ করা হবে না।

১৯৫৪-এ পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় ৭২ জন সংখ্যালঘু সদস্য ছিলেন। তাঁদেরকে প্রায় নীরবে মেনে নিতে হয়েছিল ১৯৫৬-এর ইসলামিক শাসনতন্ত্র। তখন কেন্দ্রে দু'জন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন — শ্রীকামিনী কুমার দত্ত ও শ্রীঅক্ষয় কুমার দাস। তাঁদেরকে নীরবে হজম করতে হয়েছিল ঐ বিষাক্ত শাসনতন্ত্র।

পূর্ববঙ্গের প্রায় সকল সংখ্যালঘু হক সাহেবকে একান্ত আপনজন বলে মনে করতেন। গান্ধীজী ১৯১৫ খ্রী. যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসেন, তখন একজন পাক্কা মুসলমান হিসেবে ঐ হক সাহেব গান্ধীজীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেছিলেন। গান্ধীজী উত্তরে বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন মুসলমান। হক্ সাহেব তাঁকে একথাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বলেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী সম্মত হননি। (স.গ্র-০৮/১৯০) উল্লেখ করা যেতে পারে, লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে গিয়ে হক্ সাহেব মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চেয়ে দুর্দান্ত বক্তব্য রেখেছিলেন। সেখানে তিনি নামাযের জন্য সময় আদায় করেছিলেন



হক সাহেব

এবং বাকিংহাম প্রাসাদে আযান দিয়ে নামায পড়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এই ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে, কোন মুসলমান যদি কোরান এবং হাদিস মেনে চলেন, তবে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেন না। কোন মুসলিম রাষ্ট্র যদি বাস্তব ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ না হয় তবে সেখানে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ বসবাস করতে পারেন না। পাকিস্তানে কোনোদিন ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না। তাই দেশটি কার্যত হিন্দুশূন্য। বাংলাদেশের অবস্থা এর কাছাকাছি। ওখানকার সংখ্যালঘুরা ভারতে চলে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও আসবেন। ১৯৭১-এর পর কিছু দিনের জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যুক্ত ছিল। কিন্তু তার বাস্তবায়ন ছিল না কাগজেই চলে। গত ৩০.৬.২০১১ তারিখে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম' এবং 'বিসমিল্লাহ্' জিইয়ে রেখে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এটা এই শতকের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ধাপ্পা।

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধান মো. আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। এরই প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৫৭-এর ডিসেম্বরের শেষে। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সেনাবাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া হল। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। এটা রোধ করতেই এই ব্যবস্থা। এর আসল কারণ ছিল সামগ্রিক ভাবে পূর্ব পাস্তিানবাসীদের মনে এবং বিশেষভাবে হিন্দুদের মনে ভীতি সঞ্চার করা। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেনাবাহিনী গ্রামে গ্রামে গিয়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালায়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায় কোন প্রতিবাদ হচ্ছিল না। মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের বৈঠক বসলে তৎকালীন ৭২ জন সংখ্যালঘু সদস্যদের মধ্যে একমাত্র শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার এর প্রতিবাদ করেন। একটি মূলতুবী প্রস্তাব তুলে শ্রীসুতার সেদিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনেন, তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই —

১) ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকার অপরাধে একজন ঋণ দাতার বাড়ী গিয়ে সেনাবাহিনীর লোকেরা বলে, যদি তোমার স্ত্রীর ইজ্জৎ নষ্ট করতে না দাও তবে তোমাকে অ্যারেষ্ট করব।

২) যদি কোন হিন্দু যুক্ত নির্বাচনের কথা বলে তবে তাকে ভয় দেখানো হয় এবং বলে যে, তুমি হিন্দুস্থানের দালাল।

৩) সেনাবাহিনীর লোকেরা আজ যাকে তাকে অ্যারেষ্ট করার কথা বলছে। কাল হয়ত তারা চীফ মিনিস্টারকে অ্যারেস্ট করার কথা বলবে। এ সব বলতে বলতেই হয়ত সামরিক শাসন চালু করবে।

শ্রীসুতারের বক্তব্যের পরপরই কট্টর ইসলামপন্থীরা তাঁকে বাক্যবাণে জর্জরিত করেন। সৈয়দ কামরুল আহসান বলেন— "মি. সুতার কর্কশ ভাষায় সেনাবাহিনীর নিন্দা করেছেন। তিনি বললেন, সেনাবাহিনীর লোকেরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে। আমি তা

বিশ্বাস করি না। সেনাবাহিনী আমাদের একমাত্র আশা। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন স্পীকার এবং এক সময়ের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ফজলুল কাদের চৌধুরী শ্রীসুতারের বক্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, "সেনাবাহিনী হচ্ছে পাকিস্তানের একমাত্র গর্ব। চোরাচালানের অপরাধে যাদের আটক করা হয়েছে তাঁদের অধিকাংশ অমুসলমান (*অর্থাৎ হিন্দু*)। আমার বন্ধু মি. সুতার সেনাহিনীকে আজ অভিযুক্ত করার ঔদ্ধত্য দেখালেন। আমার বক্তব্য, ... তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হোক। ..।" তখন শ্রীসুতার অভিযোগ করেন যে, ঔদ্ধত্য শব্দটি বিধিসম্মত নয় (unparliamentary)। চৌধুরী সাহেবকে এই শব্দটি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কিন্তু স্পীকার এ কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না। উল্টে শ্রীসুতারকে থ্রেট করে বললেন, "You have kindled the fire, it must burn you." অর্থাৎ আপনি আগুন জ্বেলেছেন। এই আগুনে আপনাকে দগ্ধ হতে হবেই। সেদিন ওখানে ৭২ জন সংখ্যালঘু এম. এল. এ থাকা সত্ত্বেও নীরবে এই থ্রেট হজম করতে হয়েছিল। প্রতিবাদ করার সুযোগ তাঁদের ছিল না।

মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান তাঁর সুদীর্ঘ জবাবী ভাষণে বলেন, গত ১০ বছর ধরে দেশের সম্পদ বাইরে (অর্থাৎ ভারতে) চলে যাচ্ছিল। সেনাবাহিনীর লোকেরা যে কারও বাড়ী গিয়ে কোন মহিলাকে অসম্মানজনক কথা বলবে তা' বিশ্বাসযোগ্য নয়; ... আমার বন্ধু মি. সুতার আমাদের সেনাবাহিনীকে অপমানিত করেছেন। পরিষদ্ সদস্যরা তখন Shame! Shame! ধ্বনি দিতে থাকেন। পরদিন পরিষদের বৈঠক বসলে শ্রীসুতার বলেন, "আমার পরিষদ নেতা (মি.আতাউর রহমান খাঁন) গতকাল আমার উত্থাপিত অভিযোগ-গুলোকে সাজানো, মিথ্যা তৈরি করা এবং চায়ের দোকানের গল্প বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর এই ধরনের উক্তিতে এই পরিষদের সকল সদস্যই দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু আমি কোন মিথ্যা কথা বলিনি। মিথ্যা কথা বলার মত দায়িত্বহীন লোক আমি নই। পরিষদ্ নেতা ব্যক্তিগতভাবে এবং পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতারা যদি on the spot গিয়ে খোলাখুলিভাবে অনুসন্ধান করে দেখেন যে আমার একটি কথাও মিথ্যা তা'হলে আমি পদত্যাগ করতে রাজি আছি।" (শ্রীনির্মলেন্দু দাস কর্তৃক প্রকাশিত 'পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে প্রথম হুঁশিয়ারি' থেকে গৃহীত)

সেদিন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান বলেছিলেন, মার্চ মাস শেষ হওয়ার আগেই মিলিটারী ব্যারাকে ফিরে যাবে। আর শ্রীসুতার বলেছিলেন যে, এটা মিলিটারী শাসনের প্রস্তুতি পর্ব। শ্রীসুতারের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। মাত্র কয়েক মাস পরে ১৯৫৮-এর অক্টোবরে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে হিন্দু-বৌদ্ধশূন্য করা।

উদ্বাস্তু স্রোতের দ্বিতীয় ধাপ

(অক্টোবর, ১৯৫৮-২৫ মার্চ, ১৯৭১)

> "হে ঈমানদারগণ, ঈমানদার লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। ... " (কোরান - ৪/১৪৪)

১৯৫৮-এর ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলি মীর্জা* (১৮৯৯-১৯৬৯) তাঁর ভাষায় 'দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য, দেশের জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখের জন্য' ঘোষণা করেন যে, —



ইসকান্দার আলি মীর্জা

ক) ১৯৫৬-এর ২৩ মার্চের শাসনতন্ত্র বাতিল করা হবে।

খ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ অবিলম্বে বরখাস্ত করা হবে।

গ) জাতীয় পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ ভেঙে দেওয়া হবে।

ঘ) সকল রাজনৈতিক দল বাতিল করা হবে।

ঙ) বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত পাকিস্তান সামরিক আইনের আওতাভুক্ত হবে।

ঐদিন সামরিক সরকারের সেনাপ্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেন মো. আইয়ুব খান। এর ২০-দিন পরেই তিনি প্রেসিডেন্ট পদটি দখল করে নেন এবং ইসকান্দার মীর্জাকে চলে যেতে হল যুক্তরাজ্যে, নির্বাসনের জীবনে। এই ২০-দিনের মধ্যে মীর্জা সাহেব এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানে পাকিস্তান মন্ত্রিসভায় আফগানিস্তান ও ইরাণের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। এর পরপরই কয়েক হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে (বিশেষভাবে রাজনীতি সচেতন হিন্দুদের) কারারুদ্ধ করলেন আইয়ুব খান সাহেব। ১৯৫৯-এর প্রথম দিকেই 'Elective Bodies (Disqualificatioin) Order (EBDO), 1959' জারী করে ৭৮-জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে ৬ বছরের জন্য রাজনীতি করার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, বসন্ত কুমার দাশ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এবং বিজয় চন্দ্র রায়।

পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুশূন্য করার একটি অছিলার খোঁজ করছিলেন আইয়ুব খান সাহেব। ১৯৬৪-এ কাশ্মীরে হযরত বাল মসজিদে রক্ষিত মহানবীর এক গাছা চুল চুরি হয়ে যায় বলে প্রচার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামিক বোর্ডের সদস্য আবদুল হাই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু এবং অন্যান্য অমুসলমানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

* ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত মীর জাফর আলি খাঁ-র বংশধর।

জনাব আইয়ুব তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। তিনি তড়িঘড়ি ইসলামাবাদে ফিরে আসার পথে ঢাকা বিমান বন্দরে বললেন, এর ফলে পাকিস্তানে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তাঁর কোনো দায়িত্ব থাকবে না।* সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু গণহত্যা শুরু হয়ে গেল। হিন্দুরা দলে দলে ভারতে চলে আসা শুরু করেন। কিন্তু কয়েকজন বিদগ্ধ নেতা দেশ ছাড়লেন না। এঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী ত্রৈলোক্য মহারাজ, মুনীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কুমিল্লা), প্রাণকুমার সেন, শ্রীমতী নেলীসেনগুপ্তা, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, মনোরঞ্জন ধর, ফণিভূষণ মজুমদার, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন সুতার প্রমূখ নেতৃবৃন্দ। পাকিস্তান সরকার এঁদেরকে চিরদিন দেশের শত্রু মনে করে এসেছে। বারবার এঁদেরকে কারারুদ্ধ করেছে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত শ্রীসুতারকে তিন বার কারারুদ্ধ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তিনি ভারতের দালাল এবং মিলিটারী শাসনের-বিরোধী। তিনি তৃতীয়বার কারারুদ্ধ হন ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। কিছুদিন আগে থেকেই ওখানে কারারুদ্ধ ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা কাছাকাছি 'সেল'-এ ছিলেন। এই সময় উভয় নেতা ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনার সুযোগ পান। এর ফলে শেখ সাহেব শ্রীসুতারকে বিশ্বাসভাজন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দেন। শেখ সাহেব তখন সাময়িকভাবে হলেও কোরান এবং হাদিসকে দূরে রাখতে পেরেছেন বলেই শ্রীসুতারকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

শেখ সাহেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিত্রটাই পালটে যায়। ওখানকার মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রায় সকলেই পাক্কা কোরানপন্থী হয়ে যান। তাদের কাছে যেকোন হিন্দু নেতাই ভারতের দালাল তো বটেই, এমনকি শেখ হাসিনাও ভারতের দালাল। তবে এই দালাল অপবাদ থেকে অব্যাহতি পাবার একটি ধারালো অস্ত্র হাতে তুলে নেন ম্যাডাম। তিনি কঠোরভাবে ইসলাম ধর্মপরায়ণ হতে শুরু করেন। ১৯৯৬-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে ম্যাডাম একবারও রাজনীতি ও রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করার কথা বলেননি। তাঁকে বারবার সৌদি আরবে যেতে হয়েছে — কখনো হজ করতে, কখনো ওমরাহ্ হজ করতে। ১৯৯৬-এর আগে গিয়েছিলেন খোদার দোয়া নিতে। মনে হয় বাংলাদেশে বসে খোদার 'শক্তপোক্ত' দোয়া পাওয়া সম্ভব নয়। নির্বাচনে জিতে আবার গিয়েছিলেন শোকরাণা

---

* "After the theft, Abdul Hai, a member of the Advisory Committee of the Islamic Board declared Jihad against Hindus and other non-Muslims of East Pakistan. While returning back to Islamabad, the President of Pakistan Ayub Khan made a statement at the Dhaka airport that he won't responsible for any reaction in Pakistan in response to the Hazartbal incident." [1964 East Pakistan Genocide, Wikipedia]

(কৃতজ্ঞতা) জানাতে। সৌদি বাদশাহ্‌র সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। ওখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে আলোচনা হয়নি নিশ্চয়ই। ম্যাডাম ফিরে এসেছিলেন সৌদি আরবের রাজকীয় বিমানে। ঐ রাজকীয় বিমান যাত্রা ম্যাডামকে বাধ্য করেছে তাদের সংবিধানে ইসলামকে স্থায়ীভাবে 'রাষ্ট্রধর্ম' করতে এবং তার সঙ্গে 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম' যুক্ত করে হিন্দুদের বুঝিয়ে দিতে যে, তোমরা এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, ভাষান্তরে 'জিম্মী'।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী পূর্ব পাকিস্তানের এম. এল. এ. ছিলেন। তিনি ওখানে মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তাঁর লেখা 'India Partitioned and Minorities in East Pakistan' শীর্ষক গ্রন্থ (সহায়ক গ্রন্থ-২৯) থেকে পাকিস্তানের মৌলিক নীতি ও সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরছি ঃ—

১) পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ শাসন পদ্ধতির মৌলিক নীতি ছিল একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে রাষ্ট্র গঠন করা। হিন্দুদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করাই ছিল প্রশাসনিক নীতি। (পৃ-১২)

২) সরকার হিন্দুদের কাছ থেকে সকল আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেয় এবং মুসলমানদের, বিশেষতঃ 'National Guard'-এর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র রাখার লাইসেন্স দেয়। (পৃ-১৬)

৩) রাজশাহী জিলার 'তাহেরপুর রাজ'-এর ম্যানেজার শ্রীরসিকলাল রায় তাঁর পুত্রবধূর মৃত্যুর একাদশ দিনে শ্মশান সঙ্গীদের আপ্যায়ন করেন। ঠিক সেই দিনেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়। জনৈক মুসলমান জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান যে, জিন্নাহ্‌র মৃত্যু উপলক্ষে উক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছিল। ডি. এম. তক্ষুণি রসিকবাবুকে অ্যারেষ্ট করার আদেশ দেন। ঐদিনই মাখন ও ছানা বিক্রী করার অপরাধে এক নিরক্ষর মহিলাকে অ্যারেষ্ট করা হয়। 'আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র সেবক' — এই ঘোষণা দিয়ে ডি. এম. প্রতিরক্ষা আইনে ঐ দুই ব্যক্তিকে অ্যারেষ্ট করার আদেশ দেন। (পৃ-১৯-২০)

৪) আমি ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের অপকর্মের কথা মি. লিয়াকত আলীসহ সকল প্রধান প্রধান নেতাদের লিখে জানাই। কিন্তু কেউ কোন প্রতিকার করলেন না। এর অনেক পরে রাজশাহীর হিন্দুরা যখন মানসিকভাবে সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন, তখন ঐ ডি.এম.-কে ময়মনসিংহ জিলায় বদলি করা হয়। ওখানে গিয়ে তিনি প্রথমেই এক কলমের খোঁচায় ৭০০ হিন্দু বাড়ী অধিগ্রহণ করেন। (পৃ- ২২)

৫) সেনাপ্রধান মি. আইয়ুব খান ১৯৫৮-এ ক্ষমতা গ্রহণ করে আগের মুসলিম লীগকে আরও জঙ্গীরূপ দেন এবং হিন্দুদের জীবন যাত্রাকে আরও দুঃসহ করে তোলেন যাতে করে তারা পাকিস্তানের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। (পৃ-২২)

মি. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ-পত্রের কিছু অংশ আগেই তুলে ধরেছি। ঐ পদত্যাগ পত্রের আরও কিছু অংশ তুলে ধরছি এখানে।

১। ১৯৫০-এর ১০ ফেব্রুয়ারি "বেলা প্রায় ১-টার সময় একই সঙ্গে সমগ্র শহর

জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়। হিন্দুদের খুন করা, তাঁদের দোকান ও ঘরবাড়ী লুঠ করা ও আগুন লাগানোর কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায় শহরের সর্বত্র। ..... চরম আতঙ্ক নিয়ে আমি সব দেখলাম এবং নিকট জনের মুখে খবরাখবর শুনলাম। প্রাথমিকভাবে আমি যা' শুনলাম তা' এক কথায় মর্মান্তিক এবং হৃদয় বিদারক। (অনু - ২০)

২। "ঐ সময় আমি ৯ দিন ঢাকায় ছিলাম। .... ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল পথে ট্রেনের মধ্যে শত শত নিরপরাধ হিন্দুকে খুন করা হয়েছে। এই খবর আমাকে তীব্রতম আঘাত দিয়েছে। .... ১৯৫০-এর ২০ ফেব্রুয়ারি আমি বরিশাল যাই। ... জেলা শহরে বহু সংখ্যক হিন্দু বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিরাট সংখ্যক হিন্দুকে খুন করা হয়েছে। জেলার প্রায় সকল দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকা আমি পরিদর্শন করেছি। জেলা সদর থেকে মাত্র ৬ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ... কাশীপুর, মাধবপাশা এবং লাখুটিয়ায় মুসলমান দাঙ্গাকারীরা যে বীভৎস তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, তা শুনে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। মাধবপাশা জমিদার বাড়ীতে প্রায় ২০০ লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং ৪০ জনকে আহত করা হয়েছে। (*আসলে ঐ ৪০ জন আকস্মিকভাবে বেঁচে ছিলেন — লেখক*) মুলাদি এলাকাটি ভয়াবহ নরকে পরিণত হয়েছিল। স্থানীয় মুসলমান এবং কতিপয় অফিসারের রিপোর্ট অনুসারে একমাত্র মুলাদি বন্দরেই ৩০০-র বেশি হিন্দুকে খুন করা হয়েছে। আমি মুলাদি গ্রামেও গিয়েছি। কয়েকটি জায়গায় নরকঙ্কাল দেখলাম। নদীর তীরে দেখলাম কুকুর ও শকুনেরা পচা নর-মাংস খাচ্ছে। ওখানে আমি খবর পেলাম যে, ঐ এলাকার সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হিন্দুদের খুন করে সকল যুবতী মেয়েদের দুর্বৃত্ত সর্দারদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। রাজাপুর থানার অন্তর্গত কৈবর্তখালি গ্রামে ৫ জন (হিন্দুকে) খুন করা হয়েছে। থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের মধ্যে হিন্দুদের বাড়ীগুলোতে লুঠ-পাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষগুলোকে খুন করা হয়েছে। বিশদ বিবরণ থেকে জানা গেছে যে, একমাত্র বরিশাল জেলাতেই ২,৫০০ জনকে খুন করা হয়েছে। ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় প্রায় ১০,০০০ লোককে খুন করা হয়েছে। সত্যি সত্যি আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে ছিলাম। যে সমস্ত মহিলা এবং শিশু তাঁদের আপনজনসহ সব কিছু হারিয়েছেন, তাদের কান্নার রোল আমার হৃদয়কে বেদনাপ্লুত করে দেয়। আমি নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করলাম, ইসলামের নামে কি আসছে পাকিস্তানে?" (অনু- ২২)।

ইসলামের নামে কি আসতে পারে তা' মি. মণ্ডল এবং অন্যান্য হিন্দুরা ১৯৪১ খৃস্টাব্দেই জানতে পারতেন যদি তাঁরা ড. আম্বেদকরের লেখা 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া' শীর্ষক গ্রন্থটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। বরিশাল জেলার মুলাদিতে যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছিল, তা মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র সম্মত। মুসলমান আক্রমণকারী দস্যু মহম্মদ-বিন-কাশিম মাত্র ১৭ বছর বয়সে সিন্ধু জয় করার পরে দেবুল শহরের সব ব্রাহ্মণকে ডেকে খৎনা (CIRCUMCISE) করিয়ে মুসলমান করতে চাইলেন। ব্রাহ্মণরা রাজী হলেন না। কাশিম তখন ১৭ বৎসরের

বেশি বয়স্ক সব ব্রাহ্মণদের কেটে ফেললেন এবং নারী ও শিশুদের ক্রীতদাসে পরিণত করলেন। হিন্দু মন্দিরগুলোতে লুঠ-পাট চালালেন। লুঠ করা সম্পদের ৫ ভাগের এক ভাগ নিজে রেখে বাকী চার ভাগ সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এই তথ্যগুলো আমরা নিয়েছি ড. আম্বেদকরের লেখা থেকে।(স. গ্রন্থ-০১, ৮/৫৭) মনে রাখা প্রয়োজন যে, মুসলিম আইন অনুসারে বন্দী করা নারী-পুরুষ-শিশু 'যুদ্ধ-লব্ধ' সম্পদের (war booty) মধ্যে পড়ে (গণিমতের মাল)। সুতরাং মুলাদিতে সব পুরুষ হিন্দুদের কেটে ফেলে যুবতীদের দাঙ্গাকারী দুর্বৃত্তদের মধ্যে বন্টন করা ইসলাম বিরোধী কোন কাজ নয়। ইসলামের বিধান মেনেই এ কাজ করা হয়েছে।

যাক, আবার আমরা ফিরে আসছি প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর লেখা গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্যাবলীতে —

৮) ১৯৫২-এ পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর প্রতিবাদে মূলত বাঙালি মুসলমান ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেন। পাকিস্তান সরকার, বিশেষত পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার আবিষ্কার করে যে, এই আন্দোলনের ব্যাপারে হিন্দুদের, বিশেষত পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের গোপন হাত আছে। তাই দেরি না করে সর্বশ্রী মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী এবং প্রাণকুমার সেনকে কারারুদ্ধ করেন। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলীতে বলেন যে, হিন্দুরা লুঙ্গি ও পায়জামা পরে ভাষা আন্দোলন পরিচালনা করছেন। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিছু কমিউনিষ্ট ওখানে গিয়ে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। (পৃ-২৮-২৯)

৯) মি. আইয়ুব খান সামরিক আইন তুলে নিয়ে চালু করেন 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র'। এই পদ্ধতিতে ১৫৬ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ (পার্লামেন্ট) গঠিত হয়। এই ১৫৬ জন সদস্যের মধ্যে একজনও সংখ্যালঘু ছিলেন না। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে ১৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র তিনজন সংখ্যালঘু সদস্য ছিলেন। হিন্দুদের উপর সরকার এবং সরকারী অনুচরদের নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত সাহস তাঁদের ছিল না। (পৃ-৩৮)

১০) একমাত্র বার্মা ছাড়া কোন বিদেশী দূতাবাসে কোন সংখ্যালঘুকে চাকুরী দেওয়া হয়নি। ১৭-টি জেলার মধ্যে মাত্র একজন সংখ্যালঘুকে (শ্রীঅজিত কুমার দত্ত চৌধুরী) ডি. এম.-এর পদে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়। সামরিক শাসন শুরু হওয়ার পরপরই তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হন। (পৃ-৩৮)

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মুসলিম লীগ সরকার এই মর্মে একটি আইন পাশ করে যে, জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া কেউ ১০ বিঘার বেশি জমি বিক্রি করতে পারবে না। এর পরপরই একটি গোপন নির্দেশ পাঠিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের বলা হয় পারতপক্ষে হিন্দুদের যেন জমি বিক্রীর অনুমতি না দেওয়া হয়। জনাব আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে এ ব্যাপারে আইনের জটিলতা

আরও বৃদ্ধি করেন। ১৯৬৪-র ১২ ফেব্রুয়ারি একটি অর্ডিন্যান্স [East Pakistan Disturbed Persons (Rehabilitation) Ordinance (1 of 1964)] জারি করে হিন্দুদের জমিজমা বিক্রী করা বন্ধ করে দেন। কাগজে কলমে এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ছিল বেশ মজার — 'হিন্দুদের কল্যাণ সাধন করা'। আমরা হিন্দুরা তখন একেবারেই অসহায়। তাই একে ভবিতব্য বলে মেনে নিচ্ছিলাম। আওয়ামী লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির মুসলমান নেতারা ছিলেন নীরব। মুসলিম লীগ এবং জামাতপন্থী নেতারা খুশিতে ডগমগ ছিলেন। এমন এক করুণ ও অসহনীয় অবস্থায় বরিশালের শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার (যাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে) জমি কেনা বেচা সংক্রান্ত বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন। ঐ মামলায় তিনি জয়ী হন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। সেখানেও শ্রীসুতার জয়লাভ করেন। তবুও একজন হিন্দু একজন মুসলমানের মতো সহজে জমি বিক্রী করতে পারতেন না। দলিল রেজিষ্ট্রী করার সময় তাকে আলাদা ভাবে পাকিস্তানের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হত।

কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনাব আয়ুব খান ১৯৬৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর ভারত আক্রমণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান সরকার 'পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স' (Defence of Pakistan Ordinance) এবং 'পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন' (Defence of Pakistan Rules) চালু করে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জারী করা হল —

1. Enemy Property (Custody and Registration Order, 1965, and
2. East Pakistan Enemy Property (Lands and Buildings) Administration and Disposal Order of 1966.

পূর্বোক্ত প্রতিরক্ষা বিধির ১৬১ নং বিধানে 'শত্রু' এবং ১৬৯ নং বিধানে 'শত্রু সম্পত্তি'র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। শত্রু বলতে কোন গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রকে বুঝায় যিনি বা যাঁরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে বা আঁতাত করেছে বা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছে অথবা শত্রু দেশে বসবাস করছে। 'শত্রু সম্পত্তি' বলতে উপরোক্ত শত্রুদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বা শত্রু কবলিত মালিকানাধীন বা ব্যবস্থাপনায় ছিল বা আছে, তাই বুঝাবে।

৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ এবং পূর্বোক্ত অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার সকল হিন্দুরা নতুন করে মুসলমানদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হলেন। এর ফলে হিন্দুরা আবার দলে দলে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জনগণের কাছ থেকে যুদ্ধের খরচের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হত। অনেক ক্ষেত্রেই চাঁদা আদায় করার ভার ছিল থানার দারোগাদের উপর। কোন অসচ্ছল হিন্দুও যদি চাঁদা দিতে অস্বীকার বা দেরি করতেন তবে তাঁকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করা হত।

এই সময় পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণির সকল হিন্দু নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে কারারুদ্ধ করার ঘটনা

অত্যন্ত মর্মান্তিক। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি ৩০ বছর জেল খেটেছেন ব্রিটিশ ভারতে। আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি স্বাধীনতার পরেও দেশত্যাগ না করে দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৬৫-এর ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন —

" ... ৭৭ বৎসর বয়সে গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ সালে স্বাধীন পাকিস্তানে ময়মনসিংহ জেলে রাত্রি ১০-টার সময় পৌঁছিলাম। .... গত ১৮ বৎসর যাবৎ গঠনমূলক কাজই করিয়াছি। .... আমার দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ আমার স্থান হইয়াছে জেলে। আমি তৃতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট বন্দী। .... শুধু আমি নই, ... প্রত্যেক জিলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় লোক .... প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, ভূতপূর্ব মন্ত্রী, এম. পি. এ., ব্যবসায়ী সকলেই নিরাপত্তা আইনে বন্দী, সকলেরই একই অবস্থা, সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী।" (স.গ্র.-১৬, পৃ- ৩৭৩)

সামরিক বিভাগের প্রায় সকল হিন্দু কর্মচারীকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেসামরিক বিভাগের যোগাযোগ রক্ষাকারী সব হিন্দু কর্মচারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যুদ্ধ বিরতি ঘটে ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫। ফলে 'শত্রু-সম্পত্তি' আইনটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই আইয়ুব খান সাহেব ১৯৬৯-এর প্রথমেই 'শত্রু-সম্পত্তি' জরুরী বিধান অবিরতি অধ্যাদেশ (Ordinance No. 1 of 1969) জারি করেন। এর দ্বারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালু রাখা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসন আদায়ের জন্য ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে। ঐ বছর জুন মাসেই শেখ সাহেবকে কারারুদ্ধ করা হয়। শুরু হয় গণ আন্দোলন। এর অংশ হিসেবে ১৯৬৯-এর ৫ জানুয়ারি ছাত্ররা ঘোষণা করে ১১ দফার দাবি সনদ। গণ আন্দোলন চরমে ওঠে। ফলে ২৬ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ক্ষমতা পান সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সামরিক আইন চালু করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধুর পেছনে আছেন ওখানকার সব হিন্দু এবং ভারত সরকার। তাই তিনি হিন্দুদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেন।

এই সময় শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার মহাশয় ঢাকায় পাকিস্তান সংখ্যালঘু সম্মেলনের আয়োজন করেন (২২ ও ২৩ ডিসেম্বর,'৬৯)। এই সম্মেলনে ওখানকার সংখ্যালঘুদের উপর সংঘটিত নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানানো হয়। এবং আওয়ামী লীগের ৬-দফা এবং ছাত্রদের ১১-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৭০-এর ১ জানুয়ারি চিত্তবাবুর নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত 'জাতীয় গণমুক্তি দল' আত্মপ্রকাশ করে। এর কিছুদিন পরেই বঙ্গবন্ধুর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীসুতার ভারতে চলে আসেন। বঙ্গবন্ধু ভাল করেই জানতেন, যে কোন সময় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হতে পারে। এমন কি তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া

হতে পারে। সেক্ষেত্রেও যাতে মুক্তিযুদ্ধ ব্যাহত না হয় তা' নিশ্চিত করার জন্যই চিত্তবাবুকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের প্রথম শ্রেণির নেতাদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বিপদজনক কোন অবস্থা দেখা দিলেই তাঁরা যেন কোলকাতায় চিত্তবাবুর কাছে চলে আসেন। তৎকালীন প্রধান চার ছাত্র নেতাকেও অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন শেখ সাহেব। ২৫ মার্চের পরপরই আওয়ামী লীগের অনেক নেতা এবং প্রধান চার ছাত্র নেতা চিত্তবাবুর কাছে চলে আসেন। ঐ ছাত্র নেতাদের মধ্যে জনাব তোফায়েল আহমেদ এবং অধুনা প্রয়াত জনাব আবদুর রাজ্জাক ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। এঁরা দু'জনেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীসুতারের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। ঢাকার সাংবাদিক মাসুদুল হকের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে রাজ্জাক সাহেব বলেছেন —

"২৫ মার্চ রাতে যখন ক্রাক ডাউন শুরু হয়ে যায়, তখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমাদের কাছে একটা ঠিকানা ছিল। আমার কাছেও ছিল। তাজউদ্দিন আহমদের কাছেও ছিল, যেখানে ভারতে কোলকাতা গিয়ে দেখা হবে। ভাবলাম নিশ্চয়ই তাজউদ্দিন আহমদ সেই ঠিকানায় চলে গেছেন। ভাবলাম জায়গামত যাই। জায়গামত গিয়ে দেখি শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ।

" .... সে জায়গাটা কোলকাতার ২১, রাজেন্দ্র রোড (কোলকাতা-২০), যেখানে চিত্তরঞ্জন সুতার বঙ্গবন্ধুর রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে ছিলেন। ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই তাজউদ্দিন আহমদ চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে যোগাযোগ করেই (দিল্লী) গেছেন। গিয়ে শুনলাম যে, কোন যোগাযোগই করেননি (তাজউদ্দিন সাহেব)। তাঁকে (চিত্তরঞ্জন সুতার) জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত তিনি। তাঁর কাছে ঐ নামটাও (তাজউদ্দিন আহমদ) আছে। বিশ্বস্ত লোক — বিশ্বাস করা যাবে। এ কথা বঙ্গবন্ধু বলে দিয়েছেন।"



ঐ সাংবাদিকের কাছে তোফায়েল সাহেব বলেছেন — "১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু লন্ডন গিয়েছিলেন। সফরটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক। সেখানে

২১, রাজেন্দ্র রোডে (কোল-২০) অবস্থিত 'সানি ভিলা' নামের এই বাড়িতে থাকতেন চিত্তরঞ্জন সুতার। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পরে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অনেক নেতারাই এখানে আসতেন। ছাত্রদের সামরিক ট্রেনিং-এর যাবতীয় কাজ পরিচালিত হত এই বাড়ি থেকে।

বসে তিনি এই স্বাধীনতার পরিকল্পনা রচনা করেন। ... বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ফিরে এলে আমরা ট্রেনিংয়ের জন্য ... সত্তরের নির্বাচনের আগেও বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। ... তো মুক্তিযুদ্ধের সময় কোলকাতায় গিয়ে আমরা 'সানি ভিলা'-য় উঠি। একাত্তরের যুদ্ধ শুরু হবার আগেই এ বাড়ীটি নেওয়া ছিল। ... গণহত্যা শুরু হলে আমরা ভারতে গেলাম। ভারতে গিয়ে আমাদের আশ্রয়, যেটার ঠিকানা বঙ্গ বন্ধু আমাদের মুখস্ত করিয়ে দিয়েছিলেন, কাগজে লেখা ছিল, সেই ঠিকানায় শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং আমি গিয়ে উঠি।" (দেখুন- স. গ্রন্থ-৪০, পৃ- ১৭৩-১৭৪ এবং ১৯১-১৯৩)

একান্ত সাক্ষাৎকারে শ্রীসুতার আমাদের জানিয়েছেন, ১৯৬৯-এ লন্ডনে গিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেননি। এ পরিকল্পনা অনেক আগের। ঐ সময় তিনি গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় ২/৪ জন নেতা ছাড়া কেউই '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের বা চিত্তবাবুর অবদানের কথা স্মরণ রাখার প্রয়োজন বোধ করছেন না। বিরোধীরা তো ভারত এবং শ্রীসুতারকে তাঁদের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এঁদের মধ্যে চীনপন্থীদের কেউ কেউ শ্রীসুতারকে 'কুখ্যাত' আখ্যা দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার সঙ্গে যুক্ত করার অপচেষ্টা শুরু করেছেন। ১৯৯৭-এ বাংলাদেশে প্রকাশিত 'রাজনীতি, হত্যা ও বিভ্রান্ত জাতি' শীর্ষক একটি বই লেখেন জনৈক রইসউদ্দিন আরিফ। এই বই-এর ৪৯ নং পৃষ্ঠায় লেখক চিত্তবাবুকে 'কুখ্যাত' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন —

" '৭১-এর ভারত প্রবাসী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ও দিল্লী সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম লিঁয়াজো রক্ষাকারী কুখ্যাত চিত্তরঞ্জন সুতার '৭৫-এর ১৫ আগস্ট (মুজিব হত্যার রাতে) রাত ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকার বিশেষ এলাকায় অবস্থান করে রাত পৌনে বারোটায় তিনি বেনাপোলের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন...।" অথচ শ্রীসুতার সর্বশেষ ঢাকা ত্যাগ করেন ১৯৭৫-এর ২৯ জুলাই। তাঁর পাশপোর্ট নম্বর 'B– 047962 dt. 25.7.1974. এবং ভিসা নম্বর 25815 dt. 19.7. 1975.'

মুজিব হত্যার সঙ্গে চিত্তবাবুর নাম জড়াবার এই অপচেষ্টা কেন? কি অপরাধ করেছেন তিনি? তাঁর প্রথম অপরাধ তিনি হিন্দু; দ্বিতীয় অপরাধ তিনি এমন বাংলাদেশের চেয়েছিলেন যে বাংলাদেশ আক্ষরিক অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ হবে। সেখানে অমুসলমানরাও মুসলমানদের মতো রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারবেন। ম্যাডাম হাসিনা চিত্তবাবুর অবদানের কথা বিলক্ষণ জানেন। কারণ জার্মানী থেকে ফিরে এসে তিনি যখন কোলকাতায় ছিলেন তখন চিত্তবাবুই ছিলেন তাঁর স্থানীয় অভিভাবক। কিন্তু 'চিত্তবাবু হিন্দু, কোরানের বিচারে 'পৌত্তলিক এবং অবিশ্বাসী'।

ইসলামের দৃষ্টিতে এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

উদ্বাস্তু স্রোতের তৃতীয় ধাপ

(২৬ মার্চ,'৭১-ডিসেম্বর, ১৯৭১)

'হে নবী, কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জেহাদ কর এবং তাহাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। .....''- কো. ৯/৭৩

১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার তেত্রিশতম বার্ষিকীতে জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে দৈনিক গড়ে ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার লোক নিহত হয়েছেন। এছাড়া ইজ্জত ও প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভারতে পালিয়ে এসেছেন প্রায় ১ কোটি বাঙালি যাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৪ জন ছিলেন হিন্দু। কি এর কারণ? কারণ এই যে, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে হিন্দুদের ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ ভূমিধ্বস বিজয় লাভ করে। কিন্তু ইয়াহিয়া-ভুট্টো আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দিতে নারাজ ছিলেন। তাই আলোচনার অছিলায় সময় কাটিয়ে '৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্য রাতে ইয়াহিয়া নিজের দেশবাসীদের (পূর্ব পাকিস্তান) বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেন। দু'টো মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে একাজ করা হয়েছিল —

১) আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এবং

২) পূর্ব পাকিস্তানকে পুরোপুরিভাবেই হিন্দু-বৌদ্ধ শূন্য করা।

আক্রমণ শুরুর পর থেকেই আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও কর্মীরা, সেনা ও পুলিশ বাহিনীর কিছু লোক এবং সীমান্ত এলাকার আওয়ামী লীগের সমর্থক হিন্দু-মুসলমান সবাই ভারতে চলে আসেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারত সরকারের সাহায্য নিয়ে মুক্তি-বাহিনী এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের কাজ শুরু করে দেন। ওদিকে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ চরম মৌলবাদী মুসলমানদের সংগে নিয়ে শুরু করে ব্যাপক গণহত্যা। মুসলিম যুদ্ধরীতি অনুসারে অল্পদিনের মধ্যেই মুসলিম লীগ ও জামাতপন্থী মুসলমানদের নিয়ে গঠন করা হয় রাজাকার, আলবদর, ও আল-শামস বাহিনী। (পরিশিষ্ট-১৩) ঐ সময় রাজাকারদের সংখ্যাই ছিল এক লক্ষ। এই সব খুনী বাহিনীতে সাধারণ মুসলমান ছাড়াও মাদ্রাসার হাজার হাজার ছাত্র ও শিক্ষক যোগ দেয়। বাংলাদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হিন্দুরা ছিলেন একেবারেই নিরস্ত্র। বাঙালি পুলিশ বাহিনীর সিংহভাগ এবং আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মীও রাতারাতি পাকিস্তানপন্থী হয়ে যায়। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রাণ বাঁচাবার জন্যই পাকপন্থী হয়েছিল। সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আলবদর এবং রাজাকার বাহিনী একত্রিত হয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে পড়ে। তাদের প্রধান কাজ ছিল লুঠ-পাট, আগুন লাগানো, খুন, নারী ধর্ষণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ধরে এনে থানায় কিংবা

সেনা ক্যাম্পে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণ করা। সেখানে ঐ সব মেয়েদের উপর যে জঘন্যতম পাশবিক অত্যাচার করা হত তা' সুস্থ মানুষের কল্পনার বাইরে। অনেক ক্ষেত্রেই বাবা, ভাই বা স্বামীকে ধরে এনে তাদের সামনেই মেয়েদেরকে ধর্ষণ করা হত। এদের মধ্যে দু'চারজনকে সেনারা সাময়িকভাবে বিয়েও করত। এর নাম 'মুতা' বিয়ে। মুসলিম বিধান অনুসারে যে কোন বয়সের বিবাহিতা বা অবিবাহিতা বিধর্মী মহিলাকে বিয়ে করা যাবে, যদি ঐ মহিলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ মহিলাদের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য নয়। কোরানের ভাষায়, "সেই সব মেয়েলোকও তোমাদের প্রতি হারাম যাহারা অন্য কাহারো বিবাহাধীন রহিয়াছে; অবশ্য সেই সব স্ত্রীলোক ইহার বাহিরে যাহারা (যুদ্ধে) হস্তগত হইয়াছে।" (কোরান ৪/২৪) যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের বিবাহিতা মহিলাদের বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিয়ে খারিজ হয়ে যাবে এবং বিয়ে না করেই ঐসব মহিলাদের সঙ্গে যৌন সহবাস করা যাবে (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) যদি নাকি সে ঋতুমতী বা সন্তানসম্ভবা না থাকে।*

যুদ্ধবন্দী হিন্দু মহিলাদের সংগে যৌন সহবাস করা তো জলভাতের মতো ব্যাপার ছিল। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক সেনাপ্রধান লে. জে. আমীর আবদুল্লাহ্ খান নিয়াজী (১৯১৫-২০০৪) নিজেই ছিলেন একজন নারী ধর্ষণকারী। এই লোমহর্ষক তথ্যটি আমরা পেয়েছি মি. ভুট্টো কর্তৃক নিয়োজিত হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে —

"The troops used to say that when the Commander (Lt. Gen. Niazi) was himself a raper how could they be stopped. " p-3.

উক্ত কমিশন নিয়াজী সাহেবকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের ঐ দুর্যোগের সময় আমি খুবই ধর্মপরায়ণ হয়েছিলাম। এমনটি আর কখনও ছিলাম না।' এই ঘটনা থেকে আমরা ইসলামধর্মপরায়ণ ব্যক্তির একটি সংজ্ঞা পেলাম।

১৯৭১-এ কোরান-হাদিসের দোহাই দিয়ে এবং জামাতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে উপরোক্ত ধর্মপরায়ণ নিয়াজী সাহেব এবং টিক্কা খানদের সেনারা কি ভাবে বাঙালি মা-বোনদের যৌবন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে নৃশংস ভাবে খুন করেছে তা নিয়ে শতাধিক বই লেখা হয়েছে ইতিমধ্যেই। এর মধ্যে বিশেষ দু'টো বই-এর উল্লেখ করছি। প্রথম বইটির নাম 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' (স.গ্রন্থ-১৮); লেখিকা বাংলাদেশের প্রখ্যাত সমাজসেবিকা অধ্যাপিকা ড. নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২)। দ্বিতীয় বইটির নাম '৭১-এর নারী নির্যাতন'। প্রথম বইটি

* "It is permissible to have sexual intercourse with a captive woman after she is purified (of menses or delivery). In case she has a husband, her marriage is abrogated after she becomes captive." Vide. Chapter DLXVII of Sahih Muslim, Vol. II, p-743. (স.গ্র.-২৪)

থেকে আমরা কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

১। "১৯৭১ সালের উত্তাল আন্দোলনে আমি ছিলাম রাজশাহীতে। ..... ২৭ মার্চ .... হঠাৎ স্থানীয় চেয়ারম্যানের জীপ এসে থামলো আমাদের সামনে। বাবাকে সম্বোধন করে বললেন, ডাক্তারবাবু আসেন আমার সঙ্গে। কোথায় যাবেন নামিয়ে দিয়ে যাবো। বাবা আপত্তি করায় চার পাঁচজন আমাকে টেনে জীপে তুলে নিয়ে গেল। .... গাড়ি আমাকে নিয়ে ছুটলো কোথায় জানি না। ..... বুঝলাম আমাকে বাঘের মুখে উৎসর্গ করা হল। মানুষ কেমন করে মুহূর্তে পশু হয়ে যায় ওই প্রথমে দেখলাম। এরপর ১৬ ডিসেম্বরের (১৯৭১) আগে মানুষ আর চোখে পড়েনি।

প্রথম আমার উপর পাশবিক নির্যাতন করে একজন বাঙালী। আমি বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। অসুস্থ দেহ, দুর্বল মস্তিস্ক, যুদ্ধ করতে পারলাম না। লালাসিক্ত পশুর শিকার হলাম। ওই রাতে কতজন আমার উপর অত্যাচার করেছিলো বলতে পারবো না, তবে ছ'সাত জনের মতো হবে। ....." (পৃ-১৩-১৪)

২। "আমি মেরেজান বলছি। .... আমার জন্মস্থান ঢাকা শহরের কাছেই কাপাসিয়া গ্রামে। বাংলার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঐ গ্রামেরই বীর সন্তান তাজউদ্দীন আহমেদ ছিলেন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। ... নিজেকে একটা অশরীরী কঙ্কালসার পেত্নী বলে মনে হতো। কিন্তু তবুও এ দেহটার অব্যাহতি নেই। ... ময়মনসিংহ কলেজের এক আপাও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। .... ক'দিন পর আপা অসুস্থ হলো। শুয়ে থাকতো, ওকে শাড়ি পরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল ডাক্তার দেখাবার জন্য। আপা আর ফিরলো না। ভাবলাম আপা বুঝি মুক্তি পেয়েছেন, অথবা হাসপাতালে আছেন। কিন্তু না, আমাদের এখানে একটা বুড়া মতো জমাদারনী ছিল, বললো, আপা গর্ভবতী হয়েছিল, তাই ওকে মেরে ফেলা হয়েছে। .... দিন রাতের ব্যবধানও ছিল শুধু শারীরিক অবস্থা ভেদে। প্রথম রাত্রি যেতো পশুদের অত্যাচারে, বাকি রাত দুঃখ কষ্ট মর্মপীড়া, দেহের যন্ত্রণা এ সব নিয়ে। ..... মাঝে মাঝে কারও ব্যাধি মৃত্যু বা শারীরিক লাঞ্ছনা ছাড়া দিন এমনি করে গড়িয়ে যাচ্ছিল। বন্দীদের ভেতরে নানা বয়সের ও স্বভাবের মেয়ে ছিল। চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে থেকে চল্লিশ বছরের যৌবনোত্তীর্ণ মহিলাও ছিলেন। .... কে যেন লাউড স্পীকারে হুকুম দিলো, ওরা সব হাতিয়ার ফেলে দিলো যার যার পায়ের কাছে। কিছু মুক্তিবাহিনীর লোক, কিছু বিদেশী সিপাই মনে হল। কারণ ওরা হিন্দিতে হুকুম করছিল। জানালো বন্দী মেয়েরা মুক্ত। ওদের অভিজ্ঞতা আছে, তাই কিছু শাড়ি সঙ্গে এনেছে। সবাই পরে পরে যে যেদিকে পারলো ছুটলো। আমি শাড়ি পরলাম; কিন্তু লায়েক খানের হাত ছাড়লাম না। এতক্ষণে বুঝলাম হিন্দীভাষীরা ভারতীয় সৈন্য। একজন বললেন, মা, তোমার ভয় নেই, তুমি বললে তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দেবো। (পৃ-৩০ - ৩৪)

৩। "আমি রীনা বলছি। ... আমি নাকি অসাধারণ সুন্দরী ছিলাম। ঘরে বাইরে সবাই তাই বলতো। মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি না, খুঁত নেই আমার কোথাও, দীর্ঘ মেদশূন্য দেহ, গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিকা, পদ্মপলাশ না হলেও যাকে বলে

পটল চেরা চোখ, পাতলা রক্তিম ওষ্ঠ। একেবারে কালিদাসের নায়িকা! ...

"বেলা ১-টার মত হবে। মা আমাদের খাবার ব্যবস্থা করেছেন। এমন সময় একটা আর্মি জীপ এসে থামলো। আমার হৃদপিণ্ডের উত্থান-পতন যে আমি নিজে শুনতে পাচ্ছি। .... কথা শেষ হল না। 'কুত্তার বাচ্চা' সম্বোধনের সঙ্গে লাথি খেয়ে বাবা বারান্দায় পড়ে গেলেন। ছুটে গেলেন মা, মাকে ধাক্কা দিয়ে বললো, হট্ যাও বুড্ডী। তারপর স্টেনের *(স্টেন গানের)* আওয়াজ ঠ্যা ঠ্যা ঠ্যা। বাবা, মা, আলীর রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে। হতভম্ব আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। ক্রুদ্ধ মুখগুলো খুশিতে ভরে গেল। আইয়ে আইয়ে করে আমার হাত ধরে ঐ জীপে টেনে নিয়ে তুলে গেল। ....

"তারপর আমার এ সযত্নে লালিত দেহটাকে নিয়ে সেই উন্মত্ত পশুর তাণ্ডব লীলা! ভাবলে এখনও আমার বুক কেঁপে উঠে। আমাকে কামড়ে খামচে বন্য পশুর মতো শেষ করেছিল। মনে হয় আমি জ্ঞান হারাবার পর সে আমাকে ছেড়ে গেছে। লোকটাকে এক ঝলক হয়ত ঘুরে ঢুকতে দেখেছিলাম, তারপর সব অন্ধকার। সকালে মুখ ধুতে গিয়ে দেখলাম আমার সমস্ত শরীরে দাঁতের কামড় ও নখের আঁচড়। কামগ্রস্ত মানুষ যে সত্যিই পশু হয়ে যায় তা আমার জানা ছিল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম। ..... দু'দিন পর দেখলাম ওই ঘরেরই এক পাশে চার পাঁচজন উম্মত্ত পশু একটা মেয়েকে টেনে নিয়ে সবার সামনে ধর্ষণ করলো। ভয়ে কয়েকজন মুখ লুকিয়ে রইলো, কেউ বা হাসছে। ... (পৃ-৪৯)

৪। "..... '৬৯-এর আন্দোলনের সময় আমি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী; মিটিং মিছিল, পিকেটিং করেই স্কুলের পড়াশুনা চালিয়েছি। মা খুবই বকাবকি করতেন। মেয়েদের এতো ভাল না, এই কথা বহুবার বলেছেন। কিন্তু আমি পিতার আদরিনী কন্যা, আমাকে স্পর্শ করে কার ক্ষমতা! এরই ভেতর বাবা কারারুদ্ধ হলেন। ..... তারপর বেবী ট্যাক্সী থামিয়ে ওই জানোয়ারটা তার গামছা দিয়ে কষে আমার মুখ বাঁধলো। তারপর সোজা সেনানিবাস। আমি বন্দী হলাম। ফারুক আমাকে উপহার দিয়ে এলো। *(সেই)* ফারুক এখন জজ সাহেব। ..... "আমাকে বসতে দেওয়া হল। চা দেওয়া হল, আমি কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে অকপটে ফারুকের কাহিনী বর্ণনা করলাম। মা আর সোনালীর কথা উল্লেখ করলাম না। যদি তাদেরও ধরে আনে। ...... তারপর নেশাটা জমে এলে উঠে চট্ করে একটানে আমাকে বিবস্ত্র করলো। এলেন না কেউই রক্ষায়। প্রাণপণে চিৎকার করলাম। বাঘের থাবার মতো একটা মুখ চেপে ধরলো। বিবাহের প্রথম মধু যামিনী যখন শেষ হলো তখন আমার জ্ঞান নেই। .... এই কি দোজখ? ... সম্পূর্ণ নগ্ন আমরা। .... বুঝতে পারে শেফা, কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ মনে হলো দূর থেকে তারা সেই চিরকাংখিত ধ্বনি, 'জয় বাংলা' শুনতে পাচ্ছে। বিশ্বাস হয় না শেফার। আগে কয়েকবার এমন ধ্বনি তার কানে এসেছে। কিন্তু পরে দেখেছে ওটা মনের ভ্রান্তি। কিন্তু কি হচ্ছে, দুপদাপ শব্দে কারা যেন দৌড়াচ্ছে। তবে কি পাকিস্তানিরা পালাচ্ছে। বাংকারের মুখ দিয়ে এখন যথেষ্ট আলো আসছে। 'জয় বাংলা' ধ্বনি আরও জোরদার হচ্ছে। .... কয়েকজনের মিলিত কণ্ঠ, এবারে মা, আপনারা

বাইরে আসুন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা আপনাদের নিতে এসেছি। .... কিন্তু এতো লোকের সামনে আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, উলঙ্গ। দৌড়ে আবার বাংকারে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ প্রথম আওয়াজ দিয়েছিলো, কোই হ্যায়, সেই বিশাল পুরুষ আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে নিজের মাথার পাগড়ীটা খুলে আমাকে যতোটুকু সম্ভব আবৃত করলেন। ..... আমি ঐ শিখ অধিনায়ককে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠলাম। ভদ্রলোক আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন, 'রো মাৎ মায়ি'।" (পৃ-৬৫)

৫। ময়নার কথা। "ঢাকার ২৫শে মার্চের জুলুম আর অত্যাচার থেকে নারায়ণগঞ্জ দুরে রইলো না। ..... বাবাকে থানায় নিয়ে গিয়ে খুব মারধোর করলো। খবর পেয়ে ছুটে গেলাম আমি ও মা। বাবাকে ছেড়ে দিলো, জামিন রাখলো আমাকে। পাকিস্তানীদের অত্যাচারের দরজায় যখন আমি উৎসর্গীত হলাম তখন আর অনাঘ্রাতা পুষ্প নই। রাজাকারের উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছি। ..... গোসল খানার দরজা বন্ধ করা নিষেধ। লজ্জা বিসর্জন দিয়ে গোসল করে লুঙ্গী গেঞ্জি (সেটাও এদের দান) পরে নতুন ময়না বেরিয়ে এলাম। এবারে তাকিয়ে দেখলাম কাল আমরা যে ছ'জন এসেছি তাদের বাকি চারজন শাড়ি পরে বসে আছে, একজন গোছলখানায় আর বাকি ছ'জন, হ্যাঁ, ছ'জন যারা তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল তাদের সব লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা। লুঙ্গির ভেতর রক্ত ময়লা সব জমে আছে। কারণ ওগুলো কেউ ধুয়ে দেয় না। নিজেরা ধুয়ে ভিজেটাই গায়ে শুকাতে হয়। (পৃ-৮৬-৮৭)

৬। " ..... বাবা মা নাম রেখেছিলেন ফাতেমা। ..... আপা, ফাতেমা মরলো, ওই দিনই, ওই বস্তিতেই। বাপ ছেলে একই মেয়ের উপর বলাৎকার করেছে শুনেছেন আপনারা? ওই পিশাচরা তাও করেছে। আমি একা নই আমাদের সোনাডাঙ্গা গ্রাম থেকে মা মেয়েকেও এনেছে এক সঙ্গে, দু'জনকে পরস্পরের সামনে ধর্ষণ করেছে। (পৃ-১০৫) যশোরে আমাদের একটা ব্যারাকের মত লম্বা ঘরে রাখলো। অনেক মেয়ে। ২০-২৫ জনের কম না। সবাই কিন্তু খুলনার নয়। বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর এসব জায়গারও ছিল। তবে বেশিরভাগই আমার চেয়ে বয়সে বড়। একটাই মাত্র ১৪/১৫ বছরের বাচ্চা মেয়ে ছিল। ..... পানি পানি করে চিৎকার করলে মুখে প্রস্রাব করে দিয়েছে। .... একদিন এমন একটা কুৎসিত ঘটনা ঘটলো যা আপনাকে কি করে বলবো ভেবে পাচ্ছি না। ... আমাকে টেনে নিয়ে আমার পরনের লুঙ্গিটা দিয়ে আমার চুলের ঝুটি বেঁধে চেয়ারের উপর দাড়িয়ে পাখার সঙ্গে লটকে দিয়ে সুইচ অন করে দিলো। কয়েক মুহূর্ত চীৎকার করেছিলাম। তারপর আর জানি না। .... কয়েকদিন আমার উপর কোনও নির্যাতন করেনি ওই পশুরা। কিন্তু আবার যথাপূর্বম তথা পরম। ...... " (পৃ-১০৩ - ১০৭)

৭। " .... শুরু হল অত্যাচারের পালা। শকুন যেমন করে মৃত পশুকে ঠুকরে ঠুকরে খায় তেমনি, কিবা রাত্রি কিবা দিন আমরা ঐ অন্ধকার দোজখে পচতে লাগলাম। মাঝে মাঝে তারা উপরে ডাকতো আমাদের। আমরা গোসল করতাম, কাপড় বদলাতাম

তারপর আবার অন্ধকূপে। কারা আমাদের উপর অত্যাচার করতো, তারা বাঙালি না বিহারি, পাঞ্জাবি না পাঠান কিছুই বলতে পারবো না। ..... নানা রকম উপদেশ দিতো যাতে সহজে বাচ্চা না আসে। কারণ বাচ্চা পেটে এলেই ওরা যদি জানতে পারে তাহলে তো অমন করে খুচিয়ে খুচিয়ে খেলতে খেলতে মেরে ফেলবে। ..... অথচ আমরা অসংখ্য মেয়ে তখন ভূ-গর্ভের বাংকারে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। ....

"সত্যিই একদিন সব চুপচাপ হয়ে গেল, আমাদের বাইরে ডাকা হলো। কোথায় নেবে? সেই জোরালো বাতিটা জ্বলে উঠলো। কে একজন বললো, বাহার আইয়ে মাইজী, মা আপনারা বাইরে আসুন। কি শুনছি আমি, আমাকে 'মা' সম্বোধন করছে। আর চারমাস আমি ছিলাম কুত্তী, হারামী, বন্য জীবের চেয়েও ইতর। হঠাৎ এতো আপ্যায়ন। মানুষকে বিশ্বাস করতে ভুলে গেছি আমি।" (পৃ-১১৬ - ১১৮)

(ভারতীয় পৌত্তলিক সেনারা যুদ্ধে জিতে বাংলাদেশের সর্বত্র অত্যাচারিতা মহিলাদের 'মা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। ওদের লজ্জা নিবারণের জন্য শিখ সেনারা নিজেদের পাগড়ি খুলে দিয়েছিলেন। জানি না বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং ভারতের 'দলিত-মুসলিম' ঐক্য সৃষ্টিকারীদের ইতিহাসে এ ঘটনা স্থান পাবে কি না। — লেখক।)

দ্বিতীয় বইটিতেও ('৭১-এর নারী নির্যাতন') অনুরূপ ঘটনার বিবরণ আছে। তবে এই বই-এর দ্বিতীয় পর্বে ৩৭ জন অত্যাচারিত পুরুষ ও মহিলার অভিজ্ঞতার করুণ কাহিনী আছে (পৃ-৮০-১১২)। এর মধ্যে ভারতী বসু (স্বরূপকাঠী, বরিশাল) আমার বিশেষ পরিচিতা। এ ছাড়া পিরোজপুরের কাছে কদমতলা গ্রামের এক সন্তানের জননী বিধবা ভাগীরথীর উপর পাক-বাহিনীর নারকীয় অত্যাচারের বর্ণনা আছে। এই হতভাগিনীর কথা আগে বলে নেই। সে আত্মসমর্পণ (দেহ সমর্পণও) করেছিল খান সেনাদের কাছে। এই সুযোগে ফাঁদ পেতে সে প্রায় ৪০ জন খান সেনাকে তুলে দিতে পেরেছিল মুক্তিবাহিনীর হাতে। তারা সবাই প্রাণ হারায়। এর প্রতিশোধ নিতে খানেরা রাজাকারদের সহায়তায় ভাগীরথীকে ধরে আনে। একদিন বাজারের মধ্যে ভাগীরথীকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দু'পা দড়ি দিয়ে বেঁধে একটি জীপের পেছনে জুড়ে দেয়। এভাবে জীপটি নিয়ে শহরের সর্বত্র ঘুরে আসে। তখনও হতভাগিনীর প্রাণস্পন্দন থেমে যায়নি। নরপশুরা তখন ওর পা দু'টো জীপের সঙ্গে বেঁধে বিপরীত দিকে চালিয়ে দেয়। ভাগীরথীর দেহ দু'ভাগ হয়ে গেল। (পৃ-১১৪, দৈনিক আজাদ পত্রিকা ৩.২.'৭২)

পূর্বোক্ত ৩৭ জন প্রত্যক্ষদর্শীর একজন ঢাকা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সুইপার মিসেস রাবেয়া খাতুন। সুইপার হবার কারণে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি বলছেন, "পাঞ্জাবী সেনারা রাজাকার ও দালালদের সাহায্যে রাজধানীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ... থেকে বাঙ্গালী যুবতী মেয়ে, রূপসী মহিলা এবং সুন্দরী বালিকাদের .. বিভিন্ন ব্যারাকে জমায়েত করতে থাকে। ... ওরা (খান সেনারা) ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল, আমি .... ওদের বীভৎস পৈশাচিকতা দেখছিলাম। ... আমি দেখলাম পাক সেনারা ... সেই মেয়েদের উপর পাগলের মত উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারালো দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও

গালের মাংস ... রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ... যে সকল বাঙ্গালী যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করতো, দেখলাম তৎক্ষনাৎ পাঞ্জাবী সেনারা ওদেরকে চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছো মেরে ছিড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারাল ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছিল। ... (পৃ-৮১) .....

"এরপর উলঙ্গ মেয়েদেরকে .... দোতলা, তেতলা ও চারতলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ... কেউ উচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে উন্মুক্তবক্ষ মেয়েদের স্তন মুখ লাগিয়ে ধারাল দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্টহাসি করতো। ... (পৃ-৮২) বাকী ৩৬ জনের অভিজ্ঞতা মোটামুটি একই ধরনের।

আমাদের এই বই-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সমর্থক একজন মাওলানা এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে। তাকে পূর্বোক্ত বই দু'টি দেখিয়ে বললাম, 'মাওলানা সাহেব, আওয়ামী লীগের একজন সমর্থক হিসেবে এই বই দু'টি নিশ্চয়ই পড়েছেন।' উনি বললেন, 'হ্যা, পড়েছি।' ... 'এখন যদি আমরা বলি, এ জাতীয় অপকর্মের মূল উৎস হাদিসের একটি বিধান যেখানে বলা হয়েছে, 'ইহজগতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা না করলে মৃত্যুর পরে ঐ মুসলমান অবশ্যই স্বর্গে যাবে; এমনকিঐ ব্যক্তি যদি অবৈধ যৌন সংসর্গ এবং চুরি করার মতো অপরাধ করে তবুও' (হাদিস বুখারী, ৪র্থ খণ্ড/পৃ-২৯৬) তাহলে কি উত্তর দেবেন আপনি? যে উত্তরই দিন না কেন তা 'মিথ্যা' হবে না নিশ্চয়ই।' তার নাম প্রকাশ করা হবে না এই শর্তে তিনি বললেন, 'সত্য কথা বলতে হলে আমি বলব, আপনি ঠিকই বলেছেন। ঐ ধরনের হাদিসের জন্যই এ সব কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটছে। আমি আরও বলব, কোরান-হাদিসের বর্তমান রূপ পরিবর্তিত না হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে। কেউ আটকাতে পারবে না।'

সর্বস্তরের বাঙালি বুদ্ধিজীবী সহ সকল রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে পূর্বোক্ত 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' এবং '৭১-এর নারী নির্যাতন' শীর্ষক বই দু'টি পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ রাখছি আমরা। 'নয়া উদ্যোগ', শ্রীমানী মার্কেট (দোতলা), ২০৬ বিধান সরণি, কোলকাতা- ৭০০ ০০৬, এই ঠিকানায় এই বই দু'টি পেতে পারেন।

১৯৭১-এ আমরা দেখেছি ইয়াহিয়া-ভূট্টোর বশংবদ মোল্লা-মৌলভী-ইমামরা সুর করে করে পূর্বোক্ত বিধানটির বঙ্গানুবাদ ব্যাখ্যা করেছে। বাংলাদেশের পিরোজপুর জিলার স্বরূপকাঠী থানার (বর্তমান নাম নেছারাবাদ) অন্তর্গত শর্ষিণায় (ইসলামী নাম 'ছারছিনা') একটি মাদ্রাসা এবং একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। '৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের সময় ওখানে এই বিধানটির কথা প্রতিদিন শিক্ষা দেওয়া হত রাজাকারদের। এই অপকর্ম প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য হয়েছিল এই অধম লেখকের। যে জামাতে ইসলাম এবং তাদের চেলা-চামুণ্ডারা প্রতি পদে পদে পশুর পরিচয় দিয়েছে, আওয়ামী লীগও তাদের মেনে নিয়েছিল। সম্ভবত এই জন্যই বলা হয় রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। আর তাদের কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ করার জন্য কি

মুজিব-তনয়া শেখ হাসিনা তাদের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্থায়ী স্বীকৃতি দিলেন?

পাকিস্তান সরকার তার জন্মলগ্ন থেকেই সামরিক বাহিনীর প্রতিটি সৈনিককে কোরানে বর্ণিত দ্বি-জাতি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে আসছে। শিক্ষা দিয়ে আসছে হাদিস অর্থাৎ মহানবীর 'পবিত্র' বাণী যার সাহায্যে বিধর্মীদের নির্মূল করে 'পবিত্র' ইসলামের চাষ করা যায়। তাদের শেখানো হয়েছে যে, হিন্দুরা মুসলমানের জাত শত্রু। হিন্দুরা অবিশ্বাসী; তারা কাফের। তারা বিপথগামী। এই কাফেরদের ধ্বংস করতে পারলেই মুসলমানদের রাজত্ব নিষ্কণ্টক হবে। মাদ্রাসার লক্ষ লক্ষ ছাত্রদেরকে অনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। পাক কর্তৃপক্ষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, মুজিবুর রহমানের শক্তির উৎস ভারতের হিন্দু সরকার ও হিন্দু জনগণ। তাই তাদের আক্রোশের প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দুরা। ঐ সময় আমেরিকা ও চীন ছিল পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ১৯৭০-এর মার্চ থেকে ১৯৭১-এর জুন পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থানরত মার্কিন কনসাল জেনারেল ছিলেন আর্চার কে. ব্লাড বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন — 'পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত সৈন্যদের বদ্ধমূল ধারণা পূর্ব পাকিস্তানের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্য হিন্দুরা দায়ী। ..... মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ তাদের প্রচারে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে পাকিস্তান ভাঙ্গার ব্যাপারে ভারতীয়দের বা 'শয়তান হিন্দুদের' ষড়যন্ত্র বলে বর্ণনা করত। .... ১৪ মে 'হিন্দু-হত্যা' শীর্ষক এক টেলিগ্রামে লিখলাম, সেনা সদস্যরা গ্রামে ঢুকে প্রথমেই খোঁজ নিচ্ছে হিন্দুরা কোথায় থাকে। সেখানে গিয়ে তারা বেছে বেছে হিন্দু পুরুষদের হত্যা করছে। .....

পশ্চিম পাকিস্তনীরা হিন্দুদের পূর্ব পাকিস্তানের একটি অপশক্তি (নাশকতাকারী) মনে করত। হিন্দুরা 'দেশপ্রেম বর্জিত' বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট করতে চায় এমন ধারণা পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে বদ্ধমূল ছিল। আমাদের মতে, পাক-সেনারা স্থানীয় হিন্দুদের স্রেফ শত্রু বলে মনে করত। ... একাধিকবার অনেক পাকিস্তানি সৈন্য আমাকে গলা উঁচু করে বলেছিল, তারা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে হিন্দুদের মারতে।' ('প্রথম আলো', ঢাকা, ২৪ মার্চ, ১৯৯৯)।

১৯৯৯-এর নভেম্বরের ৩ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত লাহোরের কাছে বিরাট এক জঙ্গী সম্মেলন হয় সেনা ও তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান পারভেজ মোশারফের সরাসরি মদতে। জঙ্গী নেতারা এখানে যখন জেহাদের কথা ঘোষণা করেছিল তখন তাঁবুর বাইরে বোমা ফাটিয়ে, রাইফেলের সঙ্গিন উঁচিয়ে উল্লাস জানাচ্ছিল শ্রোতারা। তাঁবুর দরজায় প্রত্যেকের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছিল দশ টাকা। বলা হচ্ছিল "দশ টাকায় একটি বুলেট কেনা যায়। একটি বুলেটে একজন ভারতীয় জওয়ানকে হত্যা করা সম্ভব।" (দৈনিক বর্তমান ১১.১১.১৯৯৯; পৃ-৪)

পাকিস্তানী সেনা কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা '৯৯-এর ২১ সেপ্টেম্বর, নিউইয়র্কে বসে বাংলাদেশী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে যা' বলেছেন তার মধ্যে নতুনত্ব ছিল; ছিল মহা বিপদের অশনি সংকেত। সেদিন হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিক হবার চেষ্টা করুন, এক পা ভারতে আর এক পা বাংলাদেশে রাখবেন না। .... অর্পিত সম্পত্তি বাতিল করা সম্ভব নয়।' (দৈনিক 'মুক্ত কণ্ঠ', ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর, '৯৯, পৃ-৩) সেই অশনি সংকেতের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে গত ২০১১-র জুন মাস থেকে।

১৯৭১-এ দেশরক্ষার নামে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও নারীধর্ষণ করে যে কলঙ্কময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীতে তার নজির নেই। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্তানের মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি হিন্দুদের হত্যা করতে এবং তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করতে নির্দেশ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় শতকরা ৯০ ভাগ হিন্দুর বাড়ী ও সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়। হামুদুর রহমান কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে লে. কর্নেল আজিজ আহমেদ খান (স্বাক্ষী নং ২৭৬) বলেন, ঠাকুরগাঁও এবং বগুড়া পরিদর্শন করতে গিয়ে জে. নিয়াজী জিজ্ঞেস করেছিলেন — কত সংখ্যক হিন্দুকে তোমরা খুন করতে পেরেছ?' [H.R. Com. Report, page-9] জেনারেল নিয়াজীর ধর্ষণকামিতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত আজিজ আহমেদ খান আরও জানাচ্ছেন যে, ২৩ নং ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লা মালিক হিন্দুদেরকে খুন করার জন্য লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন। ['In May, there was an order in writing to kill Hindus. This order was from Brigadier Abdullah Malik of 23 Brigade.' - H.R.Report, page-9]

কোরানের ৫/৪৪ নং আয়াতে কাফেরের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা' হচ্ছে এই, " ··· যাহারা খোদার নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তাহারাই কাফের।" এই সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুরা অবশ্যই কাফের। সুতরাং রাও আবদুল্লাহ্ মালিকের নির্দেশ খুবই সঠিক ছিল। এই কাফেরদের সংগে মুসলমানরা কেমন ব্যবহার করবে তা' সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কোরানের বিভিন্ন আয়াতে। আমরা এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি।

১) "অতএব হে নবী, কাফের লোকদের কথা কস্মিনকালেও মানিও না, আর এই কুরআনকে লইয়া তাহাদের সহিত বড় জেহাদ কর।" (২৫/৫২)।

২) "হে ঈমানদারগণ, ঈমানদার লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। ...." (৪/১৪৪)।

৩) "হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ কর সেই সত্য অমান্যকারী লোকেদের বিরুদ্ধে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী রহিয়াছে। তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখিতে পায়। ...." (কোরান-৯/১২৩, *হিন্দুরা সত্য অমান্যকারী*)

৪) "যে সব লোক আমাদের আয়াত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে

তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করিব। যখন তাহাদের দেহের চামড়া গলিয়া যাইবে তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করিয়া দিব, যেন তাহারা আযাবের স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে।..." (কো-৪/৫৬)

৫) "নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের সেই সব মা'বুদ (দেব-দেবী), যাহাদের তোমরা পূজা-উপাসনা করিতে — জাহান্নামের ইন্ধন (জ্বালানী) হইবে, তোমাদেরও সেইখানে যাইতে হইবে।" (কোরান-২১/৯৮)


মি. চৌ-এন-লাই

দেশ ও ধর্ম রক্ষার নামে পূর্ববঙ্গের ইসলামী হত্যাযজ্ঞে পাক-বাহিনীকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল আমেরিকা এবং চীন। যে চীন তামাম দুনিয়ার অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত মানুষদের মুক্তির ইজারাদার বলে দাবি করে তারাই পূর্ব-বঙ্গের হিন্দু ও আওয়ামী লীগ ধ্বংসের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করেছে। '৭১-এর এপ্রিল মাসে চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে বার্তা পাঠিয়ে পাকিস্তানের 'জাতীয় স্বাধীনতা' ও 'রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব' রক্ষায় চীনের দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের কথা জানান।*

জুন মাস থেকে চীন প্রতিদিন একশতটি লরী ভর্তি সমর উপকরণ পাঠাতে শুরু করে। এছাড়া গেরিলা যুদ্ধবিরোধী ট্রেনিং-এর জন্য অত্যন্ত অভিজ্ঞ সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছে। সর্বাধুনিক রাইফেল, মেসিন গান, মর্টার, ট্যাঙ্ক ছাড়াও পাকিস্তান বিমান বাহিনীর জন্য ১ স্কোয়াড্রন ১১.২৮ বোমারু বিমান ও ৪ স্কোয়াড্রন মিগ-১৯ সরবরাহ করেছিল। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র মোহাম্মদ তোহা এবং যশোরের আবদুল হকের হাতে বেসরকারিভাবে বেশ কিছু অস্ত্র দিয়েছিল। (স.গ্র.-৪০, পৃ-১২৮)।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর সরকার বাংলাদেশের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করেছেন। এক দিকে বাংলাদেশ থেকে আগত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, এবং অন্য দিকে বন্যার স্রোতের মত চলে আসা শরণার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ভারতের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ কুষ্টিয়া জিলার বৈদ্যনাথতলায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা

---

* Message from Mr. Chau-en-lie: "Your Excellency may rest assured that should the Indian expansionists dare to launch aggression against Pakistan the Chinese Government and people will, as always, support the Pakistan Government and people in their just struggle to safeguard state sovereignty and national independence."[From: 'Bangladesher Swadhinata Yuddha : Dalilpatra, Vol. 13., p-593, 1st pub., 1982, Pub. Division, People's Republic of Bangladesh.]

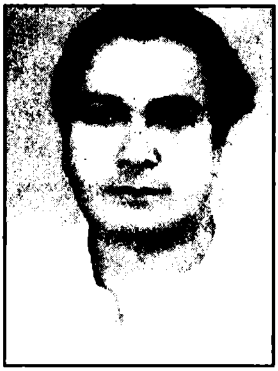
হয়। এই সরকারের কাজকর্ম পরিচালনা করা হত কোলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডের বাড়ী থেকে।

বাংলাদেশের আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণের কাজ পরিচালিত হত ২১, ড. রাজেন্দ্র রোড, কোলকাতা-২০ থেকে। মূল ব্যবস্থাপনায় ছিলেন পূর্বোক্ত শ্রীচিত্ত রঞ্জন সুতার। প্রধান সামরিক প্রশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল সুজন সিং উবান। দশ মাস ধরে বাংলাদেশ বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় থেকে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতকে সরাসরি আক্রমণ করে। ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনী ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সেনা বাহিনী এবং বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন (পরিশিষ্ট-১০)। সেদিন ৯৩ হাজার পাক সেনাকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

আজকের বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এ ঘটনাকে ভারতের অপরাধ বলে গণ্য করতে শুরু করেছে। তাদের কোরান ও হাদিসের বিচারে এ অপরাধ অমার্জনীয়।



মি. আবদুর রাজ্জাক



চিত্তরঞ্জন সুতার



জেনারেল উবান



তোফায়েল আহমদ



শেখ ফজলুল হক মণি

উদ্বাস্তু স্রোতের চতুর্থ ধাপ

(১৯৭২-২০০০)



গোলাম মোস্তাফা

মহানবীর ''সমস্ত সংগ্রামের মূল প্রেরণা ছিল পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৌহিদকে জয়যুক্ত করা। এ সংগ্রাম তাই প্রকৃতপক্ষে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে নয়, মক্কার বিরুদ্ধে নয়, ইহুদি-খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে নয়, জগৎজোড়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে।'' — গোলাম মোস্তাফা ('বিশ্বনবী'- পৃঃ-২৭০)

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হ'য়ে ঢাকা ফেরার পথে নতুন দিল্লীতে ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করলেন, ''ভারত হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।'' (স.গ্র.০৩; পৃ-১১৮) ভারত ও ভারতবাসীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে শেখ সাহেব ঐ '৭২-এর ১৯ মার্চ ভারতের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদী একটি মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন (পরিশিষ্ট-১২)। অথচ এর সাত দিনের মধ্যেই ২৬.৩.'৭২ তারিখে সমগ্র দুনিয়াকে বোকা বানিয়ে মুজিব সরকার 'বাংলাদেশ সম্পত্তি ও পরিসম্পদ ন্যস্তকরণ আদেশ' [Order 29, 1972] জারি করেন। এই আদেশ পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সঙ্গে সাবেক শত্রু সম্পত্তিও সরকারি ব্যবস্থাধীনে ন্যস্ত হয়।*

এই আদেশের ফলে সাবেক শত্রু সম্পত্তি আইনটি 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' হিসেবে বহাল থাকে। তারপর দীর্ঘ দিন ধরে আওয়ামী লীগ বলে এসেছিল যে, সময়মত এই অযৌক্তিক আইনটি তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু তা করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রধানমন্ত্রী থাক্যকালীন সময়েই শেখ হাসিনা ১৯৯৯-র ২১ সেপ্টেম্বর বলে দিলেন, এই আইন প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। আমাদের দৃষ্টিতে এর কারণ এই, পৌত্তলিক হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসীরা কোরান ও হাদিস অনুসারেই স্থায়ী শত্রু। তাই তাদের সম্পত্তি অবশ্যই শত্রু সম্পত্তি। ভাষার পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগ এর নাম দিয়েছে 'অর্পিত সম্পত্তি'।

মুজিব তনয়া দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে অর্পিত সম্পত্তি আইনটি সংশোধন করে পার্লামেন্টে পেশ করেছেন (২০১১)। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈ.স্টেটসম্যান পত্রিকায় (৭.৭.২০১১) শ্রীবাসুদেব ধর বিলটির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এটির সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরছি —

'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ হলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা হবেন শত্রু। উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নায়ক মাস্টারদা সূর্য

---

* "All propeties which during the Government of Pakistan vested in that Government have been from 26.3.71 vested in the Government of Bangladesh."



১৯৭২-এর ১৯ মার্চ ২৫ বছর মেয়াদী ভারত-বাংলাদেশ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবর রহমান। এই চুক্তি আজ ইতিহাসের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।



১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী ঢাকায় ভারত ও বাংলাদেশের যৌথবাহিনী প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং-এর কাছে বিনা শর্তে আর্তসমর্পণ করেন। ইতিহাসের এই অধ্যায় বাংলাদেশের ক'জন মুসলমান মনে রাখবেন তা বলা কঠিন।



১৯৪৬-এ ১৬ আগস্ট মিঃ জিন্নাহ্ বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে আমরা কোন নীতিশাস্ত্র আলোচনা করতে বসিনি। এর ফলশ্রুতি কয়েক হাজার হিন্দুর জীবননাশ। উপরে তারই একটি ছবি।



২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস করে দেয় আলকায়দা গোষ্ঠী। সব জঙ্গী গোষ্ঠীই দাবি করে যে, তারা সবচেয়ে বেশি ধর্মপরায়ণ। ঐ ধরনের ধর্মপরায়ণ জঙ্গীরাই এই উপমহাদেশে একের পর এক ধ্বংসাত্মক কাজ করে চলেছে।

সেন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন, একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলায় নিহত দার্শনিক অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন) ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য গোবিন্দ সিংহ মজুমদার—সবাই বাংলাদেশের শত্রু অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন অনুযায়ী এমনকী পশ্চিম-বঙ্গের প্রখ্যাত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও (১৯১৪-২০১০) এই শত্রু তালিকায় আছেন। তালিকায় আছেন প্রয়াত বিপ্লবী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রবি নিয়োগীও। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বাংলাদেশের শত্রুদের এই তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং শত্রু তালিকা প্রতিদিনই স্ফীত হচ্ছে। যদিও নামটি এখন ভিন্ন, অর্পিত।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় জারি করা জরুরি অবস্থার অধীনে প্রণীত হয় শত্রু সম্পত্তি আইন, যুদ্ধের পর গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার হলেও শত্রু সম্পত্তি আইন অব্যাহত রাখা হয়। একাত্তরের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ করার সময় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, পাকিস্তানের যেসব আইন স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সে সব আইন এ মুহূর্ত থেকে বাতিল হল। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে শত্রু সম্পত্তি আইন স্বাধীন দেশেও 'শত্রু' সম্পত্তি আইন স্বাধীন দেশেও 'শত্রু' হিসেবে বহাল থাকে।

১৯৬৫ সালে 'দ্য ডিফেন্স অব পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স'-এর মাধ্যমে শত্রু সম্পত্তি আইন জারি হয়। এই অধ্যাদেশে বলা হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানের যেসব নাগরিক ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের আগে থেকে ভারতে ছিল এবং সেই তারিখ থেকে ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভারতে চলে গিয়েছিল, তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সেই সঙ্গে তাদের বাড়িঘর ও জায়গাজমি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। ভারতকে শত্রুরাষ্ট্র চিহ্নিত করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করে 'ভেস্টেড অ্যান্ড নন-রেসিডেন্ট প্রপার্টি অ্যাক্ট' জারি করেন। কিন্তু কার্যক্রম রয়ে যায় পাকিস্তানি আমলের মতোই, সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল অব্যাহত থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে এবং প্রথমে খন্দকার মোশতাক ও পরে তাকে হটিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ৯২ ও ৯৩ নম্বর সামরিক অধ্যাদেশ জারি করে কার্যত মুজিবের বাতিল করা পাকিস্তানি আইনটিকেই ফিরিয়ে আনেন আরও ভয়ঙ্কররূপে এবং সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি আরও ব্যাপকভাবে শত্রু তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট একাধিক মামলায় সম্পত্তির তালিকায় হিন্দুদের সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করাকে বেআইনি ঘোষণা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাত এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, গত চার দশকেরও বেশি সময় এ আইনে ১১ লাখ ৫০ হাজার ৬০৬ হিন্দুখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিমাণ মোট হিন্দুখানার ৪৩ শতাংশ। এর

মধ্যে কৃষিজমি থেকে ৯ লাখ ৩৮ হাজার ১০৭ হিন্দুখানা, বাগানভূমি থেকে ৪১ হাজার ৪৬৩ হিন্দুখানা, পতিত জমি থেকে ২৮ হাজার ৪৮০ হিন্দুখানা, পুকুর ও পুকুরপাড় থেকে ৭৯ হাজার ২৯০ হিন্দুখানা, বাণিজ্যিক ভূমি থেকে ১০ হাজার ৩৬৬ হিন্দুখানা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ হাজার ১৮৩ হিন্দুখানা উৎখাত হয়েছে। ভিটেবাড়ি থেকে উৎখাত হয়েছে ৩ লাখ ৩১ হাজার ৭০৬ হিন্দুখানা। হারানো ভূমির পরিমাণ মোট হিন্দু মালিকানাধীন সম্পত্তির শতকরা ৪৫ ভাগ, যার পরিমাণ ২.০১ মিলিয়ন একর। টাকার অংকে যার মূল্য দাঁড়ায় ১৪ লাখ ১৬ হাজার ২৭৩ মিলিয়ন টাকা (২০০৭ সালের হিসেবে), যা জিডিপি'র শতকরা ৫২ ভাগ। গবেষণায় দেখা গেছে ১৯৬৫ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর ২ লাখ ১৮ হাজার ৯১৯ হাজার হিন্দু দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতিদিন দেশত্যাগ করেছেন প্রায় ৬০০। অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন গ্রাস করেছে বিপুল পরিমাণ দেবোত্তর সম্পত্তি ও মন্দির-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এখন বাংলাদেশে যারা রয়েছেন তাদের এক বিশাল অংশ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ি খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার বাড়ুলি গ্রামে। তিনি প্রয়াত হন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে, ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন। কিন্তু শত্রু হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন পাকিস্তানে, পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে। আচার্য রায়ের বাড়ির সামনের অংশ প্রত্নতত্ব বিভাগ দেখভাল করলেও বাড়ির বাদবাকি অংশ এবং বিশাল বাগান ও জায়গাজমি শত্রু সম্পত্তি হয়ে আছে। গত বছর বাড়িটি জামায়াতে ইসলামির এক নেতা দখল করেছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদ ও অবরোধের মুখে জামায়াত নেতা পালাতে বাধ্য হন। পুরো বাড়িটি শত্রু সম্পত্তির তালিকা থেকে মুক্ত করে সেখানে একটি জাদুঘর ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার দাবি দীর্ঘদিনের, কিন্তু কোনও সরকার কর্ণপাত করেনি।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান মাস্টারদা সূর্য সেন। অথচ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নথিপত্রে তিনি দেশের শত্রু, যদিও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাঁকে হত্যা করে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৪ সালে। চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে এই মহান বিপ্লবীর বাড়িঘর ও জায়গাজমি চিহ্নিত করা হয়েছে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে। মাস্টারদার বাড়ি ও জায়াগাজমি শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করা হয় জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনকালে ১৯৭৬ সালের ৮ নভেম্বর। নথি নম্বর ২৩৯। নথিতে সূর্য সেনকে শত্রু প্রমাণ করতে তাঁর হাল সাকিন দেখানো হয়েছে ভারত। অবশ্য সূর্য সেন ও তাঁর পরিবারের সব সম্পত্তি পরবর্তীকালে মাস্টারদা সূর্যসেন স্মৃতি সংসদের নামে লিজ দেওয়া হয়েছে। এই সম্পত্তির ওপর সংসদ নেতৃবৃন্দ একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন সহ অংশীদারদের উত্তরাধিকারের বিধান সহ পাস না হওয়া পর্যন্ত এই সম্পত্তি শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তি হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার জন্যে ১৯৪৮ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে প্রথম দাবি তুলেছিলেন কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। একাত্তরের ২৯ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে পাকিস্তানি সেনারা ধরে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় এবং দু'জনকেই গুলি করে হত্যা করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রামরাইলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। কুমিল্লা শহরে তাঁর বাড়িটি জাল দলিল করে দখলের চেষ্টা করা হয়।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের (জে এম সেন) চট্টগ্রামের রহমতগঞ্জের বাড়িটি শত্রু সম্পত্তি ঘোষণার পর দখল করে নিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ের অধ্যাপক শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইসহাক। ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রধান অনুসারি। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি আইন পেশা ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯৩৩ সালে রাঁচি জেলে অন্তরীন থাকা অবস্থায় যতীন্দ্রমোহন মারা যান। নেলী সেনগুপ্ত বেঁচে থাকতেই শত্রু সম্পত্তি আইনকে ব্যবহার করে তাঁকে রহমতগঞ্জের বাড়ি থেকে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করে ওই বাড়ি দখল করেন অধ্যাপক ইসহাক।

চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ার কবি নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭৫ সালে 'পলাশীর যুদ্ধ' মহাকাব্য লিখে ব্রিটিশ শাসকদের রোষানলে পড়েন। তখন তিনি ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করেন। ওই মহাকাব্য লেখার পর তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের নজরবন্দি হন। মৃত্যুর ৭৩ বছর পর ১৯৮২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে চট্টগ্রাম শহরের জামাল খান রোডে তাঁর বাড়িটি শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। পরে তাঁর বাড়িটি দখল করেন জামায়াতে ইসলামির কয়েক জন নেতা। নবীনচন্দ্র সেনের জ্ঞাতি ভাগ্নে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অনুপম সেন বলেন, নবীনচন্দ্র সেনের মতো কবির বাড়ি শত্রু সম্পত্তি, এর চাইতে লজ্জা ও দুঃখজনক আর কি হতে পারে। রাষ্ট্রেরই উচিত এ গ্লানি থেকে অচিরেই কবিকে মুক্ত করা।

সিলেটের চৌহাটার সিংহবাড়ি রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিধন্য বলে পরিচিতি পেলেও বাড়িটি বর্তমানে শত্রু সম্পত্তি। সিংহবাড়ির অন্যতম উত্তরসূরি সুজেয় সিংহ মজুমদার জানান, ঠাকুরদা গোবিন্দ সিংহ মজুমদারের আমন্ত্রণে কবিগুরু ও বিদ্রোহী কবি সিলেটে এসে এই বাড়িতে অবস্থান করেন। ৯৫.৬০ শতাংশ জমির ওপর গড়ে ওঠা এই বাড়িটি এখন শত্রু সম্পত্তি। এ সম্পত্তির ওয়ারিশসূত্রে মালিক উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মজুমদার, সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মজুমদার, শুভব্রত সিংহ মজুমদার ও সত্যব্রত সিংহ মজুমদার। এদের মধ্যে সুধীরেন্দ্র ও শুভব্রত ভারতে চলে যাওয়ায় পুরো সম্পত্তিই শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। সুজয় সিংহ মজুমদার উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মজুমদারের ছেলে। সুজেয় জানান, এই সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ায় তাঁরা খাজনা দিতে পারছেন না। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী সিলেটের সুহাসিনী দেবীর বাড়িও শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করে জবরদখলের চেষ্টা চালানো হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ড.গোবিন্দচন্দ্র দেবের সিলেটের বিয়ানি বাজারের বাড়িটি শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বরিশালের বানরি পাড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক অধ্যাপক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার বাড়িটিও শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্ত। ড. গুহঠাকুরতাও নিহত হন পাক সেনাদের হাতে। দুই শহিদের বাড়িই এখন অবৈধ দখলে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মাননা তালিকায় থাকলেও নারায়ণগঞ্জের বারদী গ্রামে তাদের ৬৮৩ নম্বর সি এস দাগের ৫৩ শতাংশ জমি শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়ে আছে।

বলা হচ্ছে, সংসদের চলতি অধিবেশনেই শত্রু সম্পত্তি আইনের কালো অভিশাপ থেকে দেশ ও জাতি মুক্তি পাবে, পাশ হবে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধনী) আইন। কিন্তু বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, যে বিলটি সংসদে উত্থাপন করা হচ্ছে সেটা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ তাই যদি হয়, একাত্তরে মুজিবনগরে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ সময়ের ঘোষণা, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ আদালতে পাকিস্তানের সেই আইনটি কয়েকবার মৃত রায় দেওয়া সত্ত্বেও সেই কালো অধ্যায় থেকে মুক্ত হচ্ছে না বাংলাদেশ। জেনারেল জিয়াউর রহমান সর্বোচ্চ হিংস্রতায় আইনটি বে-আইনিভাবে কবর থেকে টেনে তুলেছেন, এর পর থেকে আইনটির প্রয়োগ হয়েছে হুবহু পাকিস্তানি ধারায়।

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব) চিত্তরঞ্জন দত্ত বীর উত্তম বলেন, আসলে শত শত কোটি টাকার সম্পত্তি দখল করে নেওয়ার জন্যই সংখ্যালঘুদের শত্রু হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। যত বড় দেশপ্রেমিক কিংবা বিপ্লবী হোন না কেন তাদের একমাত্র অপরাধ তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন।'

বিলটি গত ২৯.১১.২০১১ তারিখে পাশ হয়ে গেছে। সরকারী হিসেব অনুসারে এ পর্যন্ত মুসলমানরা সংখ্যালঘুদের ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমি কেড়ে নিয়েছে। এর মধ্যে ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার একর হজম হয়ে গেছে। সরকারের হাতে আছে মাত্র ১ লক্ষ একর। (আ.বা.পত্রিকা, ১৫.১২.২০১১) কাগজে-কলমে এই ১ লক্ষ একর জমি সংখ্যালঘুদের ফেরত দেবার জন্য আইন পাশ করা হয়েছে। নতুন এই আইন অনুসারে একজন বাংলাদেশী মুসলমান (হোক না সে সাধু, মহাসাধু কিংবা চোর-ডাকাত, রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী বা নারীধর্ষণকারী) পৃথিবীর যে কোনো দেশে যতদিনই বসবাস করুক না কেন, বাংলাদেশে তার পৈত্রিক বা নিজের অর্জিত সম্পত্তি অটুট থাকবে। কিন্তু যেসব হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসী তাদের মা-বোন-স্ত্রীর ইজ্জত বাঁচিয়ে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে ভারতে চলে এসেছে, চিরদিনের জন্য তাদের সম্পত্তি হারাতে হবে, হোক না সে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাথী চিত্তরঞ্জন সুতারের কোনো বংশধর।

কিংবা ত্রৈলোক্য মহারাজ বা ইলা মিত্রের কোনো আপনজন। বর্তমানে যে সব হিন্দু বাংলাদেশে আছে, তাদের হারানো সম্পত্তি ফিরে পেতে হলে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক। এই **'স্থায়ী নাগরিক প্রমাণ করা'** যে কত কঠিন কাজ তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবেন না।

যাক, আমরা আবার ফিরে আসি ১৯৭১-এর কথায়। বাংলাদেশ সরকারের আশ্বাসেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক ভারত সরকার ১৯৭১-এ বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাসরত বিপন্ন হিন্দুদের দুর্গতির কথা জেনেও তাঁদেরকে বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন শেখ মুজিব মুক্তি পাবার আগেই। হিন্দু-বৌদ্ধ শরণার্থীরা তাঁদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবেই হোক আর মাতৃভূমির আকর্ষণেই হোক বাংলাদেশে চলে যাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। তখন কয়েকজন দূরদর্শী ব্যক্তি শরণার্থীদের পক্ষ থেকে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে বিগত ১০ মাসে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর দল নির্বিশেষে মুসলমানরা যে অমানবিক অত্যাচার চালায় তার বর্ণনা দেন। ঐ চিঠিতে তৎকালীন মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে এই মর্মে অনুরোধ করা হয়, তিনি যেন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ঐ ধরনের অত্যাচার না হতে পারে। চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, —

(১) বিগত ১০ মাসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হিন্দুদের উপর, বিশেষত হিন্দু মহিলাদের উপর যারা পাশবিক অত্যাচার করেছে তার মধ্যে আওয়ামী লীগ সহ সব রাজনৈতিক দলের মুসলমানরাই ছিল।

(২) হিন্দু যুবতী ও মহিলাদের ব্যাপক হারে অপহরণ ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে এবং বলপূর্বক বিয়ে করেছে মুসলমানরা।

(৩) হিন্দু মঠ, মন্দির এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহকে ধ্বংস করা হয়েছে। কোথাও কোথাও এগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

(৪) প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদে কোন সংখ্যালঘুকে নেওয়া হয়নি। 'ইয়ুথ ক্যাম্প এবং রিসেপ্সন ক্যাম্পগুলোর' ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ সকলেই ছিলেন মুসলমান। হিন্দু শরণার্থী ক্যাম্পসমূহে 'বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার কোর' নামে একটি সংস্থা কাজ করছিল। এই সংস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ছিলেন মুসলমান।

(৫) মুক্তি-যুদ্ধের পূর্বে যে সকল মুসলিম যুবকদের পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীতে, পুলিশ বাহিনীতে এবং আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীতে চাকুরী দেওয়া হত, তাদেরকে সাম্প্রদায়িক ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এরাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং স্বাভাবিক ভাবে এরাই নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের সেনা এবং পুলিশ প্রশাসন চালাবে। এরা নিশ্চিত ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঠাণ্ডা ঘরে বন্দী করে রাখবে।

(৭) আজ যে সকল শরণার্থী বাংলাদেশে ফিরে যাবেন তাঁরা ১৯৫০-এ নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরের পরেও পূর্ব-পাক সরকার কিভাবে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে

হিন্দু বিতাড়নের পরিকল্পনা রূপায়িত করেছিলেন তা' ভুলে যাননি। ঐ চুক্তি অনুসারে ভারত থেকে যে সকল শরণার্থী ফিরে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে তাঁদের হারানো সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত ছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সরকার তৎকালীন চিফ্ সেক্রেটারী মি. আজিজ আহমেদের মাধ্যমে একটি অতি গোপন সার্কুলার জারি করে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশ দেয় যে, ভারত থেকে প্রত্যাগত হিন্দু শরণার্থীদের যেন কিছুই ফেরত না দেওয়া হয়।

(৮) বাংলাদেশের নবগঠিত সেনাবাহিনী তাঁদের পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হিন্দু বিরোধী এবং ভারত বিরোধী স্লোগানকে পুঁজি করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে।

দরখাস্তকারীরা উপরোক্ত সমস্যাবলীর সুষ্ঠ এবং কার্যকরী প্রতিষেধক গ্রহণ করার পরেই অর্থাৎ একটি যুক্তিসংগত ও ফলপ্রসূ চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই কেবল শরণার্থীদের পূর্ববঙ্গে ফেরত পাঠানো যেতে পারে বলে যুক্তি দেন। তার আগে যেন তাঁদেরকে ফেরত পাঠানো না হয়। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শরণার্থীদের সিংহভাগ এই দরখাস্তের কথা জানতেন না। তাঁরা ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকেই মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া ভারত সরকার এর আগেই গোপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, '৭১-এর ২৫ মার্চের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে আসা শরণার্থীদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। পার্লামেন্টকে না জানিয়ে এবং নাগরিকত্ব আইনের রদবদল না ঘটিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিদঘুটে সার্কুলার জারী করা হয়েছিল (পরিশিষ্ট-'৯' এবং '১১' দেখুন)। তাই শরণার্থীরা চলে গেলেন বাংলাদেশে।

বিভিন্ন কারণে, বিশেষত বাংলাদেশের জাতীয় গণমুক্তি দলের প্রাণপুরুষ শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার মহাশয়ের প্রচেষ্টায় স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সরকার ওখানকার সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম মৌলবাদের চাপে বাস্তব ক্ষেত্রে এই চারটি আদর্শের কোন প্রতিফলন ঘটেনি। শেখ সাহেবের ইচ্ছা অনুসারে দেশের প্রথম সংবিধানে একটি ধারায় বলা হয়েছিল যে, 'বাংলাদেশে ধর্ম ভিত্তিক কোন রাজনৈতিক দল হইতে পারিবে না'। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন, 'বাংলাদেশের মাটিতেই পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের বিচার হইবে; বিচার হইবে পাক-বাহিনীর দোসর মানব সভ্যতার কলঙ্ক রাজাকার, আলবদর, আল-শাম্‌স বাহিনীর।' সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ভাসানী, ড. আলীম-আল-রাজী, অধ্যাপক আবুল ফজল এবং সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকাগোষ্ঠী। শেখ সাহেবের জামাতা অধুনা প্রয়াত জনাব এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া (শেখ হাসিনার স্বামী) তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, "১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে বসে সৌদি আরবের বাদশাহ বঙ্গবন্ধুকে সাফ

সাফ জানিয়ে দেন, অবিলম্বে সমস্ত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।" বাদশাহ আরও বলেন —"সৌদি আরব আর পাকিস্তান একই কথা। পাকিস্তান আমাদের সবচেয়ে অকৃত্রিম বন্ধু।" (স.গ্র.-০৩; পৃ-১৬০) কার্যত শেখ সাহেব তখনই আত্মসর্মপণ করেছিলেন ইসলামের কাছে। তিনি আলজিয়ার্স থেকে ফিরে আসার (১০.০৯.'৭৩) পরপরই সিদ্ধান্ত নেন যে, পাক যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেবেন। এবং অনেক তিক্ত পরিস্থিতির মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মিলে সিদ্ধান্ত দেয় যে, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে না। শুধু তাই নয়, সৌদি আরবের মন জয় করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে বলতে হ'য়েছিল — "আরবরা আমাদের স্বীকৃতি দিক বা না দিক, তাঁরা আমাদের ভাই।" (স.গ্র.-০৩/১৬৩) এখানে আমরা মহানবীর অমৃত (!) বাণীর সুর শুনতে পাচ্ছি যেখানে বলা হয়েছে 'এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই।' এর জন্যই ১৯৭৩-এর ৩০ নভেম্বর বঙ্গবন্ধুর সরকার দালাল আইনে অভিযুক্ত ও আটক ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ফলে দীর্ঘ দু'বছর ধরে খাইয়ে দাইয়ে ৯৩ হাজার পাক সেনাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন ভারত সরকার।

সৌদি আরবের চাপে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হয়। এর ফল স্বরূপ ১৯৭৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এবং বঙ্গবন্ধু পরের দু'দিনে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন। ওখান থেকে ফিরে আসার পূর্ব মুহূর্তে তিনি জুলফিকার অলী ভুট্টোকে (১৯২৮-১৯৭৯) বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। এদিকে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট ও খাদ্যাভাব। এর মধ্যেই মি. ভুট্টো ১০৭ জন সঙ্গী নিয়ে ২৭ জুন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে আসেন। তাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানান শেখ সাহেব। এই ভুট্টোই ১৯৭০-এ ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তান কোন সমস্যাই নয়। বিশ হাজারের মত লোককে মারতে হবে এবং তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।" (স. গ্র.০৩/৫৫)

১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ও মৌলবাদী চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করে। এরা খোন্দকার মোশতাক আহমেদকে ক্ষমতায় বসায়। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে বহুল প্রচারিত চীনও চরম সাম্প্রদায়িক এবং খুনী মোশতাক সরকারকে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি দেয়। এবারে সৌদি আরবও স্বীকৃতি দিল বাংলাদেশকে। ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী আওয়ামী লীগের ৪ জন প্রবীণ ও বিশিষ্ট নেতা যথা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয়। ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দু-বৌদ্ধরা দলে দলে ভারতে পাড়ি দেন।

আগের মতোই স্বাধীন বাংলাদেশে আজও (২০১০-১২) দফায় দফায় নারী ধর্ষণ হচ্ছে। ওখান থেকে হিন্দুদের এখানে চলে আসার এটি অন্যতম প্রধান কারণ। বিগত এক হাজার বছরের মধ্যে এই উপমহাদেশে মুসলমান কর্তৃক যতবার হিন্দু

নির্যাতন হয়েছে, ততবারই নারী ধর্ষণ হয়েছে। ১৯২১-এর মোপলা বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ১৯৪০ পর্যন্ত সংঘটিত নারী নির্যাতন সহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ড. আম্বেদকর (সহায়ক গ্রন্থ-১; ৮ম খণ্ড)। এছাড়া ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত সংঘটিত নারী ধর্ষণের বর্ণনা আছে বিভিন্ন বই-এ; অনেক প্রত্যক্ষদর্শী জীবিত আছেন আজও। ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে সংঘটিত অনেক নারী ধর্ষণের ঘটনা নিজের চোখে দেখার দুর্ভাগ্য ঘটেছে এই লেখকের। 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, ছেলের সামনে মা-কে এবং বাবার সামনে তার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশে হাজার হাজার হিন্দু যুবতী ও বধূকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এর আংশিক বর্ণনা পাওয়া যাবে জনাব সালাম আজাদের লেখা 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশ ত্যাগ করছে' শীর্ষক গ্রন্থে। আমাদের বই-এর এই সংস্করণের 'করুণ আর্তনাদের চরম ধাপ' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা এ ব্যাপারে অনেক তথ্য দেবো। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে, মুসলমানরা হিন্দু নারী ধর্ষণের প্রতি কেন এত বেশি আগ্রহান্বিত? উত্তরে দায়িত্ব নিয়েই বলা যায় —

১) ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে অহিংসার বিধান না থাকা এবং ব্রহ্মচর্য নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য (বুখারী শরীফের ৩২৩৯ নং বিধান) অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানরা দুর্বিনীত এবং অধিকতর কামোন্মাদ হয়ে থাকে।

২) ড. আম্বেদকরের দৃষ্টিতে পরাধীন ভারতে মুসলিম রাজনীতির অন্যতম কৌশল ছিল 'Gangsterism', বাংলায় বলা যায় 'দলবদ্ধ গুণ্ডামী'। (স. গ্র.- ১, ৮/২৬৯)।

৩) মুসলিম আইনে মুসলিম নারী ধর্ষণের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর; মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। পক্ষান্তরে হিন্দু নারী ধর্ষণের ক্ষেত্রে কার্যত কোন শাস্তির বিধান নেই মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে। বরং মোল্লা-মৌলবীরা এই বিধান দিচ্ছে যে, বিধর্মী নারীরা হচ্ছে 'গণিমতের মাল' (যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং এদের সাথে যৌন-সম্ভোগ বৈধ।

স্বরূপকাঠী থানার 'আলবদর ও রাজাকার' বাহিনীতে পূর্বোক্ত শর্ষিণার মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র যোগ দিয়েছিল। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শর্ষিণার তৎকালীন পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ। মিলিটারির সহযোগী হিসেবে এরা সকাল ৮-টা থেকে বিকেল ৫-টা পর্যন্ত হিন্দু এলাকায় লুঠপাট, আগুন লাগানো এবং নারীধর্ষণের কাজ করত। এর ফলে আমাদের অনেকে নৃশংস ভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আমরা অনেক কষ্টে ভারতে চলে এসেছি এবং এখনও চলে আসছি। বস্তুত মুসলিম ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে নারীধর্ষণ; বিশেষত হিন্দু নারী ধর্ষণ। এর মূল কারণ লুকিয়ে আছে মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই; হাদিস আল-বুখারীর ৪৪৫ নং বিধানের মধ্যে। আশার কথা এই, আজ অনেক মুসলিম যুবক-যুবতী এটা বুঝতে পারছেন। তাঁরা মুসলিম আইন শাস্ত্রের পরিবর্তন চান, যে পরিবর্তন জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত বিশ্বজনীন মানবাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

তাঁরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চান। কিন্তু বড্ড অসহায় তাঁরা। এ পর্যন্ত শেখ হাসিনার মধ্যে আশার আলো দেখতেন। কিন্তু শেখ হাসিনার অনৈতিক ইসলাম প্রীতি দেখে তারা হতাশ।

মাঝে মাঝেই বাংলাদেশের পরধর্মসহিষ্ণু এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে মোল্লারা। দাউদ হায়দার এবং তসলিমা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন অনেক আগেই। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে লণ্ডনে আছেন। মাসুদা ভাট্টিও থাকেন লণ্ডনে।

১৯৭১-র জুন-জুলাই মাস। বাংলাদেশের অনেক এলাকায় জমিতে ইরি ধানের চাষ হচ্ছিল। অনেক হিন্দু প্রাণ বাঁচাবার জন্য সকাল ৮-টার মধ্যে যার যা' জুটত তা' মুখে দিয়ে ধানের খেতে গিয়ে শুয়ে থাকতেন। কিন্তু আল-বদর, আল শামস ও রাজাকাররা মাছ মারার জন্য তৈরি 'কোচ' নিয়ে ধানের ক্ষেতে গিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে তুলে আনত লুকিয়ে থাকা হিন্দুদের। এই বর্বরোচিত কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য অনেক মোল্লা, মৌলবী এবং মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক পুরষ্কৃত হয়েছে।

বর্তমান পিরোজপুর জিলার অধীন স্বরূপকাঠী থানার হিন্দু এলাকার প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল আখ, পেয়ারা, নারকেল ও সুপারী। জুনের প্রথমে আমাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। আমরা পেয়ারা বাগানে গিয়ে ঝুপড়ি বেঁধে আশ্রয় নিয়েছিলাম। জুন মাসের শেষের দিকে হিন্দু এলাকার সব আখ ও পেয়ারা গাছ কেটে ফেলা হয়। তবে নারকেল ও সুপারী গাছ তেমন একটা কাটেনি। কিন্তু সব ফল পেড়ে নিয়েছিল। সেদিন দু'চারজন মুসলমান এই অমানবিক কাজে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত শর্ষিণার পীর সাহেবের মনোনীত মোল্লারা কোরান এবং হাদিস খুলে সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, কাফের বিতাড়নের এই পথ কোরান-হাদিস সমর্থিত পথ। আমরা সেদিন ও সব কথা বিশ্বাস করতে পারিনি। ভেবেছিলাম পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ভণ্ড মোল্লাদের সঙ্গে আঁতাত করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু পরে কোরান এবং হাদিস পড়ে দেখলাম সত্যি সত্যিই ঐ পথের কথা কোরান এবং হাদিসে আছে। মদিনা থেকে বনী নযীর গোত্রের (ইহুদি) লোকদের বিতাড়িত করার জন্য তাদের এলাকার অধিকাংশ খেজুর গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল নবী মোহাম্মদের নির্দেশে; যদিও আরবের নিয়ম অনুসারে খেজুর গাছ কাটা পাপের কাজ বলে গণ্য করা হত। নবী যে খেজুর গাছ কাটার নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'সহী মুসলিম শরীফে'-র (৩য় খণ্ড) ৪৩২৪-৪৩২৬ নং বিধান সমূহে।

গাছ কাটার পর নবীজীর সমালোচনা শুরু হয়। তখন খোদা কোরানের ৫৯/৫ নং বিধান অবতীর্ণ করলেন বলে দাবি করেছেন নবীজী। এই বিধানে বলা হল —

"তোমরা খেজুরের যে গাছ কাটিয়াছ কিংবা যেগুলিকে উহাদের শিকড়ের ওপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দিলে, এই সব আল্লাহ'রই অনুমতিক্রমে ছিল .... "

এসব বিধান সমূহ যখন পড়ছি, তখন ভাবছি, কেউ এসে বলুক, 'তুমি ভুল দেখছ, পবিত্র হাদিসে একথা লেখা নেই।' এ ব্যাপারে আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী

মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সেদিন বাংলাদেশের হাজারো জায়গায় হাজারো কায়দায় হিন্দুদেরকে খুন করা হয়েছে। পাক সেনাদের বিচারে আমরা ছিলাম পাপের সন্তান বা জারজ সন্তান। মুক্তিযোদ্ধা এবং আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদেরও ওরা একই চোখে দেখত। আমাদের মধ্যে ২/১ জন কোরানের দু'চারটি আয়াত মুখস্ত করে, নামায পড়া শিখে, দাড়ি রেখে এবং লুঙ্গি পড়ে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করেছিলাম। এমন এক নকল মুসলমান ধরা পড়ে পাক বাহিনীর মেজর ইফতিকারের হাতে, হবিগঞ্জে। তাকে যেভাবে খুন করা হয়েছিল তা' বলছি ইফতিকারের নিজের ভাষাতেই —

"আমরা এক বুড়োকে পাই," ..... "জারজটি দাড়ি রেখেছিল। ভাব দেখাচ্ছিল সে খাঁটি মুসলমান। নাম বলল আবদুল মান্নান, তৎক্ষনাৎ আমরা ডাক্তারি পরীক্ষায় নেমে পড়লাম এবং খেল খতম।" ইফতিকার বলে চলল, "আমি ঐ মুহূর্তেই ওটাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার লোকেরা বললো, এই ধরনের একটি জারজের জন্য তিনটি গুলির দরকার। প্রথম গুলিটি মারলাম তার অণ্ডকোষে, দ্বিতীয়টি পাকস্থলীতে। এরপর তাকে শেষ করলাম মাথায় গুলি করে।" (বাঙালী হত্যা ও পাকিস্তানের ভাঙন, মাসুদুল হক, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ-২৩৭)

একাত্তরের নৃশংস অত্যাচারের ফলে বেঁচে থাকার সব পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা দলে দলে চলে এসেছি এই ভারতে। সেদিন বাংলাদেশের পীর-মোল্লা-মৌলবীরা আমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়নের জন্য অনেক অকাট্য যুক্তি দিয়েছিলেন। এখানে ৩-টি যুক্তি উল্লেখ করছি —

১) আল্লার রসুল বলতেন, "একমাত্র মুসলমান ছাড়া ইহুদী খৃষ্টান সবাইকে আমি আরব ছাড়া করব।" (সহি মুসলিম, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং ৪৩৬৬)

২) মহানবী যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখনও তিনি ইহুদীদেরকে আরব ছাড়া করার কথা বলেছেন। (হাদিস নং ২৮৮, বুখারী শরীফ, ৪/১৮৩)

৩) আল্লার রসুল নবীজী বলতেন, "তোমাদের জানা উচিতএই পৃথিবীর মালিক আল্লা এবং তাঁর রসুল।" (সহি মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯৬৩, হাদিস নং-৪৩৬৩)

পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করার জন্য আমি (লেখক) ১৯৭১-এর প্রথমে বরিশাল গিয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর গহ্বর থেকে ফিরে আসি জুলাই মাসে। ঐ সময় আমাদের বাড়িতে কি ভাবে মন্দির এবং প্রতিমা ধ্বংস করা হয়েছিল তার খানিকটা বর্ণনা দিচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে 'পাড়া' বলতে যা' বুঝায় পূর্ববঙ্গে তাকে 'বাড়ি' বলে। ৩৫-টি পরিবার নিয়ে আমাদের বাড়ী। জুনের প্রথমে একদিন লুঠপাট হয়ে গেল। সকল পরিবারের ধান, চাল, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা এবং থালা-বাসন সহ যাবতীয় অস্থাবর সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যায়। এর দু'দিন পরে পাক-সেনাদের নেতৃত্বে শর্ষিণা মাদ্রাসার ছাত্র সহ প্রায় একশ' রাজাকার এসে আবার হামলা চালায়। বাড়ীতে কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া আমরা সবাই পেয়ারা বাগানের মধ্যে গিয়ে পালিয়ে থাকি। রাজাকাররা দু'টো দলে ভাগ হয়ে গেল। বড় দলটি গাছ থেকে নারকেল

পাড়তে শুরু করে। ছোট দলটি বাড়ি থেকে পালাতে না পারা ৭/৮ জন বৃদ্ধকে ডেকে এনে দুর্গা মন্দিরের সামনে দাঁড় করায়। তাদের হাতে ছিল বিভিন্ন ধরনের দেশী অস্ত্র। চার/পাঁচ জনের হাতে ছিল ছোট ছোট লোহার রড। প্রত্যেকটি রডের এক প্রান্ত সূঁচালো। ওদের দলপতি বলে, 'শালা, মালাউনের বাচ্চা, খুব তো ঘটা হইর্যা (করে) পূজা হরছো (করেছ) আর আম-লীগরে (আওয়ামী লীগকে) ভোট দেছো। অহন তোদের হগলেরে (সবাইকে) এহানে (এখানে) জবাই করুম। দেহি (দেখি) ঐ দুগ্গা মাগি বা চিত্ত হুতার (তৎকালীন এম. পি. শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার) আইস্যা তোদের বাচায় কিনা।' দুর্গা প্রতিমা দেখিয়ে একজন বলে — 'এই কুত্তার বাচ্চারা, ঐ বেশ্যা মাগীর পূজা হর (কর) ক্যান রে?' দু'জন বৃদ্ধ তখন মুর্ছা গেছেন। রাজাকার দলপতি বলে, 'ভয় নাই। তোদের জবাই করুম না। তোদের মত বুড্ডাদের কোতল করার নির্দেশ নবীজী দেয় নাই।' এই বলে ওরা মন্দিরে ঢুকে প্রথমে প্রতিটি প্রতিমার চোখে লোহার রড ঢুকিয়ে দেয় এবং পরে গুঁড়িয়ে দেয়। এরপর ওরা মন্দিরে এবং তার সঙ্গে বাড়ির ৩৫-টি ঘরের ৩৪-টিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলছে, রাজাকাররা তখন নারকেল ভাগ করছে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাজাকার দলপতি তখন বুড়োদের উদ্দেশে বলে, 'বাচঁতে চাইলে তিন দিনের মধ্যে সবাই মোছলমান হবি।' এই বলে রাজাকাররা চলে যেতে শুরু করে। রাজাকারবেশী একজন বয়স্ক ব্যক্তি ফিরে এসে বলেন, 'শুনুন, আমি রাজাকার নই। একটি বিশেষ কারণে আমি এদের দলে এসেছি। মুসলমান হয়েও আপনারা বাঁচতে পারবেন না। আপনারা বরং ইন্ডিয়ায় চলে যান। আপনারা কোরান হাদিস পড়েননি। আপনাদের নেতারাও পড়েননি। তাই 'ইসলাম কি আপনারা বুঝতে পারছেন না। আজ এই মূর্তিগুলো যেভাবে ধ্বংস করা হল, মক্কা জয়ের পরে মহানবী ঠিক এভাবেই কাবার মূর্তি সহ মক্কার সব মূর্তি ধ্বংস করিয়েছিলেন। নবীজী ধ্বংসের কাজ শুরু করেছিলেন নিজের হাতেই।'

আমাদের ঘর-বাড়ি পোড়ানোর দিন রাতে বৃদ্ধদের মুখে পূর্বোক্ত ঘটনা যখন শুনি তখন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি যে, ইয়াহিয়া বাহিনী যা' করছে তা' ইসলামের বিধান মেনেই করেছে। পরে যখন হাদিস পড়ার সুযোগ হল, তখন দেখলাম পাক-সেনারা এ ব্যাপারে ইসলাম বিরোধী কিছু করেনি। মক্কা জয় করার পরে ওখানকার কা'বা ঘরে রক্ষিত ৩৬০-টি মূর্তি ভাঙার কাজ শুরু করেছিলেন মহানবী নিজেই। বুখারী শরীফের ৩য় খণ্ডের ৬৫৮ নং হাদিসে (পৃ-৩৯৬) এর উল্লেখ আছে —

"658. Narrated Abdullah bin Masud : The Prophet entered Mecca and (at that time) there were three-hundred-and-sixty idols around the Kaba. He started stabing the idols with a stick he had in his hand and reciting : "Truth (Islam) has come and falsehood (disbelief) has vanished." অর্থাৎ সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যার অবসান হয়েছে।' এটি কোরানের ১৭/৮১ নং আয়াতের অংশ, যেখানে বলা হয়েছে — "And say :

Truth hath come and falsehood hath vanished away. Lo ! Falsehood is ever bound to vanish." (স.গ্র- ২১, পৃ-২০৯)

ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পরে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম পেয়ারা বাগানের মধ্যে। এই পেয়ারা বাগান কেটে ফেলা হল। এ কথা আগেই বলেছি। আমাদের বেঁচে থাকার আর কোন পথ খোলা ছিল না। একমাত্র উপায় ভারতে চলে আসা। কিন্তু কি করে আসব? কোন পথে আসব? হঠাৎ শুনলাম শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার মহাশয়ের নির্দেশে কোলকাতা থেকে শ্রীবিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস (শেখ মুজিবের দেওয়া ছদ্মনাম 'হামিদ') এবং শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোলকাতা থেকে এই খবর দিতে এসেছেন যে, ভারতে চলে যাওয়া সম্ভব। বাটনাতলা গিয়ে আমি (লেখক) এই খবরটি পাই। এবং স্বরূপকাঠী থানার পূব দিকে আটঘর-কুড়িয়ানা এলাকায় এই খবর পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই দায়িত্ব নিতে হয়েছিল আমাকে। আমার সৌভাগ্য যে, পাকা রাজাকারের বেশ ধারণ করে সে দায়িত্ব আমি পালন করতে পেরেছি। তবে যথেষ্ট ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। কারণ, আমাকে যেতে হয়েছিল মিলিটারিদের সামনে দিয়ে। প্রথম জীবনে নাটকে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা থাকায় এবং নামাজ পড়তে জানতাম বলে এ কাজ অনেকটা সহজ হয়েছিল।

এরপর আমরা চলে এলাম ভারতে। তখন আমাদের অনেকের জমি-জমা মুসলমানরা দখল করে নেয়। তার আগেও নিয়েছে শত্রু-সম্পত্তি আইনের দোহাই দিয়ে। আওয়ামী লীগ এর সবই জানত। তাই তাঁদের প্রবাসী সরকার কোলকাতা বসে সগর্বে ঘোষণা করেছিল, আমাদের সরকার সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। হিন্দু ভারত আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি আইন থাকবে না। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের হারানো সম্পদ ও সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ফিরে গেলেন। কিন্তু সম্পত্তির কাণাকড়িও ফেরত পাননি। মৌলবাদীদের বিচারে শত্রু-সম্পত্তি আইনটি কোরান সমর্থিত।

২০০১-এ জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী (খালেদা জিয়া) দেশের সব জেলা প্রশাসকদের ডেকে এক সেমিনারে অর্পিত সম্পত্তি আইনের ব্যাপারে লিজ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মতামত চেয়ে হাত তুলতে বলেন। যেসব ডি.সি. *(ডেপুটি কমিশনার)* হাত তোলেননি, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তাদের হাত তুলতে বাধ্য করান। (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৮.১.'০৫, পৃ-৪)

বিশ্বত্রাস বিন লাদেন জীবিত থাকতেই বাংলাদেশের মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ সর্বত্র তার লোক ঢুকে পড়েছে। স্কুলে স্কুলে তাদের কর্মকাণ্ডের কথা ওখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে বহু দিন ধরে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৮.১০.'৯৯ তারিখের 'প্রথম আলো' নামের দৈনিক পত্রিকায় মৌলভী বাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র লিখেছে —

"প্রতিদিন ক্যাডাররা আসে। সরকার, মহান মুক্তিযুদ্ধ, আর বিবেকবান সংবাদপত্র

ও বুদ্ধিজীবীদের জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করে লিফলেট, স্টিকার এবং তাদের মানসিক উন্মাদনার ফসল 'কিশোর কণ্ঠ' নামক একটি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পুস্তিকা প্রচার করে। এখানে তাদের স্কুল প্রতিনিধি আছে। ... প্রায়ই কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, যেখানে ৭৫ ভাগ থাকে তালিবানি প্রশ্ন।.... প্রশাসনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তারা প্রবল উস্কানিমূলক, দেশদ্রোহী বক্তব্য রাখে। এই নব্য রাজাকার, ধর্মান্ধ, শাস্ত্র উন্মাদ যুবকদের দৌরাত্ম্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ অসহায়।'' ব্যক্তি লাদেন আজ মৃত। কিন্তু লাদেনের 'থিম' (জেহাদ তত্ত্ব) ঘুরপাক খাচ্ছে কোলকাতা সহ বিশ্বের সর্বত্র। কয়েক বছর আগে এখানকার এক প্রথম শ্রেণির ইমাম টিভিতে প্রকাশ্যে হিন্দু প্রশাসনকে আলতোভাবে হুমকি দিয়ে বলেছেন, আপনারা আমাদের উপর ইনজাস্টিস্ করছেন। এটা বন্ধ করুন। তা না হলে আমরা জেহাদ করব। জেহাদ আমাদের ধর্মের অঙ্গ। কেউ আটকাতে পারবেন না। ইমাম সাহেবের পাশেই বসেছিলেন 'ধর্ম আফিম' তত্ত্বের প্রবল সমর্থক অস্থি চর্মসার প্রাক্তন নকশাল এবং হাল আমলের জ্যোতি বসুপন্থী এক নেতা। তিনি কিন্তু ইমাম সাহেবের বিন্দুমাত্র বিরোধিতা করেননি।

১৯৭৭-এর ২১ এপ্রিল জে. জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১) প্রেসিডেন্ট হয়েই সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি বাদ দেন এবং 'রাজাকার পুনর্বাসন প্রকল্প' চালু করেন।

২৪ মার্চ, ১৯৮২-তে হোসেন মহম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ২২ ডিসেম্বর প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, ইসলাম ও কোরানের নীতিই হবে দেশের সাংবিধানিক ভিত্তি। ১৯৮৩-এর ১১ ডিসেম্বরে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন। তিনি ঘোষণা করেন, বুলেট দ্বারা গঠিত সরকার এবং ব্যালট দ্বারা গঠিত সরকার, দু'টোই বৈধ। ১৯৮৮-এর ৭ জুন এরশাদ সরকার ইসলামকে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সংখ্যক মুসলমান হিন্দুদের বলতে শুরু করে 'কুত্তার বাচ্চা মালাউন, এখনই সব ইণ্ডিয়ায় চইল্যা যা'।

১৯৭৫-এর পরে জিয়াউর-এরশাদ গোষ্ঠী বাংলাদেশের বৌদ্ধদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালায়। এর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির এক মর্মস্পর্শী আবেদনে। ১৫.৮.১৯৮২-তে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, আমরা তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ—

১৯৭৯-এর ২৩ এপ্রিল খুব ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কানুনগো পাড়ায় এসে গ্রামের সব মহিলা, পুরুষ এবং শিশুদের ডেকে একত্রিত করে। এদের মধ্য থেকে প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মি. সিন্ধুকুমার চাকমা (৪০), কৃষক মি. অনাবিল চাকমা (২৫), তার ভাই মি. মোহন চাকমা (১৯), মি. বকুল চাকমা (২০) এবং অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মি. অরুণকান্তি চাকমাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে তাদের মা-বাবা, ভাই বোন, স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের সামনে গুলি করে হত্যা করে। সেনা গ্রুপ প্রধান এই হত্যাকাণ্ড আনন্দের সংগে উপভোগ করে। তারপর মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের

লোকদের নির্দেশ দেয় তারা যেন প্রথমে মৃতদেহগুলি কেটে টুকরো টুকরো করে এবং পরে আগুন জ্বেলে এগুলো পুড়িয়ে ফেলে। হতভাগ্য বৌদ্ধরা সেদিন ঐ নৃশংস কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৮০-এর ২৫ মার্চ। এদিন বিরাট সংখ্যক ভক্ত নোয়াপাড়া গ্রামের বৌদ্ধ মন্দিরের মেরামতি কাজ করছিলেন। তখন সেনাবাহিনী এসে সকলকে বুদ্ধ মূর্তির সামনে দাঁড় করিয়ে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক দ্বারা গুলি করে। সবাই লুটিয়ে পড়েন। সেনারা ছোট বড় সব বুদ্ধ মূর্তিগুলোকে ঘৃণাভরে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ওখানে যারা অত্যাচার চালিয়েছে তারা সবাই বাঙালি মুসলমান। একজনও পাকিস্তানি ছিল না। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বাঙালি মুসলমান সেনারা কেন বাঙালি হিন্দু-বৌদ্ধদের এমন নৃশংস ভাবে খুন করল? উত্তর কঠিন নয়। তারা ইসলাম ভিত্তিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্যই এ অপকর্ম করেছে। এই লোমহর্ষক ঘটনা সম্বলিত আবেদন পত্রটি আমরা এখানকার অনেক হিন্দুদের দেখিয়েছি এবং এখনও দেখাচ্ছি। এদের মধ্যে কমিউনিষ্টও আছেন এবং দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তারাও আছেন। এরা অনেকে ঐ নৃশংস অত্যাচারের কথা বিশ্বাস করছেন না। অনেকে বলেছেন, 'আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য দিল্লীর ক্ষমতা দখল করা। এর জন্য মুসলিমদের ভোট চাই। তাই ওসব কথা এখন বলবেন না।' এরপর জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধরা কেমন করে বেঁচে থাকবেন?' 'সেকথা ওদেরকে ভাবতে দিন।' দলিত-মুসলিম ঐক্যের একজন প্রবক্তা বললেন, 'হিন্দু ধর্ম আবার একটা ধর্ম নাকি? এটা যত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয় ততই মঙ্গল।' আবার প্রশ্ন করি, 'সত্য সত্যই যদি হিন্দু ধর্ম ধ্বংস হয়ে যায় তখন আপনাদের অবস্থান হবে কোথায়?' ভদ্রলোক বললেন, 'সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।'

কয়েক বছর আগে হুগলী জেলার রিষড়ায় অনুষ্ঠিত একটি বৌদ্ধ সভায় বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ পেয়ে ওখানে গিয়ে দেখলাম পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ গুরুদের প্রায় সকলেই উপস্থিত। আমার বক্তব্যের বিষয় ছিল 'ড. আম্বেদকরের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেবের অহিংসা'। বক্তব্যের মধ্যে বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে আমি ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি সম্পর্কে ড. আম্বেদকরের এই উক্তিটি উল্লেখ করেছিলাম — 'ইসলামের জন্ম হয়েছে 'বুত' বা 'বুদ্ধের' শত্রু হিসেবে। 'বুত' একটি আরবী শব্দ এবং এর অর্থ 'পুতুল'। .... শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর যেখানে যেখানে ইসলাম গেছে সেখানে সেখানেই তারা বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস করেছে।'* ধর্মগুরুরা কিন্তু কেউ তাঁদের বক্তব্যে

* "Islam came out as the enemy of the 'But'. The word 'But' as everybody knows is an Arabic word and means an idol. ...Islam destroyed Buddhism not only in India but wherever it went."

— Dr. Ambedkar. *'emphasis ours.'* সহায়ক গ্রন্থ-১, ৩/২২৯-৩০।

এই প্রসঙ্গটি তোলেননি। ১৯৪৬ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দুদের সঙ্গে বৌদ্ধরাও যে খুন হচ্ছেন — এই প্রঙ্গটিও কেউ উল্লেখ করলেন না। তাঁরা মহাসমারোহে বুদ্ধদেবের অহিংস তত্ত্বের জয়গান করলেন।

ঢাকার প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক জনাব সালাম আজাদ আর একটি লোমহর্ষক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটি ঘটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর থানার নিদারাবাদ গ্রামে; ১৯৮৮-এর ৫ মার্চ তারিখে। ঐ দিন মধ্যরাতে মৃত শশাঙ্ক দেবনাথের ঘরের দরজা ভেঙ্গে তাঁর বিধবা স্ত্রী বিরজা বালা (৪৫), তিন ছেলে - সুভাস দেবনাথ (১৩), সুমন দেবনাথ (৭) ও সুজন দেবনাথ (৩) এবং ২ মেয়ে মিনতি (১৭) ও প্রণতি (১১)-কে চোখ-মুখ বেঁধে দু'কিলোমিটার দূরে ধোপাবাড়ী খালের পাশে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে এবং মৃতদেহগুলি টুকরো টুকরো করে কেটে ড্রামে ভরে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শশাঙ্কবাবুর জমি অবৈধভাবে আত্মসাৎ করার জন্য তাঁকে খুন করা হয় ১৯৮৭-এর ১৬ অক্টোবরে। খুনীরা হল তাজুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, নজরুল ইসলাম, আজিজুর রহমান এবং ইনু। (স. গ্রন্থ-১০, পৃ-৪০)

১৯৮৯ থেকে ভারতের বাবরী-রামজন্মভূমি বিতর্ক শুরু হলে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সুযোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নতুন করে নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু হয়ে যায়।.... এরশাদ সাহেবের পতনের ঠিক পূর্বে ঢাকা থেকে প্রকাশিত জামাতে ইসলামের পত্রিকা 'ইনকিলাব'-এ ২৯.১০.১৯৯০ তারিখে বড় বড় অক্ষরে "বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ"— এই ডাহা মিথ্যা খবরটি প্রকাশিত হয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বিশেষতঃ ঢাকা, চট্টগ্রামের সমাজদ্রোহী দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিত ভাবে সংখ্যালঘুদের মন্দির ধ্বংস করে, ঘরবাড়ী লুঠ ও অগ্নিসংযোগ করে এবং সমগ্র দেশে কায়েম করে এক ভয়াবহ ত্রাসের রাজত্ব।

১৯৯২-এ ভারতের অযোধ্যায় অবস্থিত বাবরি মসজিদ নামে কাঠামোটিকে ধ্বংস করে হিন্দুদের একটি অংশ। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশের সর্বত্র ঘটে যায় হিন্দু নিপীড়ন যজ্ঞ। ঢাকা, সীতাকুণ্ড এবং ভোলার হিন্দুদের উপর পাশবিক অত্যাচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বোক্ত জনাব সালাম আজাদ জানাচ্ছেন - "অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ বিধ্বস্ত হবার পরে বাংলাদেশের ধর্মান্ধ স্বার্থান্বেষী শক্তির হামলায় আঠাশ হাজার ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে; এর মধ্যে সাড়ে নয় হাজার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। দুই হাজার সাতশ' বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছে। আর একটি মসজিদ ভাঙার প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে তিন হাজার ছয়শ' মন্দির ও উপাসনালয় সম্পূর্ণ ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্থ করে। সাম্প্রদায়িক শক্তির হামলায় শুধু বাড়ী-ঘর, মন্দির বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এই হামলায় আহত হয়েছেন দুই হাজার মানুষ এবং হত্যা করা হয়েছে বার জনকে। নির্যাতন চালানো হয়েছে দুই

হাজার ছয়শত মহিলা যুবতী তরুণীর উপর। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দুইশ' কোটির উপরে। অসহায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনকল্পে সরকারীভাবে তেমন কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ... পৌষের কনকনে শীতের মধ্যে সহায়সম্বলহীন হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নরনারীকে এন.জি.ও কর্মীরা খোলা আকাশের নীচে বসবাস করতে দেখেছেন। এই সব অত্যাচারিত মানব সন্তানদের বস্ত্র নেই, খাদ্য নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত নেই। তাঁরা আরো দেখেছেন, ইজ্জত হারিয়ে হাজার হাজার মা বোন মূক হয়ে গেছেন। ... 'হামলার সময় প্রশাসন কোথাও কোথাও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে, কোথাওবা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মদত যোগায়'। দেশের পাঁচটি বিভাগের সব ক'টিতে চলছে এই ধ্বংস যজ্ঞ। চৌষট্টিটি জেলার তেতাল্লিশটি সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে মৌলবাদীদের হামলায়।

বাংলাদেশে যে ক'জন পরধর্ম এবং পরমতসহিষ্ণু মুসলিম বুদ্ধিজীবী আছেন এই সালাম আজাদ তাঁদের একজন। ২০১০-এর প্রথমে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে কোলকাতায় তাদের ডেপুটি হাই কমিশনার পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এই খবর জানাজানি হতে না হতেই এখানকার প্রথম শ্রেণির ১৩ জন ধর্মপ্রাণ মুসলিম আলেম (বিদ্বান) ১১.০৩.২০১০ তারিখে শেখ হাসিনার কাছে চিঠি দিয়ে ঐ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে ঐ নিয়োগের কথা অস্বীকার করেন বাংলাদেশ সরকার। সেদিন চিঠিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন তাঁরা হলেন — ড. ওসমান গণী, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. এম. এন. হক, এ. হাসান, আইনুল হক, শাহ্ আলম, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, ড. মুজিবর রহমান, প্রফেসর আমজাদ হোসেন, আবদুর রউফ, পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী এবং ড. শেখ আবদুস সামাদ।

১৯৮২ থেকে বাংলাদেশে নতুন করে শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামীকরণ শুরু হয়েছে। নিত্য নতুন মাদ্রাসার জন্ম হচ্ছে। মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে সরকারী শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় বিনা পয়সায়। মাদ্রাসা সমূহে নবম-দশম শ্রেণিতে 'দাখিল ইসলামী পৌরনীতি' নামে একখানা বই পড়ানো হয়। ১০-টি অধ্যায় সম্বলিত এই বই-এ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে —

''ইসলামের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের মন-মগজ ও মানসিকতা এবং স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণকে ইসলামী পথে নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক কাজ। এখানেই শেষ নয়, ইসলামী আদর্শের বিকাশ দান ও তা' অনুসন্ধান করে চলার পথে যত প্রকার বাধা ও প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তা' দূর করা, ইসলাম-বিরোধী চিন্তা, সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় মতের প্রতিরোধ করাও ইসলামী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম।'' (পৃ- ৩৭)

এখানে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আওয়ামী লীগের সব শুভ প্রচেষ্টাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জামাতী মোল্লারা 'ইসলামের অনুকূল পরিবেশ' সৃষ্টি করে ফেলেছে এবং শেখ হাসিনা তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পরবর্তী নির্বাচনে

আওয়ামী লীগ বা অন্য যে দলই ক্ষমতায় আসুক, বাংলাদেশ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে হবে।

বাংলাদেশে অন্যান্য স্কুল সমূহেও নবম ও দশম শ্রেণির মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলাম ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে 'ইসলাম শিক্ষা' নামে একটি বই পড়ানো হয়। এই বই-এর (১৯৯৪ সংস্করণ) ১৯৬ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মুসলমান নাগরিক একে অপরের ভ্রাতা স্বরূপ।" ১৯৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, "ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়; যথা —

ক) মুসলিম নাগরিক এবং

খ) অমুসলিম নাগরিক

এই বই-এর ১১ থেকে ১৪ নং পৃষ্ঠায় শির্ক বা শেরেক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শির্ক বা শেরেক বলতে বুঝায় সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে অন্য কোন দেব দেবীকে শরিক করে উপাসনা করা। মুসলিম ধর্মশাস্ত্র বলছে, 'লা-শরীক আল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোন শরিক বা অংশীদার নেই। যদি কেউ আল্লাহ্‌র কোন শরিক বা অংশীদার কল্পনা করে তবে তা' হবে একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এই শির্কের মত অমার্জনীয় অপরাধ থেকে যারা মুক্ত থাকবে, তাদের জন্য রয়েছে অভাবিত পুরস্কার। মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যাবেই, তা ইহজগতে তারা যত ঘৃণ্য অপরাধ (অবৈধ যৌন সংসর্গ বা চুরি) করুক না কেন। হাদিসে বর্ণিত এই বিধানের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

খৃষ্টানরা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মনে করেন। তাই কোরানের ৫/৭২-৭৩ নং বিধানের দোহাই দিয়ে আলোচ্য পুস্তকে খৃষ্টানদেরকে সরাসরি 'কাফের' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। **হিন্দুদের ঈশ্বর ধারণা এবং উপাসনা পদ্ধতিকে রাজদ্রোহিতার মত অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।** এখানে আমরা এই বই ('ইসলাম শিক্ষা') থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"আরেক দল চিন্তা করে যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজন, এর পালনকর্তা আরেকজন ও প্রলয় কর্তা আরেকজন। এ ভাবে তারা তিন সত্তাকে মাবুদ ধারণা করে শির্ক করে। শির্কও কুফরের ন্যায় ভীষণ অপরাধ।" ...... "শির্কের অপরাধ যে কত মারাত্মক এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, শির্ক কখনও মার্জনীয় নয়। কুরান মজীদে বলা হয়েছে "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তার সাথে শরিক করার গুনাহ (পাপ) ক্ষমা করবেন না, তা' ব্যতীত যে কোন গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (কো-৪/১১৬)' শির্ক নামক মহাপাপ থেকে মুক্তি পাবার একটি পথ বর্ণিত হয়েছে ঐ বই-এর ১৪ নং পৃষ্ঠায়। পথটি হল এই, "আল্লাহ তালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তার বিধি নিষেধ পালন করা কর্ত্তব্য।" এই বাক্যের সহজ অর্থ হচ্ছে - অমুসলমানরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের বিধি বিধান মেনে চললে শির্কের মত মহাপাপের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।

জনাব গোলাম আযমের লেখা অনেকগুলো বই আছে বাংলাদেশে। বইগুলো

পশ্চিমবঙ্গেও বিক্রী হয়। একটি বই-এর নাম - 'বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলাম'। এই বই-এ জনাব আযম লিখেছেন, ''যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলে, তা'হলে ভারতের আধিপত্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনও উপায় থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু না হলে রাশিয়ার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এ দেশটি রাশিয়ার খপ্পরে পড়ারই প্রবল আশংকা আছে।'' কিভাবে জামায়াতে ইসলাম গ্রামে গ্রামে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ''মসজিদ সমূহকে সংগঠিত করার মাধ্যমে সাধারণ মুসল্লীগণকেও ইসলামী দাওয়াতের আওতায় আনা যাচ্ছে। ইমাম ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে বাংলাদেশে মসজিদ মিশন ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পল্লী অঞ্চলেও জনগণের মধ্যে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেছে।'' (স.গ্র.০৭, পৃ-৫৮) এই তত্ত্বকে আরও সুন্দরভাবে কার্যকরী করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদের সংগে একটি করে প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মনে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বীজ রোপণ করা হয়। মুসলমানরা খুশি। হিন্দুরা অসহায়। কোরানের বিধান অনুসারে খোদা হচ্ছেন আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের আলো। [Quran – 24/35 : "Allah is the light of the heavens and the earth. ..." — A.Yusuf Ali. p-261] এই খোদাকে খুব সহজে পাওয়া যাবে খোদার ঘরে অর্থাৎ মসজিদে। বিদেশী মুসলমানরা যখন ভারত আক্রমণ করেছেন তখন তারা যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এবং মসজিদ সংলগ্ন একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করেছেন। ড. মোহাম্মদ কালিমুদ্দিন তাঁর গবেষণাপত্রে [Islamic Education and Libraries in Bengal] দেখিয়েছেন, বাংলার কুড়ি জন মুসলমান শাসকদের প্রত্যেকেই মসজিদ সংলগ্ন বিদ্যালয় এবং একাধিক মাদ্রাসা নির্মাণ করেছেন। এঁদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ্ এবং রাজা গণেশের পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্ নাম নিয়ে মক্কায়ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৭১-এর আগে বাংলাদেশে ৯০ হাজার মাদ্রাসা ছিল। বিগত ৪০ বছরে এর সংখ্যা অন্ততঃ ৪০ গুণ বেড়েছে। এই মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্যসূচীতে —

১) ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের স্বীকৃতি নেই।

২) কোনো বিধর্মীকে কোথাও বন্ধু হিসেবে স্বীকার করা হয়নি।

সমগ্র বাংলাদেশে জঙ্গি আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি হলো পটিয়ার (চট্টগ্রাম) 'আল জামেয়া আল ইসলামিয়া'। এটি একটি কওমি মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ৪ হাজার। শিক্ষক আছেন ১০০। দেশব্যাপী ইসলামী আন্দোলনে ছাত্র-সেনা সরবরাহকারী অন্য দু'টি মাদ্রাসার নাম হচ্ছে চট্টগ্রামের আটহাজারীর 'দারুল উলুম মইনুল মাদ্রাসা' এবং লালখান বাজারের চানমারী লেন পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত 'দারুল উলুম মাদ্রাসা'। ('মায়ের ডাক', ১০.৯.'০৪)

১৭৮৯ খ্রী. কলকাতা মাদ্রাসার পত্তন হয়। ১৯৭৭ পর্যন্ত ১৯৭ বছরের মধ্যে এখানে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৬৯-টি। পরবর্তী ২৩ বছরে বামফ্রন্টের আমলে মাদ্রাসার সংখ্যা আরও ২৭০-টি বেড়েছে। ১৯৭৬-৭৭ শিক্ষাবর্ষে মাদ্রাসা খাতে বরাদ্দ

করা হয়েছে ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ২০০০-২০০১ শিক্ষা বর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৫ কোটি টাকা। সাধারণ শিক্ষা খাতে এই ২৩ বছরে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে ৪৩ গুণ। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০১০ গুণ; টাকার অঙ্কে ৩০০ কোটির কাছে। শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ১০ হাজার বেসরকারী মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিলেন। অচিরেই প্রতিটি হিন্দুকে এর মাশুল দিতে হবে। মাশুল দেবার হাত থেকে তিনি নিজেও বাদ যাবেন বলে মনে হয় না।

অনুন্নত দেশগুলিতে মাদ্রাসা ও মসজিদে জলের মতো টাকা খরচ করছে তেল-সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রগুলি। সৌদি আরব ভিত্তিক আল হারমাইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আরব আমিরশাহী ভিত্তিক আল হুজাইরা, দুবাই ভিত্তিক দারুল আনসা, আল থাইরিয়া, দৌলতুল কুয়েত, দৌলতুল বাহরিন সহ অনেক এন.জি.ও. ঐ সব মসজিদ-মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক। (সূত্রঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৪.১.'০৫, পৃ-৪)

বাংলাদেশে শিশু শ্রেণি থেকে এম.এ. পর্যন্ত যাবতীয় বাংলা পাঠ্য বই-এ মা, বাবা, কাকা, মাসি, পিসি, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, জল, মাংস, আমন্ত্রণ/নিমন্ত্রণ, স্নান, অতিথি, পুজো/উপাসনা প্রভৃতি শব্দ আর নেই। পরিবর্তে লেখা হচ্ছে 'আম্মা', 'আব্বা', 'চাচা', 'চাচী', 'খালা', 'ফুফা', 'দাদা', 'দাদি', 'পানি', 'গোশ্‌ত', 'দাওয়াত', 'গোছল', 'মেহমান', 'এবাদত' প্রভৃতি শব্দ। ব্যতিক্রম শুধু হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের আগেকার লেখা কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত দু'চারটি শব্দ। এ ছাড়া 'জলোচ্ছ্বাস' এবং 'মাংসপেশী' শব্দ দু'টো আছে। কারণ এর পরিবর্তে 'পানোচ্ছ্বাস' বা 'গোশ্‌তপেশী' এখনও চালু করা যায়নি। ছিঁটে ফোঁটা ব্যতিক্রম ছাড়া ওখানে হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ না করে কবর দেওয়া হয়। আমার মায়ের (লেখকের) মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম তাঁদের ছেলে-মেয়েরা জল কাকে বলে তা' জানে না। আমার মুখে মাংস শব্দটি শুনে ছেলেটি তার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মাংস কাকে বলে মা?'

ওখানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইতিহাস বই পড়ানো হয়, তাতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক অবদানকে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে।

আমার এক হিন্দু বন্ধু মুসলিম একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। গভীর দুঃখের সঙ্গে তিনি জানালেন, "আমার স্কুলের প্রতিটি মুসলিম অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু না কিছু বলতে হয়। আমাকে বলতেই হচ্ছে 'নবী মোহাম্মদ সকল দেশের এবং সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ।' বন্ধু সখেদে আরও বললেন — "তুমি জেনে যাও কৃষ্টিগতভাবে আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। এরপর কলেমা পড়ে মুসলমান হিসেবে যদি ভারতে যাই, তা'হলে কে আটকাবে?"

বাংলাদেশ থেকে ফেরার পথে খুলনা শহরে এসে একটি বিশেষ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম বাল্যবন্ধু জনাব আবদুর রব-এর কাছে। তাঁর প্রশ্নটি ছিল এই — "ভারতের হিন্দু নেতারা মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস থেকে কি কোন শিক্ষাই নেবেন না?" না, সেদিন আমার বন্ধুর ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। বন্ধু আরও বললেন, "তোমরা

হিন্দুরা যদি ভারতকে তোমাদের অধিকারে রাখতে চাও তাহলে তোমাদের ধর্মশাস্ত্রের আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জাতিভেদ, অহিংসা আর ব্রহ্মচর্যের মত অবাস্তব তত্ত্ব দিয়ে ভারতকে বাঁচাতে পারবে না।"

খুলনা শহরের উপকণ্ঠে গল্লামারি নামে একটি জায়গা আছে। এটি '৭১-এর কলঙ্কিত বধ্যভূমি। এই বধ্যভূমিতে কিভাবে মানুষ খুন করা হত তা' জানতে চাইলাম বন্ধুটির কাছে। বন্ধু বললেন, "ইসলাম ও দেশরক্ষার নামে সেদিন ইয়াহিয়ার কোতল বাহিনী খুলনার কয়েক হাজার মানুষকে এখানে এনে খুন করেছে। প্রথম দিকে এদের মধ্যে কিছু মুসলমানও ছিল। ওখানে যাদেরকে খুন করা হয়েছিল তাদের দ্বারাই প্রথমে কবর খুঁড়িয়ে নেওয়া হত। বাংলাদেশের সর্বত্র একই পদ্ধতিতে গণহত্যা করা হয়েছে। নবী মোহাম্মদও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন মদিনায়। সেখানে কুরাইজারা খন্দকের যুদ্ধে নবীকে সাহায্য না করে সাহায্য করেছিল নবীর শত্রু কোরেশ বাহিনীকে। এই অপরাধের জন্য নবীর ইংগিতে তারই প্রতিনিধি সা'দ ইবনে মুয়াধ *[Sa'd ibn Mo'adh]* কুরাইজাদের যে শাস্তি দিয়েছিলেন তা হচ্ছে এই, "সব পুরুষদের হত্যা করা হবে; নারী ও শিশুদের বিক্রি করা হবে এবং কুরাইজাদের অস্থাবর সম্পদ ('গণিমতের মাল') মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মুয়াধের এই 'রায়'-কে মহানবী মহান খোদার রায় বলে ঘোষণা করে বললেন — *'Truly the judgment of Sa'd is the judgment of God pronounced on high from beyond the seventh heaven,'* অর্থাৎ মু'য়াধের এই 'রায়' খোদারই 'রায়' যা তিনি সপ্তম বেহেশ্তের উপর থেকে উচ্চারণ করেছেন। যেদিন এই রায় দেওয়া হয়, সেদিন রাতে মদিনা বাজারের কাছে ৮০০ লোককে কবর দেবার মত গর্ত খোঁড়া হল এবং রাত শেষ হলে ভোরের নামায পড়ার পরপরই ওদের কোতল করার কাজ শুরু হয়। ঘাতকের ভূমিকায় ছিল আলি এবং তাঁর এক চাচাত ভাই যুবায়ের। প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত সাধারণ মানুষের সামনে এই কোতল পর্ব চলে। সমস্ত দিন ধরে নবী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থেকে প্রবল মানসিক শক্তির পরিচয় রেখেছেন। ঐ যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে ছিল জমি-জমা, অস্থাবর দ্রব্যাদি, পশু এবং শিশু বাদে এক হাজার ক্রীতদাসী। মহানবী এর প্রত্যেকটির পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিজে রেখে কয়েকজন মহিলাকে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ-দের উপঢৌকন দিলেন। অপর মহিলা ও শিশুদের বিক্রির জন্য নেজদ-এ পাঠিয়ে দিলেন।" আমি (লেখক) জিজ্ঞেস করলাম, "এসব কথা বানিয়ে ব'লছ না তো?" বন্ধুর উত্তর, "না, এসব কথা আমার বানানো নয়। উইলিয়াম মু'রের বই-এ এসব তো আছেই, বরং আরও ভয়াবহ তথ্য আছে এই বই-এ।" (স.গ্র.-৩৩/৩১৬-৩২২)

এখন আমরা পাকিস্তানের স্কুল পাঠ্য-পুস্তক থেকে দু'একটি উদাহরণ দেবো। শিশুদের জন্য নির্দ্ধারিত ওখানকার পাঠ্য পুস্তকে আমাদের দেশের মত অ-এ-অজগর, আ-এ-আম শেখানো হয় না। উর্দু বর্ণমালা 'ক্কাফ্' শেখাতে 'কাফের' শব্দ শেখানো হয়। এর ডান দিকে এক হিন্দুর রেখা চিত্র দেখানো হয় যার মাথায় থাকে টিকি এবং

পরনে থাকে ধুতি। অন্য একটি পাঠ্য পুস্তকে লেখা হয়েছে যে, ভারত একটি অসভ্য স্থান ছিল। অন্ধ বিশ্বাস এবং হিংস্রতার নরক কুণ্ড এই ভারতকে সভ্য করেছে ইসলাম। ৫ম শ্রেণির একটি পাঠ্য পুস্তকে লেখা হয়েছে — '১৯৬৫ সালে পাকিস্তানি সেনারা ভারতের বেশ কয়েকটা স্থান দখল করে নিয়েছিল। ভারত যখন প্রায় পরাজয়ের মুখোমুখি হয় তখন তারা সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের কাছে যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করার জন্য পীড়াপীড়ি করে। .... ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর ভারত পূর্ব-পাকিস্তানের বসবাসকারী হিন্দুদের মদতে সেখানকার লোকেদের পশ্চিম-পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়। তারপর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত নিজেই পূর্ব-পাকিস্তানে আক্রমণ চালায়। এই ষড়যন্ত্রের ফলে পূর্ব-পাকিস্তান আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের সবাইকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে দুষমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত'। (মুওয়াশরতি উলুম/পৃ-১৭-১৮) এই শিক্ষার ফসল আজমল কাসভেরা।

পাকিস্তানের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণির বইতে আছে, হিন্দুরা কেবল ধূর্ত ও ষড়যন্ত্রকারীই নয় তারা নিকৃষ্ট হত্যাকারীও বটে। দেশ ভাগ হবার পর যত হত্যাকাণ্ড হয়েছে সব হিন্দু শিখরাই করেছে। আরও অনেক পাঠ্য পুস্তকে এ জাতীয় মন্তব্য করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে ইসলাম ধর্ম এবং এর প্রবর্তক নবী মোহাম্মদ সম্পর্কে কণামাত্র অশালীন কথা নেই। বরং পৌত্তলিকতা সম্পর্কে নবীর মূল্যায়ন এবং কাজকে প্রায় উল্টোভাবে পড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

"মহম্মদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি পর্ণ কুটিরে বাস করতেন। নিজের হাতে ছেঁড়া পোষাক সেলাই করতেন। তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী হয়েও পৌত্তলিকদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। পরাজিত শত্রুর সাথে সব সময়ই উদার ব্যবহার করতেন। এমন কি জোর করে ধর্মান্তরিত করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন।" (পৃ- ২৪)

ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "ইসলামের সরল ধর্মমত, সুবিচার ও সাম্যের আদর্শ এবং সহনশীলতার নীতি মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করত"। (পৃ-২৫) অথচ ইসলামে বিধর্মীদের জন্য অসহিষ্ণুতা, অবিচার ও অসাম্যের অজস্র উদাহরণ আছে কোরান ও হাদিস সংকলন সমূহে।

উপরোক্ত ইতিহাস বই লিখতে গিয়ে প্রয়াত ড. অতুলচন্দ্র রায় বাঙালিকে পৃথিবীর একাদশ আশ্চর্য বস্তু উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ইসলাম একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম'। ড. রায় কি জানতেন না যে, কোরান-হাদিসে বিশ্বাসীরা দীর্ঘদিন আগে থেকেই সর্বত্র ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলামের শত্রু বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম যদি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মই হবে, তবে একে মুসলমানরা শত্রু বলে ঘোষণা করলেন কেন?

শুধু অতুলচন্দ্র রায় নন, ইসলাম ও নবীজীকে মহান করে তুলে ধরার (অপ) দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ অসীম পাণ্ডিত্যের অধিকারী স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯)। আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি হযরত মহম্মদকে 'মহাত্মা' বলে চিহ্নিত করেছেন। (দেখুন- শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ কথিত মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ' — একটি পর্যালোচনা।)

ছাত্র জীবনে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সুরাবর্দিপন্থী ছাত্রনেতা। সুরাবর্দি সাহেব '৪৬-এর কোলকাতা মহাদাঙ্গার নায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে অনেকে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ দিয়েছেন। তবে পরিণত বয়সে তাঁর চিন্তার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল। ষাটের দশক থেকে তিনি খুব সঠিক ভাবে বুঝেছিলেন যে, পূর্ববঙ্গে বসবাসরত হিন্দু এবং ভারতের সহোযোগিতা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিম শাসকদের হঠানো যাবে না। এই সঠিক চিন্তাধারার ভিত্তিতেই তিনি গণ-আন্দোলন চালিয়েছিলেন এবং এই আন্দোলনের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে যে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারত অর্থ, অস্ত্র এবং রক্ত দিয়ে শেখ সাহেবকে সাহায্য করেছিলেন। আমাদের দৃষ্টিতে এটি বিশ্ব রেকর্ড। ১৯৭১-এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশ অন্য কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অর্থ, অস্ত্র এবং রক্ত দিয়ে সাহায্য করেছে বলে আমাদের জানা নেই। সেই শেখ সাহেব বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে কোরানপ্রেমী হয়ে যান এবং মৌলবাদীদের চাপে পড়ে ভারত তথা হিন্দুদের অবদানের কথা ভুলে যেতে শুরু করেন। ১৯৭৪-এ তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত চরম সাম্প্রদায়িক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করে ধর্মনিরপেক্ষতা র প্রতি চরম আঘাত হেনেছিলেন।

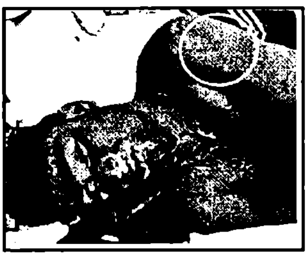
ইসলাম বাংলাদেশের মাটি থেকে কমিউনিজমকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অনেক দিন আগে থেকেই আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পরিহার করে চলছেন। কারণ, তারা বুঝেছেন ইসলাম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সহাবস্থান হতে পারে না।

প্রথম সংস্করণে আমরা বলেছিলাম, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে হেরে গেলে ক্ষমতায় আসবে বিএনপি ও জামাতপন্থীরা। তখন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থা হবে বর্তমানে পাকিস্তানে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের মত। ওখানে সংখ্যালঘুরা (শতকরা ১.৮ ভাগ মাত্র) আক্ষরিক অর্থে জিম্মীর জীবন যাপন করছেন। কার্যত তাঁদের কোন নাগরিক অধিকার নেই। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরাও কার্যত জিম্মীর জীবন যাপন করছেন। এর কারণ বুঝতে হলে ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ পরিষ্কার ভাবে জেনে নিতে হবে। স্কুল বা কলেজের কোন পাঠ্য বই পড়ে ইসলামের রীতি-নীতি ও কার্যক্রম বোঝা যাবে না। পড়তে হবে কোরান, হাদিস এবং তার সঙ্গে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের লেখা বই-পত্র। যেমন —

1. Indian Islam – by Dr. Titus.
2. Medieval India – by Lane Poole.
3. The Life of Mahomet – by W. Muir.
4. History of India - as Told by Its own Historians - Elliot & Dowson. (8 Volumes)
5. Mohammed And The Rise of Islam by D.S. Margoliouth.

এই বইগুলি সংগ্রহ করতে অসুবিধা হলে ড. আম্বেদকরের 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া' (তাঁর ইংরেজী রচনাবলীর ৮ম খণ্ড) পড়ার জন্য আমরা সকলকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আর যারা ২০০১-এর ১ অক্টোবর থেকে ১৫০০ দিন ধরে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ জানতে চান তারা বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মী জনাব শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত 'শ্বেত-পত্রঃ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন (২০০৫) এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক মহা সঙ্কট' শীর্ষক গ্রন্থ দুটি পড়বেন।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবায়ন না হলে হিন্দু-বৌদ্ধদের-মেথর-মুচি-চামার সকলকেই মুসলমান হতে হবে। হিন্দু-বৌদ্ধ এবং দলিত নেতৃবৃন্দ জেনে রাখুন, তখন বিপদ আসবে অন্যভাবে, অন্য রূপ নিয়ে। নয়া মুসলমানরা ভীষণভাবে প্রতি-হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে। দলে দলে তারা ছুটে আসবে ভারতে। ভোট-ভিখারীর এই দেশটিকে 'ব্যালট তত্ত্ব' দিয়েই তারা দখল করে নিতে পারবে।



প্রসঙ্গত বলছি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা থেকে বিকাশ দাস নামে ঋষি সম্প্রদায়ের একজন যুবক এসে তাদের উপর মুসলমানরা যে অত্যাচার করে তার লিখিত বিবৃতি এবং ছবি দিয়ে গেছেন। তাদের বলা হচ্ছে, হয় মুসলমান হও, নয়ত অত্যাচারিত হও। বাঁ দিকের ছবিটি ষাটবাড়িয়ার (ঝিনাইদহ সদর) রবীন দাসের। ১৬.১.২০১০ তারিখে দুষ্কৃতীরা তাকে পিটিয়ে খুন করেছে। শ্রীদাস একটি লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন, '১৬ নভেম্বর, ২০১০ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৮ ঘটিকার সময় কেশপুর উপজেলার মজিদপুর গ্রামের শতাধিক ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর মধ্যযুগীয় কায়দায় জমি-জমা সংক্রান্ত বিবাদের জের ধরে ভয়াবহ সন্ত্রাসী সাইদ, জামালের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক সন্ত্রাসী চাকু, কুড়াল, সাবল, রড, রামদা এবং বন্দুক নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায় নিরীহ নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর।' শ্রীদাস আরও জানান, সাইদ ঋষি পাড়ার কাছেই ঘর বানিয়েছে। তার ঘোষণা, প্রতিদিন প্রাতকালে ঋষিদের মুখ দেখলে তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।' এ ব্যাপারে আমরা ভারতের হিন্দু এবং দলিত নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রসঙ্গতঃ লেবেনশ্রাউম [Lebensraum] তত্ত্বটিনিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'Lebensraum' একটি জার্মান শব্দ। এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বাস করার জায়গা' [Living Space]। জার্মানীর হিটলারর আবিষ্কৃত এই তত্ত্বটির অর্থ 'জনস্ফীতির জন্য বৃহত্তর আবাসভূমি'। হিটলার এই তত্ত্বটি প্রচার করেছিলেন পার্শ্ববর্তী দেশগুলো জয় করার 'অছিলা' সৃষ্টির জন্য। 'লেবেনশ্রাউম' আর 'জনস্ফীতি আগ্রাসন' *[Demographic Aggression]* একই কথা। ১৮.১০.১৯৯১ তারিখে ঢাকায় প্রকাশিত ইংরেজি 'হলিডে' পত্রিকায় বাংলাদেশীদের জন্য বৃহত্তর আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে 'লেবেনশ্রাউম' তত্ত্বটি উত্থাপন করা হয়েছিল। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ঐ সময়ের আগে থেকেই বাংলাদেশের মুসলমানরা ভারতে অনুপ্রবেশ শুরু করেছে। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমান রাজনীতিবিদরা এই অনুপ্রবেশকে ষোল আনা সমর্থন করছেন। তাঁদের বিচারে এই কাজকে অনুপ্রবেশ বলা উচিত নয়। কারণ, ভারত সহ সমগ্র পৃথিবীর মালিক 'খোদা'। খোদার বান্দা (দাস) মুসলমানরাই ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করার অধিকারী। মুসলমানদের নির্দিষ্ট কোন মাতৃভূমিও নেই, পিতৃভূমিও নেই। নবী মোহাম্মদ এই কথাটিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "খোদা সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্য একটি মসজিদ রূপে তৈরী করেছেন"। জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচিত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মহানবীর বলা এই বাক্যটি (God has made the whole world a mosque for me) উদ্ধৃত করেছেন তাঁর 'India Wins Freedom'-এর ১৪২ নং পৃষ্ঠায়। সুতরাং বাংলাদেশী মুসলমানরা ভারতে আসছে এই যুক্তিতে যে, **এটি তাঁদের দেশ। হিন্দুরা যতদিন হিন্দু থাকবেন ততদিন তাঁরা এখানে জবরদখলকারী। হিন্দুদের দৃষ্টিতে এ সব পাগলের প্রলাপ মাত্র।**


আবুল কালাম আজাদ

"অনেকে জানেন না, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এক সময় ছিলেন প্যান-ইসলামী ভাবধারার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। কেবল তাই নয়, তিনি মনে করতেন, ধর্মগ্রন্থ আল-কুরানে আছে সব মানব সমস্যার সর্বকালীন সমাধান। তিনি বলতেন, কুরান-এ ফিরে চল।" — এবনে গোলাম সামাদ (রাজশাহী, বাংলাদেশ), সাপ্তাহিক দেশ, ১৬.৯.২০০০, পৃ-৭।

বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দুরা ভারতে আসতে না পেরে যদি মুসলমান হয়ে যান, তবে সেখানে হাজার হাজার 'রাজনারায়ণ ওরফে কালাপাহাড়' এবং 'যদু সেন ওরফে জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ' জন্মগ্রহণ করবেন। তখন তাঁরা ওখানকার অন্যান্য মুসলমানদের নিয়ে হিটলারের 'লেবেনশ্রাউম' তত্ত্ব এবং নবী মোহাম্মদের 'মসজিদ-তত্ত্ব' নিয়ে ভারত ভূ-খণ্ডে ঢুকে পড়বেন। পূর্ব ভারতে যখন এ অবস্থা শুরু হবে তখন উত্তর পশ্চিম ভারতে ঢুকে পড়বে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মুসলমানরা। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে এই ভবিষ্যদ্বাণী ধৃষ্টতা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। তবু আমরা আমাদের বক্তব্যের

কোন পরিবর্তন করছি না।

পাকিস্তানে ১৯৫৪-এ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেম্বলীতে ৭২ জন সংখ্যালঘু সদস্য ছিলেন। তখন অধিকাংশ হিন্দু নেতা হিন্দুদের জন্য সংরক্ষণ সহ যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা দাবি করেন। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে এই দাবির শেষের অংশ মেনে নিয়ে চালু করেন সংরক্ষণ বিহীন যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা। আজও বাংলাদেশে সংরক্ষণ বিহীন ঐ যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল আছে। ফলে বাংলাদেশের বর্তমান পার্লামেন্টে এবং সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে হিন্দুদের উপস্থিতি নিতান্তই নগণ্য। ১৯৫৪ থেকে শুরু করে ২০১১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের পার্লামেন্টে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কিভাবে হ্রাস পেয়েছে তা' উল্লেখ করছি —

বছর	*মোট সদস্য*	*ধর্মীয় সংখ্যালঘু*
১৯৫৪	৩০৯	৭২
১৯৭০	৩০০	১১
১৯৭৩	৩১৫	১২
১৯৮৯	৩১৫	০৮
১৯৮৬	৩১৫	০৭
১৯৮৮	৩০০	০৮
১৯৯১	৩১৫	১১
১৯৯৬	৩৩০	০৮ (?)
২০০১	৩৩০	০৭ (?)
২০১১	৩৩০	১১

২০০১-এ চাকুরী প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি নিম্নরূপ ছিল ঃ—

ক। ২০০১-এ খালেদা পরিচালিত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯ নভেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত ২৭ জন সচিবসহ ১৯৫ জনকে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। বর্তমানে সচিবদের মধ্যে একজনও সংখ্যালঘু নেই।

খ) ২০০৩ সালে মোট ৯৭ জনকে যুগ্ম সচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিলেন মাত্র ৩ জন।

গ) বর্তমানে ৪৯ জন সচিব থাকলেও কোনো ধর্মীয় সংখ্যালঘু সচিব নেই। ১০৭ জন অতিরিক্ত সচিবের মধ্যে সংখ্যালঘু মাত্র ২ জন। ৩৮৩ জন যুগ্ম সচিবের মধ্যে সংখ্যালঘু মাত্র ১৩ জন। সুপ্রিম কোর্টের ৮০ জন বিচারপতির মধ্যে সংখ্যালঘু মাত্র ২ জন। এই সরকার গত তিন বছরে ৪৫ জন নতুন বিচারপতি নিয়েছেন। এদের মধ্যে সংখ্যালঘু মাত্র ১ জন। (২০০৮-র পরে শেখ হাসিনা কর্তৃক নিয়োজিত)

ঘ) পুলিশ বিভাগে ধর্মীয় সংখ্যালঘু আছেন ৩ শতাংশ, সেনাবাহিনী ও বি.ডি.আর.-এ ১ শতাংশের নিচে। সেনাবাহিনীর ২৭ জন মেজর জেনারেলের মধ্যে ১ জন মাত্র সংখ্যালঘু এবং ১০০ জন ব্রিগেডিয়ারের মধ্যে সংখ্যালঘু আছেন ২ জন।

ঙ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৪৬-টি পরিপূর্ণ দূতাবাস আছে। এদের মধ্যে একজন মাত্র হিন্দু রাষ্ট্রদূত আছেন নেপালে।

চ) ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ও ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের ৭০ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় কোন সংখ্যালঘু কেবিনেট মন্ত্রী নেই।

ছ) বিগত ৫০ বছরে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার কোনো রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে কোনো সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন বা নির্বাচন করা হয়নি। (সূত্র ঃ ১০.১.২০০৫ তারিখের 'মায়ের ডাক')

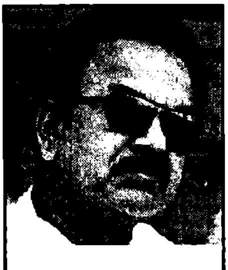
আমরা গত ১ বছর ধরে জানার চেষ্টা করে আসছি যে, বর্তমানে বাংলাদেশে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে কত জন হিন্দু আছেন। কিন্তু তা জানতে পারিনি। বর্তমান হাসিনা সরকার এ তথ্য জানাবে না।

প্রাবন্ধিক সালাম আজাদের সৌজন্যে আমরা জানতে পেরেছি, স্বাধীনতা লাভের পর আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে কোন হিন্দুকে নিয়োগ করা হয়নি। স্বাধীনতার পরে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য এবং ট্রেজারারের পদে শতাধিক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে হিন্দু মাত্র একজন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুর উপস্থিতি নেই। জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের কোনো উচ্চপদে কিংবা কোনো মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল বা ভাইস প্রিন্সিপাল পদে এক জন হিন্দুকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড় মাপের সব ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পদ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। এবারে (২০০৯) আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে। তবে তা সিন্ধুতে বিন্দু মাত্র। ভাষান্তরে মুষ্টিভিক্ষা।

উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে আগত হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ভারতের মাটিতে নাগরিকত্ব এবং পুনর্বাসন দেওয়া। আর একটি পথ হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় করা। এ প্রস্তাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ কথা যাঁরা আজ বলছেন তাঁদের মধ্যে আছেন এ যুগের কবি ও মনীষী ড. অনিল রঞ্জন বিশ্বাস (অধুনা প্রয়াত), চিন্তাবিদ শ্রীদেবজ্যোতি রায় এবং শ্রীশরদিন্দু মুখার্জী। এই পথের কথাই বলে গেছেন ড. আম্বেদকর, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং ত্রৈলোক্য মহারাজ। আজ যে সকল বাঙালি ভারতের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন অনুগ্রহ করে এই প্রসঙ্গটি ভেবে দেখবেন।

ভারতের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলসমূহ উদ্বাস্তুদের কথা ভুলে গিয়েই খুশি আছে। অন্য দু'টো রাজনৈতিক দল আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। ঐ দল দু'টির নেতৃবৃন্দ এমন সব পরিকল্পনা নিয়েছেন যাতে কেউ কোনো দিন, বিশেষত নতুন

প্রজন্ম, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আগ্রহী না হন। এমনকি তারা জানতেও না পারে। তাঁদের পরিকল্পনাটি হচ্ছে — 'দলিত মুসলিম ঐক্য' গড়ে তুলে দিল্লীর ক্ষমতা দখল করা। তাঁরা বলছেন, দেশ-ভাগের জন্য অর্থাৎ ভারত বিভাজনের জন্য মুসলমানরা দায়ী নন। তাঁরা হিন্দু ধর্মকে একটি ধর্ম বলে মানতেও রাজী নন। তাঁদের মতে ভারতের হিন্দুর সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৫ জন। বাকী ৭৪.৫ জন



গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

অহিন্দু অর্থাৎ দলিত এবং ১০.৫ জন মুসলমান। দলিতদের একটি অংশ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করেন এবং কিছু সংখ্যক নেতা ও কর্মী মতুয়াধর্মে বিশ্বাস করেন। এদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা প্রচণ্ডভাবে ইসলাম ভক্ত। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত তথাকথিত নিম্নবর্ণভুক্ত এক হিন্দু ইঞ্জিনীয়ার (বহুজন সমাজ পার্টির সমর্থক) প্রতি মাসে ২/৪ বার ফোন করে আমাকে বলেন, আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে খুব ভাল হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের বেগম খালেদা-অনুগামী প্রথম শ্রেণির বিএনপি নেতা মি. গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের একটি বিবৃতি র খবর পেলাম। তিনি বলেছেন, "মা-কালীর কৃপায় বাংলাদেশের সংবিধানে আল্লার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা হবে।" (আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'ঐক্য' পত্রিকার, 'বাংলা-৪১', ৫ নং পৃষ্ঠা)

দলিত-মুসলিম ঐক্য ঃ একটি ধ্বংসাত্মক তত্ত্ব

তথাকথিত নিম্নবর্ণের কোনো কোনো নেতা-কর্মী সগর্বে নিজেদের 'দলিত' বলে পরিচয় দিয়ে বলছেন, **পাকিস্তান-বাংলাদেশ ও ভারতের মুসমানরা দলিতদের স্বাভাবিক বন্ধু**। দলিত বলতে তারা ভারতের শতকরা ৭৪.৫ ভাগ জনগণকে চিহ্নিত করেছেন। এদের মধ্যে ১৫ ভাগ তফসিলী, ৭.৫ ভাগ তপসিলী উপজাতি এবং ৫২ ভাগ অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের মতে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা যেমন দলিতদের স্বাভাবিক বন্ধু, বর্ণ হিন্দুরা ঠিক তেমনি **স্বাভাবিক শত্রু**। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই, যে সমস্ত বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী এ সব কথা বলছেন, তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক বন্ধুদের উপর আস্থা রেখে বাংলাদেশে থাকতে পারেননি।

এ ছাড়া অরাজনৈতিক বলে কথিত 'বামসেফ' (The All India Backward and Minority Communities Employees Federation) নামের একটি সংগঠন 'মূলনিবাসী তত্ত্ব' নিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে ভারতের উচ্চবর্ণভুক্ত অধিকাংশ হিন্দু বহিরাগত। মুসলমানদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র বহিরাগত। এই মূলনিবাসী দলিত এবং মুসলমান মিলে বহিরাগত হিন্দুদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। তাদের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন — কোলকাতা সহ এই উপমহাদেশের প্রধান প্রধান মসজিদের ইমাম সাহেবদের শতকরা ৮০ জন বহিরাগত। সাধারণ মুসলমানরা কি তাদের কথা শুনবেন, না আপনাদের কথা শুনবেন? জানেন তো দীর্ঘদিন ধরে ঢাকায় শ্লোগান চলছে, 'আমরা সবাই তালিবান, বাংলা হবে আফগান'। ভারতের

কতজন মুসলমানরা তালিবান হতে চান, তা বলতে পারব না। তবে অসাধারণ মুসলমানরা অনেকেই তালিবানদের প্রবল সমর্থক। 'খবর ৩৬৫ দিন' পত্রিকার (কোলকাতা, ১৭.১.২০১২) ৫ নং পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধে দেখা যাচ্ছে, কোলকাতা শহরের বড় মাপের একজন ইমাম বলছেন, 'আমি কেন সারা দুনিয়া তালিবানদের সমর্থন করছে।' আচ্ছা, এই সব ইমামরা একটু বড় মাপের টাকার থলি এবং তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে 'বামসেফ-এ' যোগ দিতে এলে তাদের ফিরিয়ে দেবেন কি?

আজ উদ্বাস্তুদের কথা বলতে গেলে দ্বি-জাতি তত্ত্ব এবং ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের বিধি-বিধান আলোচনা করতে হয়। এসব করতে গেলে দলিত-মুসলিম ঐক্য হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁরা উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেন না। যখন দায়ে পড়ে কিছু বলতে হয়, তখন তাঁরা বলছেন — 'বাংলাদেশ থেকে লোক আসে অর্থনৈতিক কারণে; ধর্মীয় কারণে নয়'। তাঁরা এই তত্ত্বটি ধার করেছেন প্যান ইসলাম ও কমিউনিষ্টদের কাছ থেকে। কমিউনিষ্টরা চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাননি। আজ তাঁরা বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাচ্ছেন না। জানি না এই আত্মপ্রবঞ্চণার আসল রহস্য কোথায়!


জনাব আগা খান (তৃতীয়)

ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর 'প্যান-ইসলাম' ভারতকে পুনর্দখল করার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এই প্রচেষ্টার প্রথম সফল ধাপ হচ্ছে ১৯০৬ খ্রী. মুসলিম লীগ গঠন। তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাব সলিমুল্লাকে ঋণ (নাকি অনুদান!) ১৪ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে ১৯০৯ খ্রী. মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আদায় করে নেওয়া। ঐ সময়ই জনাব আগা খানের (তৃতীয়) নেতৃত্বে মুসলমানরা সেন্সাস কমিশনের কাছে দাবি করেন যে, অস্পৃশ্যদের যেন জনগণনার তালিকায় হিন্দু হিসেবে দেখানো না হয়। কর্তৃপক্ষ সেদিন মুসলমানদের ঐ দাবি মেনে নিয়েছিলেন। হিন্দু রাজনীতিবিদরা কিন্তু জনগণনায় অস্পৃশ্যদের হিন্দু হিসেবে দেখানোর দাবি জানাননি। ১৯১১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত জনগণনায় অস্পৃশ্যদের হিন্দু থেকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

ভারতের অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীও যে বিরাট একটা শক্তি তা' স্বঘোষিত বর্ণ হিন্দুরা প্রায় কেউই সেদিন বুঝতে যাননি। এটা খুব ভাল করে বুঝেছিলেন মি. জিন্নাহ্। তাই তিনি অস্পৃশ্যদের একটি অংশকে তাঁর দলে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলতেন, 'আমরা সংখ্যায় ১২ কোটি। আমাদের সঙ্গে রয়েছে ৮ কোটি তফসিলী (অর্থাৎ অস্পৃশ্য)। তাঁদেরকে নিয়ে আমরা ভারতবাসীর অর্দ্ধেক। আমরা আমাদের জন্য আবাসভূমি চাই। আমাদের সঙ্গে তফসিলীরা আছেন এবং থাকবেন। এর আগে ১৯২১-এ মুসলমানরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে জয়ী

হয়েছিলেন। তাঁরা গান্ধীজীকে খিলাফৎ আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক হিসেবে পেয়েছিলেন। শুধু সমর্থক নন, ড. আম্বেদকরের দৃষ্টিতে গান্ধীজী ছিলেন তাদের উপদেষ্টা এবং বন্ধু (স.গ্র.-১, ৮/১৪৮)। মুসলমানরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন অর্থ এবং অস্ত্র। আর মুসলিম বিশ্বের কাছ থেকে পেয়েছিলেন নৈতিক সমর্থন। ১৯৪৭-এ ভারতের একটি বিরাট অংশ মুসলমানরা পুনর্দখল করলেন। বাকি অংশ পুনর্দখল করার জন্য তাঁরা সুযোগের অপেক্ষা করছেন। 'মণ্ডল কমিশন' রিপোর্ট প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের হাতে আর একটি সুযোগ এসে গেল। এই রিপোর্টকে ভিত্তি করে আবিষ্কৃত হয় ৮৫ ভাগ বনাম ১৫ ভাগ তত্ত্ব। **এই ধ্বংসাত্মক তত্ত্বকে ভিত্তি করে জন্ম নিয়েছে দলিত-মুসলিম ঐক্যের চিন্তাধারা।**

ঐতিহাসিক মহাপাপ

হিন্দু রাজনীতিবিদরা যখন দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, **তখন হিন্দুস্থান (ভারত) ও পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় না করে তাঁরা 'ঐতিহাসিক মহাপাপ' করেছিলেন।** ১৯৪৭-এর পর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসতে ইচ্ছুক হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিরুৎসাহিত করে অনুরূপ মহাপাপ করে আসছেন। অনুরূপ জঘন্য অপরাধ করছেন তাঁরা, যাঁরা আজ মৃতপ্রায় মনুসংহিতাকে উজ্জীবিত করে এবং জীবন্ত কোরান হাদিসের বিধি-বিধান ও মুসলিম রাজনীতির ইতিহাসকে উহ্য রেখে মহান দেশ-প্রেমিক ড. আম্বেদকরের দোহাই দিয়ে 'দলিত-মুসলিম ঐক্য' গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন। বাবাসাহেব কিন্তু তাঁর জীবনে এক পলকের জন্যও দলিত-মুসলিম ঐক্যের কথা বলেননি। বরং তিনি গান্ধীজীর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টাকে 'মুসলিম তোষণ' 'নাম দিয়ে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রস্তাবিত হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময়ের দাবি করেছেন। তিনি গান্ধীজী পরিকল্পিত হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সাধনের প্রক্রিয়াকে তোষণ আখ্যা দিয়ে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সকলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় —

"কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের নীতি হল সহনশীলতা এবং রাজনৈতিক ও অন্য সুবিধাদান দ্বারা মুসলিম তোষণ। .... আমার মনে হয় কংগ্রেস দু'টো জিনিস বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমতঃ তোষণ ও নিষ্পত্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যর্থতা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোষণের অর্থ হল, যে সব আক্রমণকারী নির্দোষ ও নিরীহ মানুষদের উপর খুন, ধর্ষণ, লুঠ এবং অগ্নিসংযোগের মতো কার্যকলাপে অভ্যস্থ তাদের দোষ উপেক্ষা করে তাদেরকে উৎকোচ দিয়ে বশে রাখা। অপর পক্ষে নিষ্পত্তির অর্থ হল একটি সীমারেখা টেনে দেওয়া যা কোন পক্ষই অতিক্রম করতে পারবে না। তোষণ আক্রমণকারীর দাবি ও আকাঙ্খার প্রতি কোন সীমারেখা স্থাপন করে না। নিষ্পত্তি তা করে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস এই কথাটি বুঝতে অসমর্থ যে

সুবিধাদানের নীতি মুসলমানদের আক্রমণাত্মক মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যা' সব চেয়ে খারাপ তা' হল মুসলমানরা এই সব সুবিধাদানকে হিন্দুদের পরাজয় বরণের মানসিকতা এবং বাধা দেওয়ার শক্তির অভাব বলে ব্যাখ্যা করে। এই তোষণ-নীতি হিন্দুদের একই ভয়াবহ অবস্থায় ফেলবে যা হিটলারের প্রতি তোষণের নীতির পরিণাম হিসাবে মিত্রশক্তিকে ভোগ করতে হয়েছিল।'' (স.গ্র. ১, ৮/২৬৯-২৭০) অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে আজ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতা চলছে।

ভারত বিভাজনের প্রাক্কালে অনাগত পাকিস্তান ভূখণ্ডে বসবাসরত হিন্দুদের মতামত নেওয়া হয়নি। তাই ঐ অংশে বসবাসরত হিন্দু ও বৌদ্ধদের এখানে চলে আসার সর্বপ্রকার অধিকার আছে। এছাড়া কোন মুসলিম রাষ্ট্রে কোন অমুসলমানের মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে বসবাস করার নৈতিক অধিকার থাকে না। কোরান এবং হাদিস সে অধিকার দেয়নি। জন র‍্যাডক্লিফ (১৮৯৪-১৯৭৭) যখন ভারত ও পাকিস্তানের সীমারেখা আঁকেন, তখন ভারতের সকল মুসলমানদের জনসংখ্যা (২৪ শতাংশ) অনুসারে যে ভূমি তারা পেতে পারেন তার চেয়েও ২ শতাংশ ভূমি বেশি দেওয়া হয়েছিল। কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তান অংশে যে সকল হিন্দু-বৌদ্ধরা আছেন তাঁদের বাসস্থান বর্তমান ভারত এলাকার মধ্যেই। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা প্রয়োজন যে, ভারতের মুসলমানদের বাসস্থান পাকিস্তান ও বাংলাদেশে।

ঐতিহাসিক অধিকার

দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে আমরা ভারত সরকার, ভারতের সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সুস্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই — স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে জাতীয় নেতৃবৃন্দের দেওয়া প্রতিশ্রুতি, নৈতিকতা ও ন্যায় বিচারের মানদণ্ডে পূর্ব বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধ-চাকমাদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রাপ্তি, ফেলে আসা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন লাভ তাদের **ঐতিহাসিক অধিকার**। আমরা আরও বলে দিতে চাই, এর আগে আপনারা অনেক পাপ করেছেন। শুধু পাপ নয়, মহাপাপ করেছেন; যার ফল স্বরূপ ১৯৪৭-এর অনেক আগেই আমরা আফগানিস্তানকে হারিয়েছি; হারিয়েছি সিংহল ও বার্মাকে। এখন আবার পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দুর্ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেললে বড় মাপের খেসারত দিতে হবে।



অটলবিহারী বাজপেয়ী

২০০৩-এর ৭ মে রাজ্যসভায় 'নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল-২০০৩' পেশ করে যখন আর একটি মহাপাপ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন সমগ্র ভারত থেকে, বিশেষত

পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে (ড. বি. আর. আম্বেদকর স্টাডি সার্কেল, উত্তর ২৪ পরগনা) নিম্নোক্ত প্রতিবাদ পত্রটি পাঠানো হয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী মহোদয়ের কাছে।

"**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,** মহান দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসাবে এ কথা আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয় যে, ১৯৪৭-এ মুসলমান ও অমুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একটি অনৈতিক চুক্তির ফলে ভারত ভেঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান নামে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মহান দেশপ্রেমিক এবং একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর সেদিন উভয় দেশের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। ভারত-পাকিস্তানের সীমা-রেখা ছিল দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভিত্তিক যা নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক। পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা পাকিস্তানকে ধর্ম-ভিত্তিক মুসলিম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেদিনের ভারতের রাজনীতিবিদরা ভারতের সর্বজনীন কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভিত্তি করে ভারতকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। তাঁদের পরামর্শ অনুসারে বিশেষজ্ঞগণ এমন একটি মানবিক সংবিধান রচনা করেন যার অধীনে সকলে নিজ নিজ ধর্ম ও কৃষ্টি পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারছেন। কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থান এর বিপরীত মেরুতে। স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকেই পাকিস্তান শরিয়ত ভিত্তিক সমাজ, সংবিধান ও প্রশাসন বাস্তবায়নের পক্ষে, যেখানে কেবলমাত্র মুসলমানদেরই বসবাস করার অধিকার আছে। সেখানে সংখ্যালঘুরা বিশেষত পৌত্তলিক হিন্দুরা অবাঞ্ছিত জীব। তারা ধর্মত্যাগ করে বা অন্যভাবে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য।

আজ (২০০১-২০০৪) বাংলাদেশেও অনুরূপ পরিবেশ তৈরী হয়েছে। ১৯৭১-এর পর থেকে, বিশেষত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে খুন হয়ে যাওয়ার পর থেকে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা নিষ্ঠুর মৌলবাদীদের পাশবিক বর্বরতার শিকার হয়ে আসছেন। বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার স্বল্পকালীন প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় ছাড়া কোন সময়ই কোন সরকার ওখানকার সংখ্যালঘুদের ধন, সম্পদ, মান-সম্মান ও মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং তারা প্রতিনিয়ত যৌন বিকারগ্রস্থ মৌলবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছে। আমরা জানি (আপনিও জানেন) ছিঁটে ফোঁটা ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর কোথাও মুসলমানরা অমুসলমানদের ভাই বলে মনে করে না। এ ব্যাপারে পুতুলপুজারী হিন্দু-বৌদ্ধদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে পুতুল পুজারীরা অপবিত্র। কোরানের ভাষায় — 'The idolaters are only unclean.' (Koran : 9/28)

সমস্ত রকম বিশ্বস্ত সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা, বিশেষত হিন্দু ও বৌদ্ধরা আজও সরকারের ছত্রছায়ায় থাকা মৌলবাদী বর্বরদের দ্বারা নির্মম ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন। অবিবাহিতা মেয়েরা প্রথমে মনুষ্যাকৃতি

পশুদের লালসার শিকার হয় এবং পরে বাধ্য হয়ে ধর্মান্তরিত হয়। কোথাও কোথাও স্বামী-পুত্র-মা-বাবা-ভাই-বোনদের সামনেই হিন্দু মেয়ে-বৌরা ধর্ষিতা হন। ৬ বছরের শিশু কন্যাদেরও রেহাই দেয় না ওখানকার পশুরা। ২০০১-এর ১ অক্টোবর থেকে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের প্রায় সব দৈনিক খবরের কাগজে এরূপ অজস্র মর্মান্তিক খবর ছাপা হয়েছে। আপনার সরকারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের হাতে এর অকাট্য প্রমাণ আছে। আপনিও জেনেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার সরকার এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানায়নি। জানি না ভারতের বুদ্ধিজীবী মহল ঐ কলঙ্কজনক ঘটনা উপভোগ করছেন কিনা। ইতিহাসে এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

মহাশয়, বিনীতভাবে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আপনি এমন একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশের প্রধানমন্ত্রী যে দেশে নারী নির্যাতনকে কেন্দ্র করে একাধিকবার মহারণ সংঘটিত হয়েছে।

*** *** ***

মহোদয়, আমরা আপনাকে দেশ ভাগের প্রাক্কালে পাকিস্তানে আটকে পড়া হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দের দেওয়া আশ্বাসবাণী তথা প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণে আনতে বলছি। সেদিন বিভিন্ন নেতা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই, ওখানকার হিন্দু-বৌদ্ধদের তাড়াহুড়ো করে এক্ষুণি ভারতে চলে আসার প্রয়োজন নেই। যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে তখনই তারা চলে আসবেন। ভারতের দরজা তাদের জন্য খোলাই থাকবে। অনেক উদ্ধৃতি দেব না। ১৯৫০-এর ২০-২১ সেপ্টেম্বর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৫৬-তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, "...যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে যাদের কোন হাত ছিল না, তারা দুর্দশা কবলিত হয়ে পড়েছেন। তাদেরকে উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত পেশায় কাজের সুযোগ দান সহ পুনর্বাসনের যথাযথ সুযোগ দেওয়া *(ভারত)* সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।"

আমরা সবিনয়ে আর একটি তথ্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক নেতা ও কর্মী দীর্ঘদিন ধরে ঘোষণা করে আসছেন যে, বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখরা ভারতে এসেছেন বা এখনও আসছেন যে কোন বিচারে তারা উদ্বাস্তু; কোনক্রমেই অনুপ্রবেশকারী নন। তারা ভারতে আশ্রয় পাবেন; নাগরিকত্ব পাবেন।

মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৫-এ প্রণীত নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করতে যাচ্ছেন (বিল নং ৩৯, ২০০৩)। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় অবৈধ আগন্তুকদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এ ভাবে —

"Illegal migrant" means a foreigner who has entered into India – (i) without a valid passport or other travel documents and such other

document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf, or (ii) with a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf but remains therein beyond the permitted period of time."

মহোদয়, বিনীতভাবে আমরা আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখছি —

১। দুর্গতকে রক্ষা করা ও আশ্রয় দেওয়ার মত গৌরবজনক ভারতীয় ঐতিহ্যকে আমরা কি ভুলে যেতে পারি? আমরা কি ভুলে যেতে পারি স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেওয়া জাতীয় নেতৃবৃন্দের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি? আমরা কি ভুলে যেতে পারি যে, আপনি এমন এক ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে ভারতে নারী-লাঞ্ছনাকে কেন্দ্র করে কুরুক্ষেত্রের মহারণ হয়েছিল এবং রাম ও রাবণের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল?

২। বাংলাদেশে আমাদের মা-বোন ও মেয়েরা যখন সেখানকার সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দ্বারা ধর্ষিতা ও গণ-ধর্ষিতা হচ্ছেন তখন আমরা কি নীরব থাকতে পারি?

৩। আমরা কি এটা হতে দিতে পারি যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের শিকার হিন্দু বৌদ্ধরা মুসলমান হয়ে যাক বা তাঁরা আত্মহত্যা করুক?

৪। পৃথিবীর কোথাও শরিয়তী শাসনের অধীনে অমুসলমানরা সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারে না — আমরা কি এই সহজ বাস্তবকে ভুলে যেতে পারি?

৫। আমরা কি ভুলে যেতে পারি যে, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা ও কর্মীরা বারবার ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু-বৌদ্ধরা কখনই অনুপ্রবেশকারী বা অবৈধ আগন্তুক হিসাবে চিহ্নিত হবেন না?

মহাশয়, এই ৫-টি প্রশ্নের উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে নাগরিকত্ব আইনের ৫ নং ধারাটি এমন ভাবে সংশোধিত করার ব্যবস্থা করুন যাতে —

'বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে যে সকল হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টানরা তাঁদের জীবন ও মা-বোন-মেয়েদের সতীত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে এখানে এ পর্যন্ত চলে এসেছেন এবং অনুরূপ কারণে ভবিষ্যতেও চলে আসতে বাধ্য হবেন তাঁরা যেন কোন ক্রমেই অবৈধ নাগরিক বা অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত না হন।' কারণ, তাঁদের ভারতে চলে আসার এবং এখানে বসবাস করার ও নাগরিকত্ব পাবার সকল প্রকার অধিকার আছে। ২৬ জুন, ২০০৩

স্বা. শ্রীদেবজ্যোতি রায়।

আমাদের এই চিঠির কানাকড়িও মূল্য না দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৩-এর ১৮ ডিসেম্বর তারা পাশ করিয়ে নিলেন 'নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০০৩'। কমিউনিষ্ট সহ সব বিরোধী দল ওয়াক-আউট করে বিলটি পাশ করার পথ মসৃণ করে দিয়েছে। বিলটি লোকসভায় পাশ হয়ে গেল ২২ ডিসেম্বর (২০০৩) কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই।

ড. মনমোহন সিং আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তিনি কি এখন নাগরিকত্ব সম্পর্কিত সমস্যাটি সমাধান করতে পারেন না? নিশ্চিতভাবেই পারেন।

১৯৫৫ সনের নাগরিকত্ব আইনের ১৮ নং ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাট ও রাজস্থান রাজ্যে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সনের নাগরিকত্ব রুল (Rule)-এর সংশোধন করে। নৈতিকতা এবং মানবিকতার নিরিখে বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যেতেই পারে।

গুজরাট রাজ্যের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব রুল (Rule)-এর সংশোধন

গুজরাট রাজ্যের ক্ষেত্রে কুচ (Kutch), পাটান (Patan), বনসকণ্ঠ এবং আমেদাবাদ জেলাসমূহের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৫ সন এবং ১৯৭১ সনের যুদ্ধের ফলে বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতে এসেছেন, তাদের উপর নির্ভরশীল যে সকল ব্যক্তিরা ভারতীয় নাগরিক কিংবা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের বিবাহ করেছেন তাদেরকে সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টর ভারতীয় নাগরিক রূপে রেজিস্ট্রী (Registration) করতে পারবেন।

যে সকল পাকিস্তানী নাগরিক সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভারতে পাঁচ বছরের অধিক কাল ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে এসেছেন এবং ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করেছেন তাদের বসবাস স্থলের সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টর তাদেরকে ভারতীয় নাগরিক রূপে রেজিস্ট্রী করতে পারবেন।

গুজরাটের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়নি সেই সব জেলার ভারতে আগত পাকিস্তানী হিন্দু নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিক রূপে রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষমতা গুজরাট রাজ্যের গৃহ মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপর অর্পিত হল।

রাজস্থান রাজ্যের ক্ষেত্রে Badmer (বাদমের) এবং Jaisalmer (জয়সালমের) জেলায় যে সকল পাকিস্তানী হিন্দু বিগত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সনের যুদ্ধের ফলে ভারতে চলে এসেছেন, তাদের উপর নির্ভরশীল যে ব্যক্তিরা ভারতীয় নাগরিক কিংবা ভারতীয় বংশোদ্ভূত কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেছেন তাদেরকে তাদের বাসস্থানের সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টর ভারতীয় নাগরিক রূপে রেজিস্ট্রী করতে পারবেন।

যে সকল পাকিস্তানী সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক পাঁচ বছরের পূর্বে ভারতে স্থায়ীরূপে বসবাসের জন্য এসেছেন এবং ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করেছেন তাদেরকে তাদের বসবাসস্থলের সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টর ভারতীয় নাগরিক রূপে পুঞ্জিভুত করতে পারবেন। এ ছাড়া গুজরাট ও রাজস্থানের ক্ষেত্রে উক্তরূপ পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতি (Procudure) এবং তৎসম্পর্কিত দলিল-পত্র সংরক্ষণের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে সক্রিয় উদ্বাস্তু সংগঠন হচ্ছে 'অল ইণ্ডিয়া রিফিউজী ফ্রন্ট। তাঁরা ১৯৫০ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সরকারী বেসরকারী যাবতীয় তথ্য দিয়ে

ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং রাজ্য সরকার প্রধান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের কাছে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য বারংবার আবেদন জানিয়েছেন। গত ২৮.৮.২০১০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমেহেন সিং-এর কাছে চিঠি দিয়েছেন। তাদের প্রধান প্রধান দাবি হচ্ছে —

(১) ১৮.৩.২০০৩ তারিখে রাজ্য সভায় ড. মনমোহন সিং, জেনারেল শংকর রায়চৌধুরী এবং শ্রীলালকৃষ্ণ আদবানির প্রতিশ্রুতি মতো বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের খাঁটি উদ্বাস্তু (Bonafide Refugee) রূপে গণ্য করে পরিচয়-পত্র প্রদান করতে হবে এবং জাতি সংঘের (UNO) নিয়মানুযায়ী তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ২৯/১১/১৯৭১ তারিখের নং ২৬০১১/১৬/৭১-আই.সি.র অযৌক্তিক ও অনৈতিক প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

(৩) ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে —

(ক) সন-তারিখ নির্বিশেষে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের 'বে-আইনী প্রবেশকারী' সংজ্ঞার আওতা থেকে বাদ দিতে হবে।

(খ) ঐ সমস্ত উদ্বাস্তুদের ভারতের যে কোন স্থানে ৬ মাস কাল বসবাসান্তে পূর্বের ন্যায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারের মাধ্যমে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট প্রদানের বিধান করতে হবে ও 'জাতীয় পরিচয়-পত্র' দিতে হবে।

(৪) পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ন্যায় পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের যথাযথ পুনর্বাসন ও ফেলে আসা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

গত ২৮.১২.২০১০ তারিখে ঠাকুর নগরের (উ. ২৪ পরগনা) সর্বভারতীয় মতুয়া সঙ্ঘের প্রধান উপদেষ্টা বড়মা বীণাপাণি দেবীর নেতৃত্বে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানকল্পে লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। এই সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণির সব রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন। একমাত্র তৃণমূল ছাড়া আর সব দলের নেতারা ১৯৭১-এর আগে এবং পরে আসা উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বসহ যাবতীয় সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্ব আদৌ বক্তব্য রাখেননি। তাদের নীরবতার কারণ সেদিন বোঝা যায়নি। তবে ধীরে ধীরে ঐ নীরবতার তাৎপর্য প্রকাশ পাচ্ছে। ঐ সমাবেশে সবচেয়ে জোরালো ভাষণ দেন সিপিএমের কমরেড গৌতম দেব। মজার ঘটনা এই, এনারা গত ৩৪ বছরের মধ্যে একবারও একাত্তরের পরে আসা উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে একটি শব্দও খরচ করেননি। ১৯৮৩ থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের


বীণাপাণি দেবী (বড়মা)

মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কম করেও ২০ বার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী সহ তিন জন মুখ্যমন্ত্রীর কেউই দেখা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। আমরা মনে করি দু'জনেই পূর্ব-বঙ্গের সন্তান। জ্যোতিবাবু নারায়ণগঞ্জের (বারদি) এবং বুদ্ধদেববাবু ফরিদপুরের সন্তান। অবশ্য দু'জনেরই জন্ম কোলকাতায়।



বাঁদিকে
জ্যোতি বসু



ডানদিকে
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নিচে
মমতা ব্যানার্জী





বাংলাদেশের বেসরকারী রাজাকারবাহিনী ঢাকা জেলার ধামরাই থানার দাস পরিবারকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তিন বছরের মিলন মনিদাসকে ১৩.৩.২০০৯ তারিখে তুলে নিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করে।
ফটো শ্রী আর. এন. দত্তের সৌজন্যে (কোলকাতা)

২০১১-এ শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী এবং ড. মনমোহন সিং-এর ঢাকা সফর



২০১১-এর ২৫-২৬ জুলাই কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী ঢাকা গিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া মরনোত্তর 'স্বাধীনতা সম্মান' গ্রহণ করছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে এর মাত্র ২৪ দিন আগে ৩০.০৬.২০১১ তারিখে শেখ হাসিনা শেখ মুজিবের স্বপ্নসৌধ ১৯৭২-এর সংবিধান ফিরিয়ে আনার নাম করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্থায়ী রূপ দিলেন। তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।



২০১১-র ৬ সেপ্টেম্বর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ঢাকা গিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রত্যক্ষে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। পরোক্ষে তিনি ওখানকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার 'পাকিস্তান যাত্রাকে' অভিনন্দন জানিয়ে এলেন না তো?

করুণ আর্তনাদের চরম ধাপ

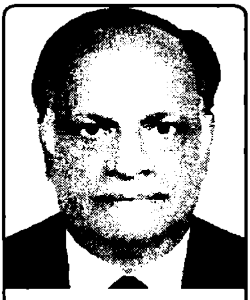
(২০০১-২০১১)

"খোদা বলেন, নাস্তিকদের বিন্দুমাত্র ক্ষমা না করে তাদের গলা কেটে ফেল। এটাই মহান খোদার আদেশ।" — ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ

'ইসলাম নামক বৃক্ষটির গোড়ায় পানি নয় রক্ত ঢালতে হবে।'

— শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

২০০১-এর ১ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অষ্টম নির্বাচন অনুষ্ঠিত । এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারায়। সরকার গঠন করে বিএনপি-জামাত ত্বাধীন চার দলীয় ঐক্যজোট। প্রধানমন্ত্রী হন বেগম খালেদা জিয়া (১৯৪৪-)। কেলিক্সের বিচারে ইনি 'অলস এবং অশিক্ষিত'। নির্বাচনের আগে থেকেই তাদের ষা গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দুদের উপর। অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগপন্থী লমানদের উপরও। তবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ এবং মুসলমানদের উপর ক্রমণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর — এই তিন সের মধ্যে বড় জোর ৪-৫ টি মুসলমান মেয়ের উপর অত্যাচার হয়েছে। অপরপক্ষে ণিত হিন্দু কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া মহিলা মুসলমান গুণ্ডা দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছেন।



শ্রীরবীন্দ্র ঘোষ

'হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ নরিটিস'-এর সভাপতি শ্রীরবীন্দ্র ঘোষ ২২.১.'০৫ রিখে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক ফারেন্সে জানান, ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত গত ৩ র ২, ৮৮৬ জন সংখ্যালঘুকে খুন করা হয়েছে, লিকা সহ ৩,৬৭৯ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। রিক অত্যাচার করা হয়েছে ৬,০৭২ জনকে। এর ্য ৩,৬৮৯ জন মহিলা। মন্দির, গীর্জা ও মূর্তি ভাঙার া ঘটেছে ২,৩০৭-টি। ১৫,৩৭৭-টি বসত বাড়ী ও সা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জোর করে মুসলমান বানানো হয়েছে ২২১ কে এবং ৬,০০,৩৯০ জন দেশ ছাড়া হয়েছেন। এর বাইরেও অজস্র অমানবিক া ঘটেছে, যার হিসেব পাওয়া সম্ভব নয়।

পিরোজপুর জিলার নাজিরপুর উপজিলার অন্তর্গত চরখালী গ্রামের শিখা রাণী ম এক হিন্দু গৃহবধূকে ধর্ষণ করতে না পেরে তার স্বামীকে প্রহার করে একটি স্কুল । আটকে রাখে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে ঐ মহিলাকে উলঙ্গ করে তার স্তন সহ

শরীরের সব স্পর্শকাতর স্থানে কামড় দিয়ে এবং নখ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জখম করেছে। এখন তিনি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তাদের অপরাধ, নিজেদের উঠোন থেকে ধান চুরি যাওয়ার বিরুদ্ধে থানায় ডায়রী করেছিলেন। (জনকণ্ঠ ২১.১.'০৫)

নিজে সরেজমিনে তদন্ত করে শ্রীরবীন্দ্র ঘোষ মৌলবাদীদের দ্বারা হিন্দু সম্পত্তি দখলের একটি অভিনব ও মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানালেন। জনৈক জগদীশ চন্দ্র আচার্য নামে ৫১ বছরের এক ব্যাংক কর্মী গত ১৮.২.'০৪ তারিখে হাসপাতালে মারা যান বলে ২০.২.'০৪ তারিখের 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পরে একটি মৌলবাদী সংগঠন দাবি করে যে, কিছুদিন আগে জগদীশবাবু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বাবলু মিয়া নাম নেয় এবং জাহিরা খাতুন নামে এক মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করে। সুতরাং, জগদীশবাবুর মৃত দেহ কবর দিতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন (ডেপুটি কমিশনার) এই দাবি মেনে নেন। ফলে জগদীশবাবুর মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। জাহিরা বিবি লিখিত ভাবে দাবি জানায় যে, জগদীশবাবুর পরিত্যক্ত সব সম্পত্তির মালিক সে। রবীন্দ্রবাবুদের মতে হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস করে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার এটি একটি আন্তর্জাতিক ঘৃণ্য চক্রান্ত।

আগরতলার দৈনিক সংবাদ (১৬.১১.২০০১) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, " .... নির্বাচনের পরদিন অর্থাৎ দুসরা অক্‌টোবর হামলা হয় (ভোলার চর অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে)। হামলার আঁচ পেয়ে গ্রামের লোকজন আশ্রয় নিয়েছিলেন বাজার থেকে কিছু দূরে ধানক্ষেত ও জলাভূমি বেষ্টিত বেন্টন বাড়ীতে। আশ্রয় নেওয়া লোকদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। রাতে হামলা শুরু হয়। আট দশটি দলে বিভক্ত হয়ে বি.এন.পি ও জামায়েতের সদস্যরা হিন্দু বাড়ীগুলিতে প্রথম হামলা শুরু করে। চারশত হিন্দু বাড়ী লুঠ হয়। বেন্টন বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া পঞ্চাশ (৫০) জন হিন্দু নারী গণধর্ষণের শিকার হন। ধর্ষণকারীদের মধ্যে ছিল রিক্‌সা চালক আকির মিঞা, পান ব্যবসায়ী মোসলে উদ্দিন, মস্তান কাসেম। এমন কি শিক্ষক ইয়াসিন ও উনার দুই পুত্র সেলিম ও বেলাল মিঞা ধর্ষণকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। পিতা দুই পুত্র সহযোগে হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করেছে।"

গত ১৭.১১.২০০৩ তারিখে চট্টগ্রাম জিলার বাঁশখালি থানার অন্তর্গত সাধনপুর গ্রামের একটি পরিবারের ৪ জন পুরুষ, ৭ জন মহিলা এবং ১-টি শিশু সহ মোট ১১ জন হিন্দুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। মৃতরা হচ্ছেন —

১। তেজেন্দ্র লাল শীল (৭০); ২। দেবেন্দ্র লাল (৭৫); ৩। বকুল বালা (৬০); ৪। অনিল (৪২); ৫। স্মৃতি রাণী (৩০); ৬। রুমি (১১); ৭। সোনিয়া (৭); ৮। কার্তিক (৪ দিন); ৯। বাবুটি (২৫); ১০। প্রসাদী (১৭); ও ১১। এ্যানি (১৫)।

· বাঙালি দ্বারা বাঙালির উপর অত্যাচারের এই নৃশংসতা সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। এ ব্যাপারে ভারতের সাংবাদিকদের, বিশেষত বাঙালি সাংবাদিকদের নীরবতাও সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। যে সাংবাদিকরা ভিয়েতনামে কখন ক'ফোঁটা

বৃষ্টি হয়, তার ছবি তুলতে এতটুকু ভুল করেন না, যে সাংবাদিকরা ইরাকে কোন দিন ক'জন মুসলমান মারা যান তার নিখুঁত ছবি তুলতে ভুল করেন না, তারা বাংলাদেশের মৌলবাদীদের দ্বারা যে সব বিধবা-সধবা-যুবতী বা নাবালিকা কুৎসিত ভাবে আক্রান্ত হন তাদের খবর পর্যন্ত রাখেন না। তবে বাংলাদেশে পরমতসহিষ্ণু অনেক সাংবাদিক আছেন। তারা অনেক খবর এবং অনেক ছবি প্রকাশ করেছেন।

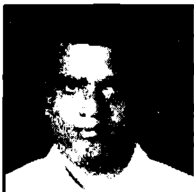
বর্তমান বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায় — প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল। প্রথম দল বিশুদ্ধ পাকিস্তানপন্থী এবং তারা বাংলাদেশকে একটি পরিপূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। প্রগতিশীল দলের মধ্যে অনেকেই সহিষ্ণু। তারা চান, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বস্তু হোক; সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে তার প্রতিফলন না ঘটুক। পরধর্ম সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী কয়েকজন বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর মতামত পরবর্তী পৃষ্ঠায় তুলে ধরছি।



নির্ভীক মসিযোদ্ধা
অধ্যাপক
মুনতাসির মামুন



নাস্তিক্য দর্শনে
বিশ্বাসী
তসলিমা নাসরিন
(বাংলাদেশ এবং
কলকাতা
থেকে বিতাড়িত)



মি. সালাম আজাদ
মোল্লাদের চোখে
তিনি 'পুরুষ
তসলিমা'।
দীর্ঘদিন দেশের
বাইরে ছিলেন।



অসাম্প্রদায়িকতার
মূর্ত প্রতীক
অধ্যাপক কবীর
চৌধুরী (প্রয়াত)



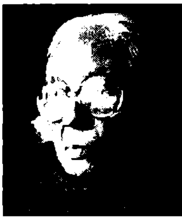
লন্ডনে
বসবাসরত
মসিযোদ্ধা
মাসুদা ভাট্টি



আবদুল গাফফার
চৌধুরী
(স্বেচ্ছা নির্বাসিত,
এখন লণ্ডনে থাকেন)



অসম সাহসী
মানবাধিকার কর্মী
মি. শাহরিয়ার কবির



বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধেয়া
ড. নীলিমা ইব্রাহিম
(প্রয়াত)

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মি. মুনতাসির মামুন বলেন —

(ক) পুঁজিহীন ব্যবসার মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যবসা ধর্ম ব্যবসা, বিএনপি জামাতের যেটি ট্রেড মার্ক। রাষ্ট্রের টাকা বিতরণ করে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শক্তিশালী লুম্পেন ধনীকশ্রেণী সৃষ্টি করেছিলেন। আর ধর্ম ব্যবসা করে অজ্ঞ মানুষদের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করেছিলেন। .. (সূত্র ঃ দৈনিক স্টেট্সম্যান, ২৬.৮.২০০৪, পৃ-৭)

২। ঢাকার 'ভোরের কাগজে'(৪.৮.২০০৪) বলা হয়েছে —

১। প্রাক্তন আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মি. এস. এ. মালেক বলেন —

(ক) কোন দেশের সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানো যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে বাংলাদেশে তা মহাপাপ। ১৯৭৫-এর পরে শাসকবর্গ জনগণের অনুমোদন ছাড়া দেশের সংবিধানকে যে ভাবে পালটে দিয়েছেন তাতে সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়েছেন।

(খ) ১৯৭১-এ যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাদের অনেকেই চরম মৌলবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছেন।..... সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন করা বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা এরূপ নীরব, নিশ্চুপ, উদাসীন হতে পারে, অন্তত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, বিশ্ব ইতিহাসে এটা বিরল ঘটনা বলেই মনে হয়। (দৈ. স্টেট্সম্যান, ১৩.৮.০৪, পৃ-৪)

২। গত ১১.৮.২০০৪ তারিখে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন —

বাংলাদেশীরা যারা বাংলাদেশকে একটি পাকিস্তানে পরিণত করতে চায়, ... তারা এখানে একটি অন্ধ, মধ্যযুগীয় মৌলবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে মানুষের কোন স্বাধীনতা থাকবে না, চিন্তা ও চেতনার স্বাধীনতা থাকবে না এবং মানুষ তাদের পদতলে থাকবে এবং কতগুলো অপবিশ্বাসকে চূড়ান্ত সত্য বলে গণ্য করবে। (দৈনিক স্টেট্সম্যান, ১৮.৭.২০০৪, বিচিত্রা অংশ, পৃ-৪)



হুমায়ুন আজাদ (প্রয়াত)

(খ) ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে গত ২৩ জুলাই (২০০৪) আজাদ সাহেব বলেছিলেন, দুর্নীতি নয়, ধর্ষণের জন্য আমাদের দেশ এক নম্বরে। ধর্ষণের জন্যই যেন পুলিশকে নিয়োগ দেওয়া হয়। (দৈনিক স্টেট্সম্যান, ২৫ জুলাই, ০৪, পৃ-৭)...... দুর্নীতি ও কালোবাজারী যত বাড়ছে মসজিদ মাদ্রাসাও তত বাড়ছে। তাঁর বিশ্বাস কালো বাজারিরাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার নেই, মানবাধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে শুধুমাত্র দলিল দস্তাবেজে। (ঐ, ১.৮.২০০৪, পৃ-৭)

গভীর পরিতাপের বিষয়, মৌলবাদীদের আক্রমণে আজাদ সাহেব ২০০৪-এ মারা যান।

৩। বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় নির্বাচনের পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর নিয়ে একটি মূল্যবান ডকুমেন্ট (সংকলন) আমাদের হাতে এসেছে। নাম- 'Bangladesh : A Portrait of Covert Genocide', published by Bangladesh Hindu-Buddhist & Christian Council, USA । এই ডকুমেন্ট থেকে কিছু তথ্য তুলে ধরছি —

ক। ২০০১-এর ১ অক্টোবর নির্বাচন শেষ হতে না হতেই গৌরনদীর চাঁদসী গ্রামের ৫ মাসের গর্ভবতী সাবিত্রী দেবীকে মুসলিম মৌলবাদীরা গণ-ধর্ষণ করে। তার স্বামীকে বেঁধে রাখা হয়েছিল তার সামনেই। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে আগৈলঝরা ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যা রেণুকা অধিকারী ধর্ষিতা হন।

খ। নির্বাচনের ৭ দিন পরে ২৫/৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রাতের অন্ধকারে সিরাজগঞ্জ জিলার উল্লাপাড়া থানার পূর্ব দেউলিয়া গ্রামের অনিল কুমার শীলের পরিবারের ওপর চড়াও হয়। অনেকের মধ্যে অনিলবাবুর ছোট মেয়ে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী ১৫ বছর বয়সের পূর্ণিমা শীল চরমতম পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়। পরিবারের সবাইকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে পূর্ণিমাকে তুলে নিয়ে পালা করে তাকে ধর্ষণ করে মৌলবাদী নরপশুরা। দু'ঘন্টা পরে তাকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় থানা কিন্তু ধর্ষণের মামলা গ্রহণ করেনি। মি. শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' ২০০১-এর ২০ অক্টোবর পূর্ণিমা রানী সহ অনিলবাবুর পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে ঢাকা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত করেন ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য।

গ। ৬.১.২০০২ তারিখে কক্সবাজার পৌর এলাকার সুজন বড়ুয়া নামে ২০ বছরের এক বৌদ্ধ যুবককে নৃশংস ভাবে খুন করে।

ঘ। ১৬. ১১. ২০০১ তারিখে চট্টগ্রামের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরিকে তার নিজের বাড়ীতে ঢুকে মাথায় গুলি করে খুন করে সরকারী সন্ত্রাসীরা।

ঙ। নির্বাচনের ৯২ দিনের মধ্যে জোট সন্ত্রাসীদের হাতে বাংলাদেশে নিহত ৮০, ২,৮১১ এবং ধর্ষিতা হয়েছেন ২২৮। সম্ভ্রম হারানো নারীদের মধ্যে ২২৫ জনই সংখ্যালঘু, যাদের বয়স ৮ থেকে ৫০ বছর। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ইন্টারনেট সংস্করণ, ১৭.২.২০০২)

চ। সাতক্ষীরায় নবম শ্রেণির পড়ুয়া পুত্রকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে পুত্রের সামনেই মাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে বিএনপির ৪ সন্ত্রাসী ক্যাডার।

ছ। ২৬.১.২০০২ তারিখে বাউফলের কালিশুরিতে বিএনপির এক গুণ্ডা হাচান স্থানীয় ব্রজরঞ্জন দাসের কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা চেয়ে না পেয়ে ঘটনার দিন রাতে হাচানের নেতৃত্বে ৮/১০ জন বিএনপি ক্যাডার ...... মা মনমোহিনী (৪৫)-এর পরনের কাপড় খুলে নেয় এবং ব্রজরঞ্জন দাসের ষোড়শী ও অষ্টাদশী দুই কন্যাকে শ্লীলতাহানি করে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ইন্টারনেট সংস্করণ, ২৯.১.২০০২)

জ। নির্বাচনের আগে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সংগ্রাম কৃষ্ণ বণিকের ডান পা কেটে নেওয়া হয়। এ সব পাশবিক ঘটনা ঘটে যাবার আগেই বেগম খালেদা পবিত্র খোদার নামে শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন। তার আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং বর্ষীয়ান কমিউনিষ্ট কমরেড জ্যোতি বসু বেগম সাহেবাকে অভিনন্দন জানিয়ে রেখেছেন। ***প্রশ্ন জাগে, ভারত কি এতই অসহায়!!***

১৪ অক্টোবর শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে কয়েকজন সাংবাদিক বাংলাদেশের কয়েকটি জায়গায় গিয়েছিলেন সরজমিনে তদন্ত করার জন্য। তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনুন কবির সাহেবের মুখেই — (স. গ্রন্থ-১৩)

" ... স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সংখ্যালঘুর উপর হামলার বিষয় একটি বিশেষ দল ও বিশেষ সম্প্রদায় অতিরঞ্জিত করে বাজারে ছড়াচ্ছে।' (এ সব) তদন্ত করে দেখার জন্য ১৪ অক্টোবর আমরা ফেনী গিয়েছিলাম। ...... আমরা দু'টি বিষয়ে একমত হয়েছি। ... সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতনের যে সব ঘটনা ঘটছে তার এক দশমাংশও পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে না।" পৃ-৫৩। ... সন্ত্রাসীরা এক দেড় মাস আগে থেকেই হুমকি দিচ্ছিল চাঁদার জন্য। পরিবার প্রতি পাঁচ হাজার, দশ হাজার থেকে শুরু করে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত। ... বৃহত্তর নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের হিন্দুদের .... গালি দেওয়া হয় 'ড্যাঁডা' বলে। সন্ত্রাসীদের হুমকির ভাষা সর্বত্র এক — 'টেঁয়া ন দিলে ড্যাঁডার গুষ্টিরে বাংলাদেশে থাইকতাম দিতাম ন।' এর অর্থ টাকা না দিলে হিন্দুদের গুষ্টিকে বাংলাদেশে থাকতে দেব না। (পৃ-৫৪-৫৫)

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ১৯ অক্টোবর (২০০১) জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে বলেছেন, **'এ দেশের মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানসহ সকল ধর্মের সকল আদিবাসী প্রতিটি মানুষই বাংলাদেশী। এই চমৎকার ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশে যারা সংখ্যালঘু শব্দটি ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের মাঝে বিভক্তির দেয়াল তুলতে চায় তাদের বিষয় দেশবাসীকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। ..... বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সম্প্রীতির দেশ।'** (পৃ-৫৮-৫৯)

('২০০১-এর ১ অক্টোবর থেকে ৯২ দিনের মধ্যে বিএনপি এবং জামাতীরা ৮০ জন সংখ্যালঘুকে খুন করে, ৮১১ জনকে আহত করে। ধর্ষণ করে ২২৮ জনকে। তাদের মধ্যে সংখ্যালঘু মহিলার সংখ্যা ২২৫ জন। তাদের বয়স ৮ থেকে ৫০ বছর। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা শতকরা ১০-এর কম। এই হিসেবে শতকরা ৯৮.৭ জন সংখ্যালঘু মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন।' খবরটি প্রকাশিত হয়েছে ১৭.০২.২০০২ তারিখের ঢাকার 'জনকণ্ঠ' পত্রিকায়। *ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রির প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তথা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রীব্রজেশ মিশ্র অক্টোবরের ২৬-২৭ তারিখে বাংলাদেশ*


শ্রীব্রজেশ মিশ্র

সফরে গিয়েছিলেন। তিনি কিন্তু উপরোক্ত অত্যাচার সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি বলেই আমরা শুনেছি এবং প্রমাণও পেয়েছি।)

পার্বত্য চট্টগ্রামকে আদিবাসীশূণ্য করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে '৪৭-এর পর থেকে। (পৃ-৬০) **সংখ্যায় কম, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় বলেই হিন্দুদের বার বার নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে।** ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও সাম্প্রদায়িক হামলা হলে তাঁরা রুখে দাঁড়ায়। কারণ, সেখানে তারা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক শক্তি হিসেবে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের শক্ত জমিনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ও আদিবাসীদের পায়ের নিচে সেই জমিন নেই। (পৃ-৬১)

(১৯৭১-এর) মুক্তিযুদ্ধের সময় কীভাবে জামাতে ইসলামী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে প্ররোচিত করেছিল মানব জাতির স্মরণ কালের ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করতে, কিভাবে জামাতীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী গঠন করেছিল — ইতিহাসের এই অধ্যায়টি তিনি (বেগম খালেদা) তাঁর বহু মূল্যবান শিফন শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। (পৃ-৬৩)

১৯৭১-এ ইয়াহিয়ার সামরিক জুন্তা এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দল ইসলামের দোহাই দিয়ে যাবতীয় হত্যাকাণ্ড ও নারী নির্যাতন জায়েজ করতে চেয়েছে।.... একাত্তরের পরে যারা জন্মেছে তাদের গড়ে তোলা হয়েছে পাকিস্তানী ভাবধারায়। (তাদের) অধিকাংশ জানে না একাত্তরে কার বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ হয়েছিল, কারা ছিল শত্রু ও মিত্র। ..... স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কময় অধ্যায় বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড এবং হত্যাকারীদের বিচার না করার ইনডেমনিটি আইন। (১৯৭৫-এর) ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডকে ঘাতক ও তাদের সহযোগীরা আখ্যায়িত করেছে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হিসেবে। (পৃ-৬৮-৬৯)

বাংলাদেশকে পাকিস্তানে রূপান্তরিতকরণ প্রক্রিয়ায় জেনারেল জিয়ার আমলে প্রায় দু' হাজার মুক্তি যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছিল বিভিন্ন সময় জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাওয়ার অভিযোগে। (পৃ-৭০)

... বেগম খালেদা জিয়ার চার দলীয় জোটের অন্যতম শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক তখন সাম্প্রদায়িক আগুন উস্কে দিয়েছিলেন এই বলে — **'ইসলাম নামক বৃক্ষটির গোড়ায় পানি নয় রক্ত ঢালতে হবে।'** (পৃ- ৮৬)

'... 'দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে **যে আওয়ামী লীগকে ভোট দেবার অভিযোগে হিন্দুদের**

উপর এই নির্যাতন সেই দলেরও শীর্ষ নেতা বা নেত্রী আজ পর্যন্ত কোনও উপদ্রুত এলাকা সফর করেননি।' (পৃ- ৮৬ ও ৮৭)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে হিন্দুরা। ...... যে বাংলাদেশের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের এত ত্যাগ সেই বাংলাদেশ আজও তাদের বাসযোগ্য হয়নি। প্রতিনিয়ত তাদের দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে হয়, আজও তাদের একাত্তরেব মত 'গণিমতের মাল' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। (পৃ- ৮৭)

থানায় দশ ভাগের এক ভাগ অভিযোগও সবসময় নথিবদ্ধ হয় না। কারণ —

১। বাংলাদেশের হিন্দুরা '৪৭-এর পর থেকেই নিজেদের বাসভূমিতে পরবাসীর জীবন যাপন করছেন। সদা সন্ত্রস্ত, বিপন্ন এই ধর্মীয় সম্প্রদায় চরম পরিস্থিতির শিকার না হলে থানায় বা পত্রিকায় অভিযোগ জানাতে চায় না, ... থানা বা প্রশাসন কখনও যদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয় আক্রান্তরা দ্বিতীয়বার দ্বিগুণ হামলার মুখোমুখি হয় এবং অনেক সময় পত্রিকাও বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক খবর প্রকাশ করে না 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। পৃ-৯৩

বিএনপি-র কিছু কাগুজে হিন্দু সংগঠন আছে, যারা বলছে কোথাও কিছু ঘটেনি, ... কিন্তু তাতে কি মুছে যাবে শতাধিক প্রাণহানি, নারীর সম্ভ্রমহানি, সীমাহীন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ ও ধনসম্পদ লুণ্ঠনের বেদনা, গ্লানি ও হাহাকার? (পৃ-৯৪)

বাংলাদেশের বিশিষ্ট নিবন্ধকার মি. সালাম আজাদের লেখা 'এথনিং ক্লিনসিং' (সহায়ক গ্রন্থ-২০) থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য উল্লেখ করছি —

১। গ্রামের ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার কারণে ..... দুই সন্তানের জননী শেফালীর বাম পা হাঁটুর ওপর থেকে কেটে ফেলতে হয়েছিল। ... বার বছর ধরে এক পা নিয়েই চলেছে তার জীবন। সংসার, স্বামী সন্তান। সন্ত্রাসীদের একটি দল যখন নির্বাচনের পরদিন রাতে গ্রাম আক্রমণ করে তখন অনেকের সঙ্গে সে হাটু পানি ভেঙ্গে আশ্রয়ের সন্ধানে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু পানিতে নামতে গিয়ে বাম হাতে ধরা .... ক্রাচটিও তখন হাত থেকে ছুটে পানিতে ভাসতে থাকে। ..... সে চিৎকার করে উঠে। .... শেফালীকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় পাশের গাব গাছ তলায়। সেখানে লুটের মালামাল জমিয়েছিল সন্ত্রাসীরা। এখানেই পর্যায়ক্রমে তারা শেফালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাত জনের কথা শেফালী মনে রাখতে পারে। এরপর সে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। (পৃ- ৯-১০)

২। ইলশাকান্দি গ্রামের জাহাঙ্গীর মাতব্বরের হাতে ষাট হাজার টাকা তুলে দিয়েছে জাহাজমারা গ্রামের হিন্দুরা। সন্ত্রাসীরা এই গ্রাম লুট করে ক্ষান্ত হয়নি। তাদের দাবি চাঁদা। সেটা হতে পারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, কিংবা মাসিক ভিত্তিতে। জাহাজমারা গ্রামের সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি প্রতি মাসে গ্রামের হিন্দুদের থেকে চাঁদা তুলে ষাট হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে বলে কথা দিয়েছে। প্রতি মাসে এই টাকা তুলে দিতে হবে জাহাঙ্গীর মাতব্বরের হাতে। ক্ষমতাসীন দলের সে এই এলাকার নেতা। একই সঙ্গে সন্ত্রাসীদেরও

নেতা। এই চাঁদা বন্ধ হলে আবার হামলা করা হবে বলে শাসিয়ে গেছে তারা। **আর যদি গ্রামের সব হিন্দু মুসলমান হয়ে যায়, নিয়মিত গরুর মাংস খায়, মসজিদে গিয়ে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তাহলে এক টাকাও চাঁদা দিতে হবে না, সে কথাও বলে গেছে সন্ত্রাসীরা।** বিকল্প ..... যদি গ্রামের সব হিন্দুরা চলে যায় তাহলেও চাঁদা দিতে হবে না। **কিন্তু শর্ত হচ্ছে যাবার আগে এক ছটাক জমিও কেউ বিক্রি করতে পারবে না।** হিন্দু হয়ে জাহাজমারা গ্রামে থাকতে হলে তাদেরকে **প্রতি মাসে ষাট হাজার টাকা চাঁদা দিতেই হবে।** (পৃ- ১১)

(এটি হানাফী মতের বিধান। এই মত অনুসারে মুসলিম শাসিত দেশে অমুসলিমরা বাঁচতে চাইলে জিজিয়া কর দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকার চক্ষু লজ্জার খাতিরে প্রত্যক্ষে তাদের উপর জিজিয়া বসাতে পারছে না। এই দায়িত্ব পালন করছে ঈমানদার মুসলমানরা।)

৩। লেজপাতা গ্রামের সরকারবাড়িতে তেরোটি হিন্দু পরিবার বাস করে। বাড়ির কোন পুরুষের গায়েই কাপড় নেই। সবাই গামছা পরিহিত। নতুন গামছা। বাজার থেকে বাকিতে আনতে হয়েছে। ঘরের কিছু তো রাখেই নেই, পরনের কাপড়ও লুঠ করে নিয়েছে। উলঙ্গ করে সরকার বাড়ির প্রতিটি পুরুষকে হকি ষ্টিক দিয়ে পিটিয়েছে নির্বাচনের পরদিন রাতে। এ বাড়ির সকলে যখন ঘুমিয়েছিল পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনের একটি দল এসে বিকট শব্দে বাড়ির উঠানে বোমা ফাটায়।.... বোমা বিস্ফোরণের পর সন্ত্রাসীরা 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে আমাদের দরজায় আঘাত করে। প্রভারাণী পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে ঘরের পিছনের পুকুরে লাফিয়ে পড়ে শুধু নাক উপরে রেখে সমস্ত শরীর পানিতে ডুবিয়ে রেখে নিজেকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু নরপশুরা টর্চলাইট মেরে চুল ধরে টেনে তুলে প্রভারাণীকে। পুকুরের পাড়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা। ... এই বাড়ির চার যুবতী মেয়ে বীণা, পলি, মিলন ও শিপ্রা দৌড়ে হোগলাপাতার বনে গিয়েও ইজ্জত বাঁচাতে পারেনি, ... মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা ভ্যান ও রিক্সা নিয়ে এসেছিল। **বাবা-মায়ের সামনে কন্যাকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে উলঙ্গ করে উল্লাস করেছে প্রথম। তারপর ধর্ষণ করেছে পর্যায়ক্রমে।** যাবার সময় পনেরটি ভ্যান রিক্সা ভর্তি করে সরকার বাড়ির তের পরিবারের তৈজসপত্র, বিছানা, কাপড়, সামান্য ধান চাউল যা ছিল সবকিছু নিয়ে যায়। (পৃ- ১৩-১৪)

৪। হিন্দু সম্পত্তি দখল করার অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনের মতো হিন্দু নারী ধর্ষণ করার কোন আইন না থাকলেও ঐ শ্রেণীর কাছে এটা একটা মধ্যযুগীয় নিয়মে পরিণত হয়ে পড়েছে। (পৃ- ১৭)

৫। কোড়ামারা গ্রামের বৃদ্ধা নারায়ণী দাসের ..... একমাত্র ছেলে গোপালকে বিয়ে দিয়েছিল তিন মাস আগে। বেশ আয়োজন করে বিয়ের অনুষ্ঠান করেছিল। কিন্তু নির্বচানের পরদিন বিজয়ী দলের কুড়ি জনের একটি দল উল্লাস করতে করতে তার বাড়িতে চড়াও হয়। গোপালকে মারাত্মক ভাবে আহত করে গোপালের স্ত্রীর সব

রকম কাকুতি মিনতি উপেক্ষা করে গণধর্ষণ করে। (পৃ-৩৯)

৬। চিতলমারী উপজেলার ...... এসব গ্রামগুলিতে নির্বাচনের পর ছ'দিন ধরে চলেছে লুট, হামলা, ধর্ষণ। কিন্তু তার পর থেকেই শুরু হয়েছে চাঁদাবাজি। প্রতিটি হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছে। চাঁদা নেওয়ার সময় বলে যাচ্ছে, আগামী পাঁচ বছর এদেশে থাকতে হলে নিয়মিত চাঁদা দিতে হবে। তা না দিলে বাড়ির মেয়েদের দিতে হবে। তাও না দিতে পারলে বসত বাড়ি, আবাদি জমি ছেড়ে দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে চলে যেতে হবে। .... যারা চাঁদা দিতে অসমর্থ তারা বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেছে। (পৃ-৩৯)

৭। সন্ধ্যায় দক্ষিণ বানিয়ারী গ্রামে রোগী দেখতে যাচ্ছিলেন দেবলাল *(ডাক্তার)*। বাজারের হান্নান ফকিরের চায়ের দোকানের কাছ দিয়ে তিনি যখন পথ অতিক্রম করছিলেন কয়েকটি ছেলে তাকে ডেকে দাঁড় করায়। এই ছেলেগুলোকে সে প্রায়ই এই চায়ের দোকানে বসে থাকতে দেখেছে। নির্বাচনের প্রচারণার সময় তারা একদিন দেবলালের চেম্বারেও গিয়েছিল ধানের শীষে ভোট চাইতে। ছেলেগুলো পাগল সাজানোর মতো করে ডাক্তার দেবলালকে সেখানে ঘিরে ধরে নানাভাবে অপদস্থ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের একজন হুংকার দিয়ে বলে, একটা ব্লেড নিয়ে আয়, শালারা মালাউন নৌকায় ভোট দিছে। শুয়োরের বাচ্চারে আগা কাইট্টা মুসলমান বানাইয়া দেই। ছেলের বয়সী এই ছেলেগুলোর আচরণে ডাক্তার দেবলাল ভয় পেয়ে যান। যখন সত্যিই ওরা ব্লেড এনে দেবলালকে উলঙ্গ করতে চাইলো দেবলাল ডাকুয়া চিৎকার না দিয়ে পারেননি। তার চিৎকারে কেউ এগিয়ে আসেনি। এই দৃশ্য দেখতে লোকজন জড়ো হয়েছিল অনেক কিন্তু কেউ একটা কথাও বললো না। ... দেবলাল .... পানি চায়। .... কিন্তু তারা দেবলালকে পেশাব খাওয়াতে চায়। মনির নামের ছেলেটি বলে, **'শালার মালাউনের বাচ্চাকে পেশাব খাওয়াইয়া দে। মুসলমানদের পেশাব খাইয়া হিন্দুরে পবিত্র কর'**। পেশাব ভর্তি একটি বাটি এনে দেবলালের মুখের সামনে ধরে। ... তা না গেলা পর্যন্ত ওরা দু'জনে দেবলালের মুখ চেপে ধরে রাখে। পেশাব খাওয়ানোর পর ছেলেগুলি ব্লেড ব্যবহারের সিদ্ধান্ত বদল করে। (পৃ- ৪১)

৮। সাধনা দেবী জানায়, ... তার গলায় ছুরি ধরে নিজের ছেলের বয়সী যুবকরাই একে একে মহিলাকে ধর্ষণ করে। এই যুবকরাই নির্বাচনের আগের দিন তাকে ধানের শীষে ভোট দিতে বলে গিয়েছিল। .... অপর একটি ঘটনা ... মা ও মেয়ে এক ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। ....ঘরের মুলিবাঁশের বেড়া কেটে এক যুবক ঘরে ঢোকে। তারা .... মেয়ের গলায় রামদা ঠেকিয়ে সেই ঘরে মা ও মেয়েকে পাশাপাশি ধর্ষণ করে। কাউকে এ ঘটনা জানালে হত্যা করার হুমকি দিয়ে ধর্ষণকারী চলে যায়। (পৃ- ৪২-৪৩)

৯। আড়ানীর ঘোষ পাড়ায় নারায়ণদের বাড়ি। গভীর রাতে এ পাড়ায় হামলা করে আটজন সন্ত্রাসী। নির্বাচনের আগে যারা ধানের শীষে ভোট চাইতে এসেছিল, এই আটজন শিপ্রা রাণী ঘোষের ঘরে ঢোকে দরজা ভেঙ্গে। ঘরে বিধবা শিপ্রা রাণী এবং

তার সতের বছরের মেয়ে রেখা ছাড়া আর কেউ ছিল না। সন্ত্রাসীরা ঘরে ঢুকেই রেখার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলে সে চীৎকার দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। শিপ্রা আটজনের মধ্যে যে নেতা তার পা জড়িয়ে ধরে বলে, তোমরা আটজন মিলে আমার মেয়েকে 'করলে' রেখা বাঁচবে না। তোমরা একজন করে আস। ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন শিপ্রা রাণী ঘোষ নিজে। হাসপাতালে শয্যাশায়ী তার ভাই নারায়ণ চন্দ্র ঘোষের পাশে বসে। তার ভাইয়ের বাড়ি আড়ানীর ঘোষ পাড়াতেই। নারায়ণের উপর হামলা করলে সে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু দর্পনা সিনেমা হলের সামনে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে ধরে ফেলে। সেখানেই নারায়ণের পায়ের রগ কেটে দেয় জামাত শিবিরের সন্ত্রাসীরা। (পৃ-৫২)

১০। **কলকাতায় রাহুল *(সাংবাদিক)* কথা বলে সিপিএমের বিমান বসুর সঙ্গে। তিনি রাহুলের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত আচরণ করা উচিত নয়।** ... এ ব্যাপারে রাজনীতির কচকচানী করে দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষতি করা উচিত না। (পৃ-৭৯)

১১। .... দুলালের মেয়ে অপর্ণা। ... (ভোলার চরফ্যাশনে) তেরো অক্টোবর রাতে অপর্ণা 'জাতীয়তাবাদী ফূর্তি'র শিকার হয়। ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় দুলাল কর্মকারের স্বপ্ন। (পৃ- ৯০-৯১) .... ঢাকায় নেবার আগের রাতেই সে আমাদের ছেড়ে চলে যায়। .... অপর্ণা বাড়ির উঠানে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে বসা ছিল। গ্রামের মসজিদের ইমাম তার এক তালবেলামকে নিয়ে দুলালের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথ অতিক্রম করেছিল। অপর্ণার দিকেই চোখ পড়তেই 'নষ্ট মেয়েমানুষ' বলে মাথার ছাতাটি নামিয়ে অপর্ণাকে আড়াল করে। ইমাম অপর্ণার মুখ দেখলে তার অজু চলে যাবে, পাপ হবে। অথচ ধর্ষণকারীদের মধ্যে ইমামের বড় ছেলে আবু বকরও ছিল। ওদের পাশবিক নির্যাতন, সিগারেটের আগুনের ছেঁকা পনেরো বছরের অপর্ণার সহ্য করা সম্ভব ছিল না। সে জ্ঞান হারিয়েছিল। কিন্তু ইমামের 'নষ্ট মেয়েমানুষ' সম্বোধন তার চেয়েও বেশী কষ্টের মনে হল আপর্ণার কাছে। সে যে লাঠিতে ভর করে অসুস্থ শরীর টেনে বেড়াচ্ছিল তারই ওপর ভর করে ঘরে ফিরে গেল। ... পুরো বাড়িতে তখন কেউ নেই। দরজায় খিল এটে সে একটা দড়ি গলায় বেঁধে ঝুলে পড়লো। আর কোনদিন তাকে নষ্ট মেয়ে মানুষ কথাটি শুনতে হবে না। ...... সেদিন রাতেই অপর্ণার সৎকার করা হয়। দাউ দাউ করে যখন আগুন অপর্ণার শরীর পুড়ে নিচ্ছিল এ সময় পুলিশ উপস্থিত। মেয়ের ময়না তদন্ত না করানোর জন্য দুলালকে মেয়ের খুনী সম্বোধন করে থানায় বেঁধে নিয়ে যায়। দুলাল পেছনে ফিরে মেয়ের চিতা দেখে আর চোখ মুছে। তিনদিন তাকে থানায় আটকে রাখা হয়। কোর্টে না পাঠিয়ে থানায় আটকে রেখে দুলালের সঙ্গে কথা বলে, দেন দরবার করে থানার পুলিশ, ইমাম পুত্র আবু বকর। দুলালের স্ত্রী মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যা কিছু সঞ্চয় করে রেখেছিল তার পুরোটা নিয়ে থানায় গেলে তা গ্রহণ করে আবু বকর একটা স্ট্যাম্প এগিয়ে দেয়

দুলালের দিকে। তাতে সই করে দুলাল কর্মকার থানা থেকে বেরিয়ে আসে। **থানা থেকে বের হওয়ার আগে আবু বকর জানিয়ে দেয় স্ট্যাম্পে সই করার পর দুলাল কর্মকারের বাড়ি জমি বাজারের দোকান সব কিছুর মালিক আবু বকর নিজে।** দুলাল যেন তার বাড়ির দিকে না যায়। (পৃ- ৯১-৯২)

১৪.৬.২০০৪ তারিখের 'ভোরের কাগজ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহ জিলার তসরা গ্রামের জগদীশ চন্দ্র সরকারের কন্যা স্কুল ছাত্রী সাথী রানীকে মামুন ও রাসেল নামে দুই মুসলমান যুবক দিনের পর দিন উত্যক্ত করত। বাবা জগদীশবাবু মেয়েকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ বখাটেরা তাতে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। তখন সাথী রানী বাড়ীর পাশে মহাসড়কে গিয়ে রাতের আঁধারে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এই আত্মহত্যার নেপথ্য কারণ প্রচার হতে থাকলে প্রভাবশালী মহলের হুমকির মুখে জগদীশবাবু রাতের অন্ধকারে ৮ সদস্য পরিবারের সকলকে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে যায়। (মায়ের ডাক, ১০.১.'০৫, পৃ-২)

২০০১-এর নির্বাচনের আগে থেকেই প্রতিদিনই এই ধরনের অজস্র খবর আসতে শুরু করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য 'বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ'-এর (ইটালগাছা রোড, কোলকাতা-৭৯) নেতৃত্বে ২০ নভেম্বর, ২০০১, মঙ্গলবার, কোলকাতা মহানগরীতে বাংলাদেশ থেকে আসা হাজার হাজার শরণার্থী এক ধিক্কার মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছেন। পরিষদের আহ্বায়ক অধুনা প্রয়াত বিপদ ভঞ্জন বিশ্বাসের নেতৃত্বে ৫ জন কর্মকর্তা কোলকাতাস্থ ৮-টি বিদেশী দূতাবাসে (আমেরিকা, যুক্ত রাজ্য, কানাডা, জার্মানী, জাপান, ইটালী, রাশিয়া ও ফ্রান্স) 'স্মারক-লিপি' প্রদান করেন। একই ভাবে পরিষদের উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের নেতৃত্বে ৪ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে স্মারক-লিপি প্রদান করেন। মিছিল শেষ হয় কোলকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের সামনে গিয়ে। ওখানে প্রায় ২ ঘন্টা ধরে বিভিন্ন নেতা-কর্মী বক্তব্য রাখেন।

তথ্যপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী ভাষণে শ্রীদেবজ্যোতি রায় ডেপুটি হাইকমিশনারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, ১৯৭১-এ এই উপ-দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মি. হোসেন আলী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। আজ ২০০১-এ অনুরূপ বীভৎস ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে। নারী নির্যাতনের ব্যাপারে কোথাও কোথাও ১৯৭১-কেও হার মানিয়েছে। আপনাদের দেশের মৌলবাদী অপশক্তি মা-বাবার সামনে যুবতী মেয়েকে উলঙ্গ করে ধর্ষণ করছে। স্বামী, শ্বশুর-শাশুরীকে বেঁধে রেখে তাদের সামনে পুত্র-বধূকে ধর্ষণ করছে। আপনি কি এসব অস্বীকার করতে পারেন?

নারী ধর্ষণ আজও চলছে

নারী ধর্ষণ কিন্তু আজও চলছে। প্রতিদিন অসংখ্য কিশোরী-যুবতী-মহিলাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। ২০০৯-এর জুন মাস থেকে ২০১১-এর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত্য ২১৫ জনের খবর সংগ্রহ করেছেন শ্রীরবীন্দ্র ঘোষ। এদের মধ্যে ২০১০-এ শেখ হাসিনার শাসনামলে অনেক অত্যাচারিতা মহিলার পরিচয় প্রকাশ করেছে আমেরিকার বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ তাদের 'UNITY' নামক নিউজ লেটারে। আমরা সেখান থেকে ২৪ জন অত্যাচারিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি।

(Website : bhbcuc-usa.org; e-mail: unitycouncilusa@gmail.co)

১। মাগুরা জিলার মি. গোপাল চন্দ্র সিকদারের মেয়ে ইন্দ্রানী সিকদার বৃষ্টি (১৮) ১৭ জানুয়ারি ঢাকা থেকে অপহৃতা হয়েছে। ১৯ তারিখ গোপালবাবুকে ফোন করে জানানো হয় যে, তার মেয়ে আসিফ শাকিলের (২৪) হেফাজতে আছে। এ খবর যেন কাউকে জানানো না হয়। গোপালবাবু কিন্তু তেজগাঁও থানায় এফ আই আর করেন। ৯ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত ইন্দ্রানীর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

২। জয়পুরহাটের ১৬ বছর বয়স্কা পপি রাণি সরকার ২৮ ফেব্রুয়ারি কলেজে যাবার পথে অপহৃতা হয়।

৩। নড়াইল জেলার গাছবেড়িয়া গ্রামের বিধান বিশ্বাসের ৫ বছরের শিশু কন্যা প্রথম শ্রেণির ছাত্রী বিউটিকে ১২ মার্চ রাতে ২৭ বছর বয়স্ক বাদশা মোল্লা ধর্ষণ করে।

৪। বগুড়া আজিজুল হক কলেজে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে পাঠরতা মেধাবী ছাত্রী তথা সুগায়িকা দীপা রাণি কুণ্ডুকে ১৪ মার্চ অপহরণ করা হয়। অপহরণকারী দীপার বাবার কাছে অনেক টাকা দাবি করে। অন্যথায় মেয়েকে গর্ভবতী করা হবে বলে হুমকি দেয়। ২০ এপ্রিল উত্তমবাবু একজন অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, অপহরণকারী ম. জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন তার নাম জান্না-তুল-ফেরদৌস।

৫। বিরামপুর (দিনাজপুর) সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী অপর্ণা রাণিকে (১৬) স্কুল থেকে ফেরার পথে ১৪ মার্চ বেলা ২-টার সময় অপহরণ করা হয়।

৬। সিরাজগঞ্জের ৯ম শ্রেণির ছাত্রী সুমিত্রা দত্তকে (১৪) স্কুলে যাওয়ার পথে ১৬ মার্চ অপহরণ করা হয়। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ফলে পুলিশ তাকে ২ এপ্রিল উদ্ধার করে।

৭। পটুয়াখালি জেলার বাউফল লেহালিয়ার কাছে ১৯ মার্চ সন্ধ্যা ৭-টা নাগাদ ১৬ বছরের এক হিন্দু মেয়েকে ৮ জন (বেশিও হতে পারে) মুসলিম গুণ্ডা গণধর্ষণ করে। এদের মধ্যে ৪ জন বি-এন-পির যুব দলের সশস্ত্র ক্যাডার।

৮। বাউফল উপজিলার নবম শ্রেণির ছাত্রী অঞ্জু রাণি দাস ১৯ মার্চ রাত সাড়ে আটটা নাগাদ গণধর্ষিতা হয়।

৯। সুনামগঞ্জ জিলার হাজং সম্প্রদায়ের ১৫ বছর বয়স্কা একটি মেয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি অপহৃতা হয়। তাকে একটি নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে ৫ জন মুসলিম দুষ্কৃতকারী একের পর এক ধর্ষণ করে। ফলে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায়।

১০। সাতক্ষীরা জেলার টালা থানার অন্তর্গত প্রকাশ বিশ্বাসের স্ত্রী মণিমালা বিশ্বাসকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে মুসলমান বানিয়ে নাম দেওয়া হয় ফাতেমা বেগম। সে অপহরণকারীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। এর পরপরই তার উপর শারীরিক মানসিক অত্যাচার শুরু হয়। ফলে তার মৃত্যু ঘটে। দেহটি মুসলিম মতে কবর দেওয়া হয়েছে।

১১। মাগুরা জিলার পূর্ণিমা সমদ্দার নামে ১৪ বছর বয়স্কা ছাত্রী ৪ আগস্ট যখন স্কুল থেকে ফিরছিল, তখন তাকে ৫-৭ জন মুসলিম যুবক কাছাকাছি একটি পাট ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে একের পর এক ধর্ষণ করতে থাকে। পুলিশ তিন জন দুষ্কৃতকারীকে অ্যারেষ্ট করেছে।

১২। মে মাসের ১৪ তারিখ মোহালছাড়ি উপজেলার ২৪ বছর বয়স্কা এক গৃহবধূর স্বামীকে বেঁধে রেখে এক দঙ্গল মুসলিম যুবক গণ গণধর্ষণ করে।

১৩। আমগ্রামের ৮ বছরের কিশোরী গোলাপী বালা ২০ মে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ধর্ষিতা হয়।

১৪। লালমণিরহাট জিলার শহীদ আবুল কাশেম কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল বি-এন-পি সমর্থক এবিএম ফারুক সিদ্দিক ২ জুলাই ঐ কলেজের ছাত্রী তিথিকে (১৯) ধর্ষণ করে। তিথি ঐ ধর্ষকের নাম প্রকাশ করায় ২৪ জুন ঐ ধর্ষক ১০-১২ জন গুণ্ডা নিয়ে মোটর সাইকেলে এসে তিথিকে মুসলমান বানাবার জন্য তুলে নিয়ে যায়। তিথি লাফ দিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

১৫। ১৩ জুলাই নওগাঁ জিলার জহুরুল ইসলাম প্রতিমা রাণি নামে এক বিবাহিতা আদিবাসী রমনীর ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করে। মহিলা চীৎকার করলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ঐ কু-কর্ম দেখে। প্রতিমা দেবী অপমানিত বোধ করেন এবং বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

১৬। নেত্রকোনা জিলার ১৩ বছর বয়স্কা হিন্দু ছাত্রীকে স্কুলে যাওয়ার পথে অপহরণ করা হয় ১৭ জুলাই।

১৭। ১৯ আগস্ট গাইবান্ধার একটি এন-জি-ওর কর্মী অঞ্জনা রাণিকে (৩৪) পিটিয়ে খুন করে মহম্মদ জাফর প্রামাণিক এবং মোশারফ আলি।

১৮। ঐ গাইবান্ধা জিলার ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ১৪ বছর বয়স্কা বুলবুলি রাণিকে ১ অক্টোবর ম. আজহার (৩৫) এবং মিঠু মিঞা (৩০) ধর্ষণ করে।

১৯। ১০ অক্টোবর ময়মনসিংহ জিলার ১৬ বছর বয়স্কা স্কুল ছাত্রী শ্রেষ্টা দে-কে স্কুলে যাবার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে পিস্তল দেখিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ১৩ তারিখ পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। অপহরণকারী জুয়েল ও রোকনকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে।

২০। ১৪ অক্টোবর গাইবান্ধা জিলার দলিত সমাজের রীণা রাণির (৩২) গায়ে

এসিড ঢেলে দেয় মহম্মদ সবুজ মিঞা। তাকে ধরা হয়নি।

২১। ২৫ অক্টোবর গাইবান্ধা জিলার ১৫ বছর বয়স্কা ছাত্রী শিখা রাণি রায়কে অপহরণ করা করে নিয়ে যায় মহম্মদ আবদুর রহিম মিঞা, মহম্মদ আযম মিঞা এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা।

২২। সাতক্ষীরা জিলার ৭ম শ্রেণির ছাত্রী সৌমিতাকে স্কুলে যাওয়ার পথে দিনের পর দিন উত্যক্ত করছিল জাহাঙ্গীর নামে এক মুসলিম যুবক। ... ওকে অপহরণ করার জন্য ২৭ অক্টোবর রাতে জাহাঙ্গীর ঐ মেয়েটির বাড়িতেহানা দেয়। সৌমিতার মা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। জাহাঙ্গীর তখন মা-মেয়ে দু'জনকেই বেধরক পেটাতে থাকে। আহত অবস্থায় উভয়কে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়।

২৩। দিনাজপুরের ১৭ বছর বয়স্কা নিপা ব্যানার্জীকে ১ ডিসেম্বর ৫ জন মুসলিম গুণ্ডা অপহরণ করে নিয়ে যায়। থানায় এফ.আই.আর করা হয়েছে। সংবাদ সংগ্রহের দিন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি কিংবা নিপাকে উদ্ধার করা যায়নি।

২৪। নেত্রকোনার ১৫ বছর বয়স্কা বোবা মেয়ে ২০১০-এর ৩ ডিসেম্বর গণধর্ষিতা হয়।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি ঘটনা বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। স্থানাভাবে পত্রিকাগুলির নাম উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

২০১১-তেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে অজস্র। একমাত্র রাজশাহীতে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৪৪-টি। (দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ৪.১.'১২)

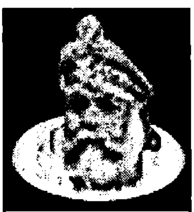
বছরের শেষে যে ঘৃণ্য ঘটনাটি ঘটেছে সেটিই এখানে উল্লেখ করছি। সিলেট জেলার অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজের ১০৮-তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমান সব ছাত্রীদেরই গো-মাংস খাওয়ানো হয়েছে। ঐ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান কমিটির আহ্বায়ক হলেন ডা. শায়লা খাতুন। তিনি হাসিনা সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের বোন। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত হয়েছেন তিনি। আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব হলেন নাজমা বেগম। হিন্দু ছাত্রীদের কাছ থেকে যখন চাঁদা নেওয়া হয়, তখন বলা হয়েছিল তাদের খাসি এবং মোরগের মাংসের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে খাওয়ানো হয়েছে গরুর মাংস। (ঢাকার 'মানব জমিন', ২৮.১২.২০১১, এবং কলকাতার 'দৈনিক স্টেটসম্যান', ২.১.২০১২)

এমনও হতে পারে যে, ম্যাডাম খাতুন ব্যস্ততার মধ্যে খাদ্য-তালিকা দেখতে পারেননি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যারা ব্যবস্থাপনায় ছিলেন তারা যে জেনেশুনে এই অপকর্ম করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা এই সাহস পেলেন কোত্থেকে? আমাদের বিশ্বাস ষড়যন্ত্রকারীরা সেই মোল্লাগোষ্ঠীর লোক যাদের শাস্তি দিতে গেলে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা হারাতে হবে।

উপসংহার

> **'ধর্মবেত্তা হানিফা হিন্দুদের *বেঁচে থাকার* মাশুল হিসেবে জিজিয়া প্রয়োগ করতে আদেশ দিয়েছেন। অপর ধর্মবেত্তাগণ বলেছেন; হিন্দুদের ' ইসলাম ধর্মগ্রহণ অথবা মৃত্যু' ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।'**
>
> — সুলতান আলাউদ্দিনের কাজী মুগীসউদ্দিন।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবী জুড়ে মুসলমান মৌলবাদীরা অমুসলমানদের উপর বিশেষত প্রতিমা পুজারীদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তার উৎসভূমি কোথায়? আজ অনেকেই বলতে শুরু করেছেন যে, কোরান আর হাদিসই এর উৎসভূমি। এই অনুমান কতটা সত্য তা বুঝবার জন্য এই লেখক মুসলমানের ছদ্মবেশে বাংলাদেশের প্রায় সব জিলায় ঘুরেছেন। কয়েক শত ওয়াজের মাহ্ফিল শুনেছেন। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কোরান এবং হাদিস পড়েছেন। এর ফলে তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, উপরোক্ত অনুমান মোটেই অনুমান নয়, একেবারেই সত্য। ৭১১/১২ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের ১৭ বছর বয়স্ক মহম্মদ বিন কাশিম যে তত্ত্ব ও নীতি নিয়ে সিন্ধুর রাজা দাহির সহ হিন্দুদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিলেন, ঠিক একই তত্ত্ব ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে দিনের পর দিন প্রতিমা পূজারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। একই তত্ত্ব নিয়ে ২০১০-এর ৬, ৭ এবং ৮ সেপ্টেম্বর এক ধর্মান্ধ নেতার নেতৃত্বে কয়েক হাজার মুসলমান ড. আম্বেদকর কথিত 'দলবদ্ধ গুণ্ডামীতে' (Gangster-ism) মেতে উঠেছিল। তারা বেছে বেছে হিন্দুদের (যাদের প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দু) প্রায় ৫০০ দোকান এবং বসত-বাড়ির সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশের সামনে দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কোটি কোটি টাকার সম্পদ দেগঙ্গার বাইরে নিয়ে যায়। কার্তিকপুরের শনি-কালী মন্দিরের বিগ্রহ ভেঙে দিয়ে তার উপর প্রস্রাব করে দেয়। তবে বিন কাশিম সেদিন ১৭ বছর এবং তার বেশি বয়সের ব্রাহ্মণদের কেটে ফেলেছিলেন। কার্তিকপুরের মোখলুকুররা ঐ কাটাকাটির মধ্যে যায়নি।



দাহিরের কাটা মাথা

বিন কাশিম সেদিন সিন্ধুর রাজা দাহিরের মাথাটি কেটে সোনার থালায় রেখে সেটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কাশিমের চাচা-কাম-শ্বশুর ইরাক-রাজ হাজ্জাজের কাছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাজ পরিবারের সব মহিলারাই সেদিন ধর্ষিতা হয়েছিলেন এবং দু'জন রাজকন্যাকে হাজ্জাজের ভোগের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপ জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৬-এর ১১ অক্টোবর



বিন কাশিম

নোয়াখালিত। ওখানকার সম্মানীয় 'পীর' বংশের 'বীর সন্তান' গোলাম সরোয়ারের নিজস্ব পাষণ্ড বাহিনী 'মিঞার ফৌজ' জমিদার রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীকে খুন করে তাঁর মাথাটি কেটে এবং তার সঙ্গে তার দুই সুন্দরী কন্যাকে উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিল গোলাম সরায়োরের কাছে। (সূত্র: নোয়াখালি জেনোসাইড, উইকিপিডিয়া।)

রাজা দাহিরের কাটা মাথার সঙ্গে বিন কাশিম হাজ্জাজের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন —

"রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁর সেনানী ও প্রধান অফিসারদের খুন করা হয়েছে এবং অবিশ্বাসীদের হয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে, নয়ত হত্যা করা হয়েছে। পুতুল পূজার মন্দিরগুলির জায়গায় মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। পবিত্র খুতবা [Kutbah] পাঠ করা হয়েছে, নামাজের জন্য আহ্বান (আযান) জানানো হচ্ছে এবং তা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা করার জন্য। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি তকবির ও স্তুতি নিবেদন করা হচ্ছে।" [Indian Islam by Dr. Titus, p-10] কাশিমের ভারত আক্রমণের মোটামুটি ৩০০ বছর পরে গজনীর সুলতান মাহমুদ পর পর ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি গুজরাটের সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে কোটি কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে যান। তাঁর নিজের ঐতিহাসিক আল উত্‌বি লিখেছেন —

"তিনি মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অধিকার করেছেন ....বহু নগর। কলুষিত হতভাগাদের [polluted wretches] খুন করেছেন এবং পৌত্তলিকদের হত্যা করে মুসলমানদের তুষ্ট করেছেন। 'স্বদেশে ফিরে এসে ইসলামের জন্য অর্জিত গৌরবের মূল্যায়ন করেছেন ..... তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, প্রতি বছর তিনি হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করবেন'।" [Indian Islam by Dr. Titus, p-11]

ভারত আক্রমণের ক্ষেত্রে মহম্মদ ঘোরিও একই ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনায় বিভোর ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক হাসান নিজামি লিখেছেন —

"তিনি তাঁর তরবারি দ্বারা হিন্দুস্থানকে ধর্মীয় অবিশ্বাসের নোংরামো এবং পাপ থেকে মুক্ত করেন; বহুদেবত্ববাদ ও মূর্তি পূজার মতো অপবিত্রতার কন্টক থেকে দেশকে মুক্ত করেন। তার রাজকীয় সাহসিকতা ও উৎসাহের কারণে একটি মন্দিরও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি।" [Ibid, p-11]

তৈমুর তাঁর স্মৃতি কথায় ভারত আক্রমণের কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"হিন্দুস্তান আক্রমণের ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা এবং মহম্মদের (তাঁর এবং তাঁর পরিবারের প্রতি খোদার আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হউক) নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে (ইসলামের) মহাসত্যে দীক্ষিত করা, বহুত্ববাদ ও অবিশ্বাসের অপবিত্রতা থেকে দেশটিকে মুক্ত করা এবং সব মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করা। এ কাজ করে খোদার কাছে আমরা গাজি ও মুজাহিদের স্বীকৃতি পাব এবং ইসলামের (faith) সহযোগী ও সৈনিক হিসাবে মান্যতা পাব।"

এরপর ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর কথা। তাবাকাত-ই-নাসিরির লেখা থেকে জানা যায়, মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি যখন বিহারের নুডিয়া (নদিয়া) অধিকার করেন তখন ঃ "বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য বিজয়ীদের হাতে এসেছিল। ওখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরাই

ছিলেন মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ। তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। সমস্ত শহরে ও দুর্গগুলিতে অনেক বই পাওয়া গেছে। কিন্তু কোনও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি। ফলে বইগুলির বিষয়বস্তু জানা যায়নি।'' এ বিষয়ে সমস্ত তথ্য একত্রিত করে ড. টিটাস তাঁর উপসংহারে বলেছেন —

''মন্দির ধ্বংস ও মূর্তি অপবিত্রকরণের ব্যাপারে অনেক তথ্য আমরা পেয়েছি। দেখা গেছে, মহম্মদ-বিন-কাশিম পরিকল্পিত ভাবে সিন্ধু প্রদেশ ধ্বংস করেছেন। কিন্তু মুলতানের একটি বিখ্যাত মন্দির তিনি ধ্বংস করেননি একমাত্র আর্থিক কারণে। কারণ ঐ বিখ্যাত মন্দিরে ভক্তরা বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ উপহার দিতেন। কিন্তু নিজের অর্থলোলুপতা চরিতার্থ করার জন্য মন্দিরটির ক্ষতি না করে বিগ্রহের গলায় এক টুকরো গোমাংস ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর বিদ্বেষকেই প্রকাশ করেছেন।

''ঐ মন্দিরে এক লক্ষ তীর্থ যাত্রীর মিলিত হওয়ার রীতি ছিল; এক হাজার ব্রাহ্মণ মন্দিরের সেবা ও ধনসম্পদ রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে থাকতেন শত শত গায়ক ও নৃত্যশিল্পী। মন্দিরের ভিতরে ছিল খসখসে পাথরের স্তম্ভসদৃশ বিখ্যাত লিঙ্গ। নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল মূল্যবান প্রস্তরখচিত ঝাড়বাতির আলোয় মণিমানিক্যখচিত এটি ছিল অপূর্ব দ্যুতিময়। মন্দিরের প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণরা সমবেত হয়ে বিদেশী নাস্তিকদের ব্যঙ্গ করে বলতেন যে, প্রভু সোমনাথ তাদের ধ্বংস করে দেবেন। বিদেশীরা এর সব কিছু অগ্রাহ্য করে দেওয়াল টপকে ভেতরে গিয়ে মন্দির আক্রমণ করল। সেবকরা আকুলভাবে দেবতার কাছে মিনতি জানালেন; কিন্তু পাথরের দেবতা নির্বাক হয়ে রইলেন। তাদের বিশ্বাসের খেসারত দিতে গিয়ে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু মৃত্যু বরণ করলেন। আর পবিত্র বিগ্রহটি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল সত্যিকার বিশ্বাসীরা (*মুসলমানরা*)। সবচেয়ে বড় আকারের পাথরটিকে ভেঙ্গে এর টুকরোগুলি বয়ে নিয়ে গিয়ে বিজয়ীর প্রাসাদের শোভা বাড়ানো হল। মন্দিরের দরজাগুলি গজনীতে নিয়ে গিয়ে বসানো হল এবং বিগ্রহচূর্ণকারীদের উপহার দেওয়া হল লক্ষ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের ধনসম্পদ।'' (লেনপুলের 'মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়া', পৃ- ২৬)

গজনির মামুদের এই কীর্তিকলাপ পবিত্র ঐতিহ্যে পরিণত হল। মাহমুদের উত্তরসূরীরা ঐতিহ্যটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করে গেছেন। ড. টিটাসের বক্তব্য অনুযায়ী ঃ ''গজনির মামুদের অন্যতম উৎসাহী উত্তরাধিকারী মহম্মদ ঘোরি আজমীঢ় দখল করার সময় বহু মন্দিরের স্তম্ভ ও ভিত্তি ধ্বংস করে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সেখানে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম আইন চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লি শহর ও শহর সংলগ্ন অঞ্চলকে মূর্তি ও মূর্তি উপাসকদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়। অদ্বিতীয় খোদার সেবকেরা ঈশ্বরের বিভিন্ন মূর্তিসম্বলিত মন্দিরগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিতকরেন।''

ভারতে পৌত্তলিকতা বিলুপ্তির চূড়ান্ত দায়িত্ব বর্তায় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের উপর। 'মা আথির-ই-আলমগিরি' গ্রন্থের লেখক হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ব্যাপারে ঔরঙ্গজেবের প্রচেষ্টার বিবরণ দেন এ ভাবে —

''১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে ঔরঙ্গজেব জানতে পারেন যে, থাট্টা, মুলতান এবং বিশেষত কাশীতে মূর্খ ব্রাহ্মণরা তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থহীন তুচ্ছ কিছু গ্রন্থ নিয়ে

শিক্ষা দিচ্ছেন এবং দূর দূরান্ত থেকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা সেখানে যাচ্ছেন ....। 'বিশ্বাসের (*ইসলামের*) কর্ণধার' বাদশাহ্ সমস্ত প্রাদেশিক শাসন-কর্তাকে এই মর্মে আদেশ দিলেন অবিশ্বাসীদের ঐ সব বিদ্যালয় ও মন্দির যেন কঠোর হাতে ধ্বংস করা হয়। ফলে ঐ শাসনকর্তারা সমষ্টিগতভাবে পৌত্তলিকতার শিক্ষা ও আচরণকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করে দেন। ..... পরে মহান ধর্মরক্ষককে (His Religious Majesty) জানানো হয় যে, সরকারী কর্মচারীরা কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছেন।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-২২)

"মন্দির ধ্বংসের কাজে কুতুবুদ্দিন ছিলেন মাহমুদের প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে তিনি অতি অবশ্যই বলপ্রয়োগকে হাতিয়ার (incentive) হিসেবে ব্যবহার করেন। একটি নমুনা হল ঃ ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি কৈল (আলিগড়) অভিযান করেন, তখন দুর্গরক্ষাকারী সৈনিকদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও চতুর ছিল তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অন্যান্য সকলকে হত্যা করা হয়।

"বলপ্রয়োগে ধর্ম পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে চরমতম ব্যবস্থা গ্রহণের আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮) এরকম একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী হল ঃ 'এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তিনি তাঁর বাড়িতে মূর্তিপূজা করেন এবং এমনকি গণ্যমান্য মুসলমান রমণীরাও এর ফলে অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছেন। বিচারক, চিকিৎসক, বয়োজ্যেষ্ঠ ও আইনজীবীদের দরবারে তাঁকে বিচারের জন্য পাঠানো হল। তাঁরা সবাই এক বাক্যে বললেন, এক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রাহ্মণকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, অথবা তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে। কোনটি সত্য ধর্ম ব্রাহ্মণকে তা বুঝিয়ে দেওয়া হল এবং সঠিক পথ কি তাও বোঝানো হল। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ফলশ্রুতি হিসাবে সুলতানের আদেশে তাকে পুড়িয়ে মারা হল। বর্ণনাকারী বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করছেন — 'লক্ষ্যণীয়, সুলতান আইনের প্রতি এতটা নিষ্ঠাবান ও শ্রদ্ধাশীল যে তিনি তাঁর নির্দেশ থেকে এক চুলও সরে এলেন না'।"

১০১৭ খ্রীস্টাব্দে মাহমুদ যখন কনৌজ অধিকার করেন, তখন তিনি এত অর্থ সংগ্রহ করেন যে, যাঁরা ঐ বিপুল অর্থ গণনা করেছিলেন, তাঁদের আঙুলগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ১০১৯ খৃস্টাব্দের অভিযানের পরে গজনি ও মধ্য এশিয়াতে কিভাবে ভারতীয়দের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল, সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

" বন্দীদের সংখ্যা কত বেশি তা বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে যে, মাত্র দুই থেকে দশ দিরহাম মূল্যে একজন বন্দীকে বিক্রি করা হত। পরে এদের গজনিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দূর দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের কিনতে আসতেন। .... সুদর্শন কিংবা কুশ্রী, গরীব কিংবা ধনী সবাইকে একই শ্রেণির দাস হিসাবে গণ্য করা হত।

"১২০২ খ্রিস্টাব্দে যখন কুতুবুউদ্দিন কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করেন তখন মন্দির-গুলিকে মসজিদে পরিণত করা হয়, পৌত্তলিকতার নামটি পর্যন্ত নির্মূল করা হয় এবং

পঞ্চাশ হাজার হিন্দুকে দাসে রূপান্তরিত করা হয়। এবং হিন্দুদের উপস্থিতিতে সমতল এলাকা পিচের ন্যায় কালো হয়ে যায়।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-২৬)

পবিত্র যুদ্ধে পরাজিত হিন্দুদের অদৃষ্ট ছিল দাস জীবনযাপন। কিন্তু যুদ্ধবিহীন স্বাভাবিক অবস্থায়ও মুসলমান আক্রমণকারীদের গৃহীত ব্যবস্থা অনুসারে হিন্দুদের মর্যাদাহানির ধারাবাহিকতা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে, হিন্দুরা কোনও কোনও অঞ্চলে সুলতানকে বিব্রত করছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁদের উপর এমন ভাবে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপালেন যাতে তাঁরা বিদ্রোহ করতে না পারেন। এই সব তথ্যাদি আমরা নিয়েছি ভারত-রত্ন ড. বি. আর. আম্বেদকরের 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া' (স. গ্র.-১) থেকে। প্রয়োজনে যে কেউ এই তথ্যাবলীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন।

মহানবী হযরত মহম্মদ যতগুলো সৃষ্টিছাড়া বিধান সৃষ্টি করেছেন তার একটি হল পবিত্রতা-অপবিত্রতার সংজ্ঞা নির্ধারণ। তিনি বলেছেন, মুসলমান মাত্রেই পবিত্র। অমুসলমান মাত্রেই অপবিত্র। একমাত্র ব্যতিক্রম যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর কুমারী মা মেরী। প্রতিমা পূজারীরা স্থায়ীভাবে অপবিত্র। এই অপবিত্রতা থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ 'পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা। পরবর্তীকালে নবীজীর অনুগামী মোল্লা-মৌলভীদের বড় একটি অংশ বিধর্মীকে পবিত্র বানাবার একটি অস্থায়ী পথ আবিষ্কার করেছে। পথটি হচ্ছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক বিধর্মীকে জোর করে মুসলমানের প্রস্রাব খাইয়ে দেওয়া। মাঝে মধ্যেই এরূপ ঘটনা শোনা যায়। এখানে আমরা বিশ্বাসযোগ্য এবং সন্দেহাতীত তিনটি ঘটনা উল্লেখ করছি। প্রথম ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের ড. নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'-তে। ১৯৭১-এ যশোর ক্যান্টনমেন্টে বন্দী একটি মেয়ের মুখে প্রস্রাব করে দিয়েছে এক খান সেনা। উল্লেখ্য শেখ মুজিবের বিশেষ অনুরোধে ম্যাডাম নীলিমা ইব্রাহিম '৭১-এর অত্যাচারিতা মহিলাদের নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি বাংলাদেশে, ২০০১-এ। দেবলাল নামে একজন ডাক্তার খৎনা দিয়ে মুসলমান হতে অস্বীকার করলে তাকে মুসলমানের প্রস্রাব খাইয়ে দেওয়া হয়। আগেই ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার (পশ্চিমবঙ্গ) দেগঙ্গা এলাকার কার্তিকপুরে শনি-কালী মন্দিরে ২০১০-এর ৭ সেপ্টেম্বর। ঐ মন্দিরের প্রতিমা ভেঙে তার উপর প্রস্রাব করে দিয়েছে পবিত্র ইসলামের অনুগামী একদল মুসলমান।

আশা করি, ১৯৪৬ থেকে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের মূল কারণ ঠিক ঠিক ভাবে তুলে ধরতে পেরেছি।

পরিশেষে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী এবং সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, আপনারা বিচার করে দেখুন, বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসরত অমুসলমান, বিশেষ ভাবে বৌদ্ধ এবং হিন্দু, পৃথিবীর মধ্যে বিপন্নতম মানুষ কিনা। আপনারা বিচার করে বলুন, এ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা ভারত সরকারের কাছ থেকে সুবিচার পেয়েছেন কিনা। আপনারা ভেবে দেখুন, ২০০৩-এর

নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের ফলে যে সব বিপন্ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তাদের নিজেদের এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কি হবে। আপনারা ভাবুন, ভারত সরকার যদি বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধদের বাঁচাতে না চান, তাহলে আগমী ১০/১৫ বছরের মধ্যে তারা মুসলমান হয়ে যেতে বাধ্য হবেন কিনা। আপনারা চিন্তা করে বলুন, এক্ষুণি ভারতের 'দলবদ্ধ গুণ্ডামী' তত্ত্বে বিশ্বাসী মৌলবাদীদের কড়া হাতে দমন করা না হলে আবার গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দির পার্লামেন্ট আবার আক্রান্ত হবে কিনা; একের পর এক দেগঙ্গা সৃষ্টি হতে থাকবে কিনা। আসুন, ভারতের সংহতি সুদৃঢ় করার জন্য এবং ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য নিম্নোক্ত দাবি সমূহ তুলে ধরি।

১) ২০০৩-এর ডিসেম্বর মাসে পাশ হয়ে যাওয়া নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনে এমন একটি উপধারা যুক্ত করা হোক যাতে বর্তমান বাংলাদেশ থেকে যে সকল হিন্দু ও বৌদ্ধ ইতিমধ্যেই ভারতে চলে এসেছেন তাঁদের ভারতের নাগরিকত্ব পেতে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে এখনও যে সব হিন্দু-বৌদ্ধ চলে আসতে চান তারা যেন আসতে পারেন এবং সহজ পদ্ধতিতে ভারতের নাগরিকত্ব পেতে পারেন।

২) আমাদের সংবিধানের ৭ম তফসিলভুক্ত ৩য় সূচীর ২৭ নং ধারা[১] অনুসারে তাঁদেরকে যথাযথ পুনর্বাসন দেওয়া হোক।

৩) হিন্দুদের মধ্যে বিদ্যমান যাবতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, শাস্ত্রীয় বৈষম্য দূর করার জন্য কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

৪) একটি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করা হোক। দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসীকে কোনো প্রকারেই সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা চলবে না। আমরা যেন ড. আম্বেদকরের কোটি টাকা মূল্যের এই বাণী ভুলে না যাই, "একটি নিরাপদ সেনাবাহিনী নিরাপদ সীমারেখার চেয়ে অনেক ভাল।"

৫) সংবিধানের চতুর্থ ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতি সমূহের ৪৪ (চুয়াল্লিশ) নং ধারা[২] অনুসারে ভারতের সকল নাগরিকের জন্য একই প্রকার দেওয়ানী বিধি চালু করা হোক। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটির বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া হোক। দেশপ্রেম, পরধর্ম ও পরমত সহিষ্ণুতাকে বাধ্যতামূলক করা হোক।

৬) ধর্মের ভিত্তিতে নয়, দেশপ্রেমের ভিত্তিতে একজন নাগরিক আর একজন নাগরিকের ভাই, এই নীতিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৭) ধর্ম নয়, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে তাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। সংরক্ষণ বা যে কোনো প্রকার অনুদানের মাপকাঠী হবে প্রাপকের আর্থিক অবস্থা।

---

1) " Relief and rehabilitation of persons displaced from their original place of residence by reason of the setting up of the Dominions of India and Pakistan." [Const. of India, 7th Schedule, List III – Concurrent List.]

2) " The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India." [The Constitution of India, Part IV–Directive Principles of State Policy, Article – 44.]

পরিশিষ্ট-১

।। সহায়ক গ্রন্থাবলী।।

০১) Dr. Babasaheb B.R. Ambedkar Writings and Speeches, Vols. 3 & 8, Govt. of Maharastra Pub., 1990, Price Rs. 40/

০২) আনন্দ সঙ্গী ঃ আনন্দ পাব. প্রা. লিমিটেড, কোল - ৯ (১৯৭৫), মূল্য- ৩০ টাকা

০৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ (১৯৯৩) এম. এ. ওয়াজেদ ০৪) বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা ঃ অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস (২০০৯), আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত ও সেলিম রাজা।

০৫) গান্ধী মানস। অনুবাদ - মহাশ্বেতা দেবী। ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, নয়া দিল্লী - ১৬

০৬) শ্রীচিত্তরঞ্জন সূতার সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক মহাসঙ্কট'।

০৭) প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ - অমলেন্দু দে। প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩। পরিবেশক ঃ চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ। কোলকাতা - ৭৩। মূল্য- ৩০ টাকা।

০৮) পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক - অমলেন্দু দে। পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক, কোলকাতা - ১৩ (১৯৮৯), মূল্য - ১৮ টাকা।

০৯) বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় সং-১৯৮২), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

১০) হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে - সালাম আজাদ। (বাং - ১৪০৫)

১১) দেশ বিভাগ — পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী। ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ পাব. প্রা. লিমিটেড। জানুয়ারী, ১৯৯৩। ৫০ টাকা।

১২) তরজমা-এ-কুরআন মজীদ, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কোলকাতা-১৩, তৃতীয় প্রকাশ -১৯৯০। মূল্য - ১২০ টাকা।

১৩) 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এবং আমার রাষ্ট্রদ্রোহিতা', শাহরিয়ার কবির, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

১৪) '৭১-এর নারী নির্যাতন, ১৯৯১, সম্পাদনা ঃ কাজী হারুনুর রশীদ, ঢাকা।

১৫) রাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কঙ্কর সিংহ। অনন্যা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মূল্য - ১২০ টাকা।

১৬) জেলে ৩০ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম - শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। ৪র্থ সং ('৮১)। মূল্য - ৩০ টাকা।

১৭) মুসলিম রাজনীতি এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ পত্র (২০০৮), দেবজ্যোতি রায়।

১৮) আমি বীরাঙ্গনা বলছি - ড. নীলিমা ইব্রাহিম। জাগৃতি প্রকাশনী (১৯৯৮), ৬, নীলক্ষেত রোড, ঢাকা - ১০০০। মূল্য - ১০০ টাকা।

১৯) বঙ্গবন্ধু হত্যা ঃ ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস্। অধ্যাপক আবু সায়িদ। ৪র্থ সং (১৯৯৬), জ্ঞানকোষ, ৫,৬,৭, সোবহান বাগ, ঢাকা। মূল্য - ১২০ টাকা।

২০) এথনিং ক্লিনসিং, সালাম আজাদ, রত্না প্রকাশন, কলা-৭৫। মূল্য-৭০ টাকা।

২১) The Meaning of the Glorious Koran – M.M.Pickthal. Taj Company, Delhi – 110 006, 1991. Price Rs. 25.00

২২) The Meanings of the Illustrious Qur'an (1997) by Abdullah Yusuf Ali. Farid Book Depot Private Ltd., Jama Masjid, Delhi-6.
২৩) Sahih Al-Bukhari, Vol. IV, by Dr. Muhammad Muhasin Khan, Islamic University, Medina Al-Munawara, Pub : KITAB BHAVAN, N.D. – 25th Revised Ed.
২৪) Sahih Muslim, Vols. I-IV, Trstd. By Abdullah Siddiqi, Pub. – Do –
২৫) The Transfer of Power in India – V. P. Menon. Pub : Orient Longmans, 17, C. R. Avenue, Cal-13.
২৬) The Transfer of Power, Published by Her Majesty's Stationary Office, London (Vols. 8-11)
২৭) Stern Reckoning – G. D. Khosla, Oxford University Press, N.D.– 110 001.
২৮) India Wins Freedom – Moulana Abul Kalam Azad, Orient Longmans (1959).
২৯) India Partitioned and the Minorities of Pakistan – Provash Chandra Lahiri, Published by Writers' Forum Pvt., Cal-1.(1964) Price Rs. 5.50.
৩০) Jawharlal Nehru's Speeches (1949 -1953), Govt. of India Pub., 1954.
৩১) Minority Politics in Bangladesh – Md. Ghulam Kabir, Vikas Pub. Pvt. Ltd., Ghaziabad, U.P.
৩২) Freedom at Midnight, Larry Collins and Dominique Lapierre. Pub : Do.
৩৩) The Life of Mahomet by Sir Willium Muir, 1st Indian Reprint: 1992, Voice of India, New Delhi.
৩৪) Basic Facts About the United Nations, New York, 1992.
৩৫) The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vols. 51,71, 86 & 89, Pub : The Govt. of India, 1982. Price Rs, 20/- each
৩৬) My Days With Gandhiji – N. K. Bose, 1953, Price Rs. 7.50
৩৭) Dr. Ambedkar's Role in National Movement, D.R. Jatava, Buddha Sahitya Sammelan, N.D. –5. Price Rs. 25/-
৩৮) India from Curzon to Nehru & After, Durga Das, Rupa & Co., 15, Bankim Chatterjee St., Cal-12
৩৯) The History of India As Told by Its Own Historians by Elliot & Dowson, 8 Volumes, Low Price Publications, Delhi-110052
৪০) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' ও 'সি.আই.এ', (১৯৯০), মাসুদুল হক, ঢাকা।
৪১) শ্বেত-পত্র: বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন (২০০৫)। সম্পাদনা- শাহ্‌রিয়ার কবির। প্রকাশনা- একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা।

পরিশিষ্ট - ২

পাকিস্তানে আটকে পড়া সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতি

গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি


(১৮৬৯-১৯৪৮)

1. "হিন্দু এবং শিখ যাঁরা আটকে আছেন তাঁরা যদি আর (ওখানে) থাকতে ইচ্ছুক না হন তাহলে সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে এখানে চলে আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রথম কাজ হবে তাঁদের জীবিকার জন্য কর্ম-সংস্থান করা যাতে তাঁদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।"
[From: The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. 89. Page-246, The Publication Division, Govt. of India.]

পণ্ডিত নেহেরুর প্রতিশ্রুতি


(১৮৮৯-১৯৬৪)

2. "রাজনৈতিক সীমারেখা যাঁদেরকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছেন না, আমরা সেই ভাই-বোনদের কথাও স্মরণ করছি। ঘটনা যা-ই ঘটুক তাঁরা আমাদের এবং আমাদেরই থাকবেন। আমরা অবশ্যই তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হব।"
[From: Independence and After, (1949), page – 5, The Üublication Division, Govt. of India.]

3. "পুনর্বাসনের কাজে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতেই হবে। এর কারণ শুধু এই নয় যে, এটা আমাদের করণীয় কাজ, বরং তাঁদেরকে কর্মবিহীন এবং দুর্ভোগরত অবস্থায় ফেলে রাখা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। তাই আমাদেরকে এ কাজ করতে হবে।" [Ibid., p-5]

4. "আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, পূর্ববঙ্গের হিন্দু সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীন অনুভব করছেন এবং এর জন্যই ওখানে থাকতে পারছেন না। যাঁরা এখানে চলে আসতে চান, যদি তাঁরা ওখানে থাকতেও চান, তাঁরা জানেন না যে, কতদিন ওখানে থাকতে পারবেন।" [Ibid., p-291]

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রতিশ্রুতি



(১৮৮৪-১৯৬৩)

5. "যে সকল বাস্তুচ্যুত মানুষ আর্থিক অনটনের মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছেন এবং এখনও করছেন আমরা তাঁদের সকলকে পুনর্বাসন দেবার জন্য এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্বিগ্ন।"
[Speeches of Dr. Rajendra Prasad. Vol. 1, p-2.
The Publication Division, Govt. Of India.]

সর্দার প্যাটেলের প্রতিশ্রুতি



(১৮৭৫-১৯৫০)

6. "যাঁদের সঙ্গে আমাদের রক্ত-মাংসের সম্পর্ক, যাঁরা একত্রে আমাদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন, যেহেতু তাঁরা এখন একটি সীমারেখার ওপারে, সেই জন্যই হঠাৎ তাঁরা আমাদের কাছে বিদেশী হয়ে যেতে পারেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্যক্তিরা আফ্রিকার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা এখনও তাঁদের সাহায্য করার চেষ্টা করি। তাঁদের যদি আমাদের কাছে দাবি করার অধিকার থাকে, তাহলে বাংলার অপর অংশে যাঁরা আটকে আছেন তাঁদেরও সুনিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে দাবি করার অধিকার আছে।" [Speeches of Sarder Patel. p-121, The Publication Division, Govt. Of India.]

এ. আই. সি. সি-র ১৫.১১.'৪৭ তারিখের সিদ্ধান্ত

7. "যাঁরা এখনও তাঁদের বাড়ীঘর ত্যাগ করেননি (অর্থাৎ এখনও ভারতে আসেননি) তাঁদেরকে সেখানে থাকার জন্য উৎসাহিত করা উচিৎ, যদি না তারা নিজেরাই সেখান থেকে চলে আসতে চান। কিন্তু যখনই তাঁরা আসতে চাইবেন, তখনই তাঁদের চলে আসার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে। তাঁদেরকে অন্যের জায়গায় প্রবেশকারী (Interlopers) বলে এবং অপরের দয়ার উপর নির্ভরশীল বলে গণ্য করা যাবে না। যাঁরা অপর যে কোন (ভারতীয়) নাগরিকের মতই অধিকার ভোগ করবেন এবং দায়িত্ব পালন করবেন।"[From: The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. 90. Page-539,The Publication Division, Govt. of India.]

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা একটি খোলা চিঠি

(পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ।
e-mail: info@pmo.gov.bd)

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী,

বিগত ৫০ বছর ধরে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের মৌলবাদী অপশক্তির পাশবিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন কয়েক কোটি হিন্দু এবং অন্যান্য অমুসলমান। তাদের মধ্যে দেড় কোটির বেশি মানুষ ভারতে নাগরিকত্ব কিংবা পুনর্বাসন না পেয়ে এক দুর্বিসহ অবস্থায় বসবাস করছেন। তাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। এই চিঠির স্বাক্ষরকারী আমরা সকলেই পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছি।

১৯৭৫-এর পরে বাংলাদেশের প্রাক্তন দুই রাষ্ট্রপতির কার্যকালের সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণের চেয়েও প্রিয় ১৯৭২-এর বাংলাদেশ সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী অযৌক্তিক ও অমানবিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আপনি এবং আপনার দল এর বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ২০০৯-এ ক্ষমতায় ফিরে এসে ঐ অযৌক্তিক বিধান বিলুপ্ত করে ১৯৭২-এর পবিত্র সংবিধান ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গত ৩০.৬.২০১১ তারিখে যেভাবে সংবিধান সংশোধিত হল তা দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি। শুধু আমরা নই, আপনার নিজের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রপ্রিয় সুশীল সমাজ অবাক হয়ে গেছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং আপনার মুখের দিকে চেয়ে ধর্মান্ধ মোল্লাদের শত অত্যাচার সহ্য করেও মাটি কামড়ে পড়ে আছেন তাদের কাছে এ সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের সমতুল্য। তাদের ক্ষোভ এবং বিক্ষোভ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। জনাব কবির চৌধুরী, জনাব মুনতাসির মামুন, জনাব আবদুল গাফফার চোধুরী, জনাব শাহরিয়ার কবির, শ্রী সি. আর. দত্ত, শ্রীরাণা দাস এবং প্রবাসী বাঙালিরা যে ভাষায় এর প্রতিবাদ করছেন আন্দোলনের ইতিহাসে তা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। দুনিয়ার গণতন্ত্রপ্রিয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেছেন আপনার সিদ্ধান্ত দেখে।

আপনি একদিকে বাহাত্তরের সংবিধানের চার স্তম্ভ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ ফিরিয়ে এনেছেন এবং সেই সঙ্গে 'ইসলামকে' রাষ্ট্রধর্ম করেছেন, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' শব্দত্রয় যুক্ত করেছেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ অবারিত করেছেন। এই ধরনের পরস্পরবিরোধী মতবাদের সংমিশ্রণ পৃথিবীর কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই। ১৯৪০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মুসলিম লীগ লক্ষ বার বলেছে, কোরান ও হাদিস মুসলমানদের প্রাণের চেয়েও

। এই কোরান-হাদিস যারা মেনে চলবে তারা হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে না। এর নাম দ্বিজাতি তত্ত্ব। আওয়ামী মুসলিম লীগ 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে য়ামী লীগ' নামকরণ করে যে বিপ্লবী পদক্ষেপ নিয়েছিল তার ফলেই ১৯৫৪-র চনে যুক্তফ্রন্টের ভূমিধ্বস বিজয় হয়েছিল। ঐ জয়ের পুণ্য লগ্নে পূর্ববঙ্গের মাটিতে করা হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ। আর এই ঐতিহাসিক কাজে অমূল্য অবদান ছিলেন আপনার পিতা আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ান।

আইয়ুব খানের অপশাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু যে কয়জন বিশ্বাসভাজন বন্ধু নিয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলার রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করে গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। হিন্দু বন্ধুদের শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছিলেন বরিশালের কৃতি সন্তান শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার। বাংলাদেশের যুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের কথা সম্ভবত শেখ সাহেবের চেয়েও আপনি জানেন। শেখ সাহেব এবং চিত্তবাবুর শুভ চিন্তার মধ্যে কোথাও রাষ্ট্রধর্ম বা ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের ছিঁটেফোঁটাও ছিল না। 'বিসমিল্লাহির রহমানির ম'-এর অর্থ যত ভালই হোক আপনার পিতা বা তাঁর বন্ধুরা এই শব্দত্রয়কে ধানে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবেননি কখনো। ১৯৭১-এর মুক্তি সংগ্রামে হিন্দুপ্রধান ধর্মনিরপেক্ষ ভারত অর্থ, অস্ত্র এবং তাঁর বীর সন্তানদের রক্ত দিয়ে আওয়ামী কে সাহায্য করেছিল মুসলিম দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতন্ত্রপ্রিয় ন শেখ সাহেবের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য; ইসলামের নামে রাজনীতি করা গোলাম আযম, আমিনী, নিযামী কিংবা সাঈদীদের ধর্মান্ধতাকে পরিপুষ্ট করার নয়। চিত্তবাবু অজস্রবার আমাদের কাছে বলেছেন, 'এই মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বে শেখ বুর রহমান একমাত্র মুসলিম রাজনীতিবিদ যিনি ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে াদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিলোপ সাধনে বদ্ধপরিকর।'

ভারত সেদিন ঐ ভাবে সাহায্য করেই তার কর্তব্য শেষ করেনি। বাংলাদেশের রপেক্ষ ভাবমূর্তি সমগ্র বিশ্বে যাতে অক্ষুন্ন থাকে তার জন্য বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তি দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে এ দেশে এলে কোনো বাঙালিকে ভারতের নাগরিকত্ব য়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। কারণ আপনি তাদের য়ে নেবেন না।

হিন্দুপ্রধান ভারত ধর্মনিরপেক্ষ বলেই বিপদের সময় আপনি আশ্রয় পেয়েছিলেন ন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ভারত আপনাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে এখনও করে যাচ্ছে। প্রতিবেশি কোনো দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং তারপরে র্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য এমন ত্যাগ বিশ্বের ইতিহাসে নি খুঁজে পাবেন না।

সংশোধিত সংবিধানে বলা হয়েছে, ইসলামের বাইরে অন্যান্য ধর্মের মর্যাদা রক্ষা হবে। সম্ভবত আপনারা ইসলামের মধ্যে যে ন্যায় বিচারের কথা আছে বলে

প্রচার করছেন, তার সাহায্যে এই মানবিক কাজ করবেন। ধর্মান্ধরা যাতে ইসলামের অপব্যবহার করতে না পারে তার জন্য 'সেফগার্ড' রাখা হয়েছে। এই সেফ-গার্ডের বিন্দুমাত্র মূল্য আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ পৃথিবীর কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এর বাস্তবায়ন নেই। এর ফলে বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়া ছাড়া অন্য সব মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আমরা যদি ইতিহাসের পাতা খুলে দেখি তাহলে দেখতে পাব ১৯৪৮-এর ৭ মার্চ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মি. লিয়াকত আলি খান নব-গঠিত পবিত্রভূমির অনাগত সংবিধানের রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন এই ভাষায় —

"ইসলামে বর্ণিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হইবে।" (Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed) এই প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবার পরপরই তা কার্যকরী হয়েছিল। ১৯৫৬ এবং ১৯৬২-এর সংবিধানের প্রস্তাবনায় এই বক্তব্য হুবহু রাখা হয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এক দিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি। অত্যাচার চরমে ওঠে ১৯৫০-এ। পাকিস্তানের সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় ১৯৫৬-তে। দেশের নাম হয় 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান'। এবং সেখানে সংখ্যালঘুদের জন্য যথাযথ সেফ-গার্ডের ব্যবস্থা ছিল। (Wherein adequate provision shall be made for the minorities to [freely] profess and practice their religions and develop their cultures.) তা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুরা আগের মতোই অত্যাচারিত হয়েছেন। এরই সঙ্গে চলেছে বাঙালিদের ওপর শোষণ। ১৯৬২-র সংবিধানেও সংখ্যালঘুদের জন্য অনুরূপ সেফ-গার্ডের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এবং তার সঙ্গে বাংলা শোষণ বেড়েই চলেছে। ১৯৬৪-তে মি: আইয়ুব খানের সরাসরি প্ররোচনায় এক তরফা হিন্দু নিধন হয়েছে। এই সব রূঢ় সত্য পর্যালোচনা করেই বঙ্গবন্ধু ঠিক করেছিলেন যে, অনাগত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ করা হবে। ধর্ম ব্যক্তি জীবনের আচার আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বাস্তবেও তা ঘটেছিল। এর ফলে সংখ্যালঘুরা কয়েক বছর ধরে বিছুটা ভাল অবস্থায় ছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছিল।

ইসলামের বিচারে বড় মাপের তিনটি অপরাধ ছাড়া কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে খুন করতে পারে না। কিন্তু ধর্মান্ধরা ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু সহ আপনাদের পরিবারের অন্য সবাইকে খুন করেছে। খুন করেছে আপনাদের অনেক আত্মীয় এবং জাতীয় নেতাদের। বিদেশে থাকার কারণে আপনি এবং আপনার বোন বেঁচে যান। এরপর তারা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষণা করে। ইসলামের নাম নিতে নিতেই একাধিকবার আপনাকে খুনের চেষ্টা করেছে। সংখ্যালঘু এবং অনেক ক্ষেত্রে আপনার দলের সদস্যদের উপরও অত্যাচার চালাচ্ছে। ১৯৯২-এ ভোলায় এবং ২০০১-এ সমগ্র বাংলাদেশে তারা দু-দু'টি 'কলঙ্কময় একাত্তর' সৃষ্টি করেছে।

কয়েক লক্ষ সংখ্যালঘু চলে আসেন ভারতে। আওয়ামী লীগ সমর্থক অনেক মুসলমানও আসেন। তারা ফিরে যান। কিন্তু সংখ্যালঘুরা অনেকেই ফিরে যেতে ভরসা পাননি। এদিকে ভারত সরকার আপনাদের সুনাম রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পরে এখানে চলে আসা বাংলাদেশীদের নাগরিকত্ব না দেবার নীতিতে অটল থাকেন। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে ১৯৭১-এর আগে পরে আসা দেড় কোটির বেশি হিন্দু আজও এখানে রেল লাইনের ধারে, পথের পাশে, ঝিলের ধারে প্রায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন। অথচ এদের মা-বাবা-দাদুর প্রাণ এবং ইজ্জতের বিনিময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছিল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিপন্ন, সেখানকার ১ কোটি বাঙালি ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। আমার পক্ষে এদের ভার বহন করা সম্ভব নয়।

ম্যাডাম, ঐ ১ কোটি বাঙালির মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ লক্ষ ৪১ হাজার। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল ৯৪ লক্ষ ৫৯ হাজার। ১৯৭১-এ পাক বাহিনী এবং তাদের বাঙালি দোসর রাজাকার, আলবদরেরা যত মানুষ খুন করেছে, হিসেব করলে দেখা যাবে তাদের অধিকাংশ অমুসলমান। সুতরাং এ কথা বললে ভুল বলা হবে না যে, বাঙালি হিন্দু পুরুষ-মহিলার রক্ত এবং ইজ্জতের বিনিময় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তাদের বংশধর এখনো ওখানে যারা আছেন তাদের উপর আপনি কার্যত ইসলামী শাসন চাপিয়ে দিলেন, যার ফলে ১ কোটি ৬০ লক্ষ অমুসলমান (প্রধানত হিন্দু) কার্যত তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হলেন। পৃথিবীর মধ্যে তারাই এখন বিপন্নতম জনগোষ্ঠী। জানি না, কোথায় লুকিয়ে আছে এর মূল রহস্য। এই কাজের সমালোচকদের আপনি বলেছেন, জনগণের অনুভূতির কারণেই এ সব করছেন আপনি। না, ম্যাডাম, যুক্তির কষ্ঠি পাথরে আপনার এ দাবি টিকবে না। ইতিহাসে আপনি মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণকারী হিসেবেই চিহ্নিত হবেন।

আপনার দেশে আজ মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ৫ লক্ষের বেশি। এই সব মসজিদ ও মাদ্রাসার ইমাম ও শিক্ষক এবং বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে প্রতিমা পূজারী হিন্দুদের অপবিত্র বলছে (কোরান-৯/২৮), পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব বলছে (কো-৮/৫৫), কাফের বলছে (কো-৫/৪৪) এবং আমাদেরকে ইসলাম, নবীজী এবং খোদার শত্রু বলা হচ্ছে কোরানের ২/৯৮ নং আয়াত অনুসারে। এরূপ অসংখ্য আয়াত আছে কোরানে। বিভিন্ন সময় (বিশেষভাবে ১৯৬৫ থেকে) আপনার পিতা তাঁর হিন্দু সহকর্মীদের বলেছিলেন, কোরানের এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। আপনারা আমার উপর বিশ্বাস রাখুন, স্বাধীন বাংলাদেশে আমি কোরানের সঠিক ব্যাখ্যা প্রচার করব। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ঢাকায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সর্বত্র উপরোক্ত ব্যাখ্যাই চলছে।

চরম ইসলামপন্থী মি. আইয়ুব খানের হাতে তৈরী 'শত্রু সম্পত্তি আইন-১৯৬৫'-এর মূল বক্তব্য আপনি বহাল রাখলেন গত ২৯.১১.২০১১ তারিখে পাশ হওয়া নতুন

আইনে। এই আইনে ভাষার মারপ্যাঁচে আপনি বুঝিয়ে দিলেন, পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত হিন্দুরা কার্যত আপনাদের শত্রু। শুধু তা-ই নয়, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং জ্যোতি বসু সহ লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে এমনকি ১৯৩৪-এ ব্রিটিশদের ফাঁসি কাষ্ঠে নিহত মাস্টারদা সূর্য সেনকেও শত্রু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের যে সব মুসলমান বিদেশে স্থায়ীভাবে বা বছরের পর বছর ধরে বসবাস করছেন, তারা কিন্তু আপনাদের শত্রু নন। তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হয়নি এবং হবেও না। তাহলে আমরা কি বলতে পারি না যে, শত্রু-মিত্রের এই সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় কোরানের ২/৯৮ আয়াত অনুসারে? আপনার উপদেষ্টারা ঠিক সেই কাজটিই করেছেন। ১৯৪৭, ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৯২, ২০০১ এবং অন্যান্য সময় সাম্প্রদায়িক সরকারের সরাসরি মদতে যাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে, যাদের ধন-মান-সম্পদ এবং ইজ্জতের বিনিময় ১৯৭১-এ দেশের স্বাধীনতা এসেছে, বিরোধী দলে থেকে আপনারা যাদের বিন্দুমাত্র সুরক্ষা দিতে পারেননি (বরং আপনারাও ভারতে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছেন), আজ তারা আপনাদের **শত্রু। পক্ষান্তরে** যে সব বাঙালি মুসলমান (সৎ-অসৎ-চোর-ডাকাত-নারী ধর্ষণকারী) বছরের পর বছর বিদেশে বসবাস করছেন, তারা আপনাদের মিত্র। এর নাম তো ইসলামী ন্যায় বিচার? আপনি সেই ন্যায় বিচারের আওতায় দেশটিকে নিয়ে এলেন।

এমতাবস্থায় আমাদের অনুরোধ, ন্যায়নীতি ও মানবিকতার কারণেই অনতিবিলম্বে আপনার পিতার স্বপ্নসৌধ '৭২-এর পবিত্র সংবিধান অবিকৃত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন। রাষ্ট্রধর্ম এবং বিসমিল্লাহ পরিহার করুন, পরিহার করুন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ। আপনার দেশের দেড় কোটি সংখ্যালঘু বাঁচার পথ খুঁজে পাবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে আপনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বতর হবে। সত্ত্বর পত্রোত্তর কামনা করি।

ধন্যবাদ সহ—

শ্রীদেবজ্যোতি রায়। (ফোন- ৯৮৩০৯৯৬৫৬৬), সাধারণ সম্পাদক, ড. বি. আর. আম্বেদকর স্টাডি সার্কেল; শ্রীস্বপনকুমার দাস (৯২৩১৪২৮১৯৪), আহ্বায়ক, ভারতীয় মুক্ত সমাজ, কলকাতা-৮৩; ডা. হরিপদ সিকদার (ফোন-৯৯০৩৩৫৯৭১৬); অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় (৯৮৩৬৬২৭০২৮), জাজেস্ কোর্ট, বারাসাত; শ্রীসুজিতকুমার সিকদার, ৯৪৩৩৫৪০৯০৭), সহকারী সাধারণ সম্পাদক, অল ইণ্ডিয়া রিফিউজী ফ্রন্ট; শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস, মানবাধিকার কর্মী, কলকাতা-৭৫, ফোন-৯৮৩০৩৩৩৩৯৪; শ্রীমাণিকলাল রায়, মানবাধিকার কর্মী, বারাসাত, ফোন-০৯৮০৪৭৩৩৪৪৩; শ্রীচঞ্চল দেবনাথ (ফোন-৯৮৩৬২৬৮১৪৩), সম্পাদক, প. ব. ভাগবত সমাজ, বারাসাত, কল-১২৪।

বি. দ্র. গত ২৯.১১.২০১১ তারিখে শত্রু-সম্পত্তি আইনের দোহাই দিয়ে গ্রাস করা সম্পত্তি হিন্দুদের/সংখ্যালঘুদের ফিরিয়ে দেবার নাম করে একটি আইন পাশ হয়েছে। এই কারণে মূল চিঠিটির একটুখানি পরিবর্তন করা হল।

পরিশিষ্ট - ৪

নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন - ২০০৩
(বিশেষ বিশেষ অংশ)
THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2003
(6 of 2004)

[7th January, 2004]

An Act further to amend the Citizenship Act, 1955.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement. –

(1) This Act may be called the Citizenship (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provisions to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the Government of that provision.

2. Amendment of section 2.- (1) In section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) (herein after referred to as the principal Act), in sub-section (1), —

(i) for clauses (b) and (c) and the proviso to clause (c), the following clause shall be substituted, namely :-

(b) "illegal migrant" means a foreigner who has entered into India — (i) without a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf; or

(ii) with a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf but remains therein beyond the permitted period of time;

*** *** ***

3. Substitution of new section for section 3, — For section 3 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"3. Citizenship by birth. —

(1) Except as provided in sub-section (2), every person born in India—

(a) on or after the 26th day of January, 1950, but before the 1st day of July, 1987;

(b) on or after the 1st day of July, 1987, but before the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003 and either of whose parents is a citizen of India at the time of his birth;

(c) on or after the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003, where --

(i) both of his parents are citizens of India; or

(ii) one of whose parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of his birth, shall be a citizen of India by birth.

(2) A person shall not be a citizen of India by virtue of this section if at the time of his birth—

(a) either his father or mother possesses such immunity from suits and legal process as is accorded to an envoy of a foreign sovereign power accredited to the President of India and he or she, as the case may be, is not a citizen of India; or

(b) his father or mother is an enemy alien and the birth occurs in a place then under occupation by the enemy.".

*** ***

5. Amendment of section 5. -- In section 5 of the principal Act,—
(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

" (1) Subject to the provisions of this section and such other conditions and restrictions as may be prescribed, the Central Government may, on an application made in this behalf, register as a citizen of India any person not being an illegal migrant who is not already such citizen by virtue of the Constitution or any other provisions of this Act if he belongs to any of the following categories,

namely:—

(a) persons of Indian origin who are ordinarily resident in India for seven years before making an application for registration;

(b) persons of Indian origin who ordinarily resident in any country or place outside undivided India;

(c) a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for seven years before making an application for registration;

(d) minor children of persons who are citizens of India;

(e) a person of full age and capacity whose parents are registered as citizens of India under clause (a) of this sub-section or sub-section (1) of section 6;

(f) a person of full age and capacity who, or either of his parents, was earlier citizen of independent India, and has been residing in India for one year immediately before making an application for registration;

(g) person of full age and capacity who has been registered as an overseas citizen of India for five years, and who has been residing in India for two years before making an application for registration.

Explanation 1. For the purposes of clauses (a) and (c), an applicant shall be deemed to be ordinarily resident of India if – (i) he has resided in India throughout the period of twelve months immediately before making an application for registration; and (ii) ha has resided in India during the eight years immediately preceding the said period of twelve months for a period of not less than six years.

Explanation 2. – For the purposes of this sub-section, a person shall be deemed to be of Indian origin if he, or either of his parents, was born in undivided India or in such other territory which become part of India after the 15th day of August, 1947." ;

--)*(--

পরিশিষ্ট- ৫

(মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান)

STATEMENT MADE BY HIS MAJESTY'S GOVERNMENT,
3 JUNE 1947.

INTRODUCTION

1. On 20 February 1947, His Majesty's Government announced their intention of transferring power in British India to Indian hands by June 1948. His Majesty's Government had hoped that it would be possible for the major parties to co-operate in the working-out of the Cabinet Mission Plan of 16th May 1946, and evolve for India a constitution acceptable to all concerned. This hope has not been fulfilled.

2. The majority of the representatives of the provinces of Madras, Bombay, The united Provinces, Bihar, Central Provinces and Berar, Assam, Orissa and North-West Frontier Province, and representatives of Delhi, Ajmer-Merwara and Coorg have already made progress in the task of evolving a new constitution. On the other hand, the Muslim League Party, including in it a majority of representatives of Bengal, the Punjab and Sind, as also the representative of British Baluchistan, has decided not to participate in the Constituent Assembly.

3. It has always been the desire of His Majesty's Government that the power should be transferred in accordance with the wishes of the Indian people themselves. The task would have been greatly facilitated if there had been agreement among the Indian political parties. In the absence of such agreement, the task of devising a method by which the wishes of the Indian people can be ascertained has devolved on His Majesty's Government. After full consultation with the political leaders in India, His Majesty's Government have decided to adopt for this purpose the plan set out below, His Majesty's Government wish to make it clear that they have no intention of attempting to frame any ultimate Constitution for India; this is a matter for Indian themselves. Nor is there anything in this

plan to preclude negotiations between communities for an united India.

THE ISSUES TO BE DECIDED

4. It is not the intention of His Majesty's Government to interrupt the work of the existing Constituent Assembly. Now that provision is made for certain Provinces specified below, His Majesty's Government trust that, as consequence of this announcement, the Muslim League representatives of those Provinces, a majority of whose representatives are already participating in it, will now take their due share in its labours. At the same time, it is clear that any Constitution framed by this Assembly can not apply to those parts of the country which are unwilling to accept it. His Majesty's Government are satisfied that the procedure outlined below embodies the best practical method of ascertaining the wishes of the people of such areas on the issue whether their Constitution is to framed —

(a) in the existing Constituent Assembly; or

(b) in a new and separate Constituent Assembly of the representatives of those areas which decide not to participate in the existing Constituent Assembly.

When this has been done, it will be possible to determine the authority or authorities to whom power to be transferred.

BENGAL AND THE PUNJAB

5. The Provincial Legislative Assemblies of Bengal and Punjab (excluding the European members) will therefore each be asked to meet in two parts, one representing the Muslim majority districts and the other the rest of the Province. For the purpose of determining the population of districts, the 1941 census figures will be taken as authoritative. The Muslim majority districts in this two Provinces are set out in the Appendix to this Announcement.

6. The members of the two parts of the Legislative Assembly sitting separately will be empowered to vote whether or not the Province should be partitioned. If a simple majority of either parts

decides in favour of partition, division will take place and arrangements will be made accordingly.

7. Before the question as to the partition is decided, it is desirable that the representatives of each part should know in advance which Constituent Assembly the Province as whole would join in the event of the two parts subsequently deciding to remain united. Therefore, if any member of either Legislative Assembly so demands, there shall be held a meeting of all members of the Legislative Assembly (other than Europeans) at which a decision will be taken on the issue as to which Constituent Assembly the Province as whole would join if it were decided by the two parts to remain united.

8. In the event of being partition decided upon, each part of the Legislative Assembly will, on behalf of the areas they represent, decide which of the alternatives in paragraph 4 above to adopt.

9. For the immediate purpose of deciding on the issue of partition, the members of Legislative Assemblies of Bengal and the Punjab will sit in two parts according to Muslim majority districts (as laid down in the Appendix) and non-Muslim majority districts. This is only a preliminary step of purely temporary nature as it is evident that for the purposes of final partition of these Provinces detailed investigation of boundary questions will be needed; and, as soon as a decision involving partition has been taken for either Province, a Boundary Commission will be set up by the Governor-General, the membership and terms of reference of which will be settled in consultation with those concerned. It will be instructed to demarcate the boundaries of the two parts of the Punjab on the basis of ascertaining the contiguous majority areas of Muslims and non-Muslims. It will also be instructed to take into account other factors. Similar instructions will be given to the Bengal Boundary Commission. Until the report of a Boundary Commission has been put into effect, the provisional boundaries indicated in the Appendix will be used.

SIND

10. The Legislative Assembly of Sind (Excluding the European members) will at a special meeting also take its own decision on the alternatives in paragraph 4 above.

NORTH-WEST FRONTIER PROVINCE

11. The position of the North-West Frontier Province is exceptional. Two of the three representatives of this Province are already participating in the existing Constituent Assembly. But it is clear, in view of its geographical situation and other considerations, that, if the whole or any part of the Punjab decides not to join the existing Constituent Assembly, it will be necessary to give the North-West Frontier Province an opportunity to reconsider its position. Accordingly, in such an event, referendum will be made to the electors of the present Legislative Assembly in the North-West Frontier Province to choose which of the alternatives mentioned in paragraph 4 above they wish to adopt. The referendum will be held under the aegis of the Governor-General and in consultation with the Provincial Government.

BRITISH BALUCHISTAN

12. British Baluchistan has elected a member but he has not taken his seat in the existing Constituent Assembly. In view of its geographical situation, this Province will also given an opportunity to reconsider its position and to choose which of the alternatives in paragraph 4 above to adopt. His Excellency the Governor–General is examining how this can most appropriately done.

ASSAM

13. Though Assam is predominately a non-Muslim Province, the district of Sylhet which is contiguous to Bengal is predominately Muslim. There has been a demand that, in the event of partition of Bengal, Sylhet should be amalgamated with the Muslim part of Bengal. Accordingly, if it is decided that Bengal should be partitioned, a referendum will be held in Sylhet district, under the aegis of Governor-General and in consultation with the Assam Provincial Government, to decide whether the district of Sylhet should continue to form part of the Assam Province or should be amalgamated with the new Province of Eastern Bengal, if that Province agrees. If the referendum results in favour of amalgamation with Eastern Bengal, a Boundary Commission with terms of reference similar to those

for the Punjab and Bengal will be set up to demarcate the Muslim majority areas of adjoining districts, which will then be transferred to Eastern Bengal. The rest of the Assam Province will in any case continue to participate in the proceedings of the existing Constituent Assembly.

REPRESENTATION IN CONSTITUENT ASSEMBLIES

14. If it is decided that Bengal and the Punjab should be partitioned, it will be necessary to hold fresh elections to choose their representatives on the scale of one for every million of population according to the principle contained in the Cabinet Mission's Plan of 16th May, 1946. Similar elections will also have to be held for Sylhet in the events of its being decided that this district should form part of Bengal. The number of representatives to which each area would be entitled is as follows: ——

Province	General	Muslims	Sikhs	Total
Sylhet District	- 1	2	Nil	3
West Bengal	- 15	4	Nil	19
East Bengal	- 12	29	Nil	41
West Punjab	- 3	12	2	17
East Punjab	- 6	4	2	12

15. In accordance with the mandates given to them, the representatives of the various areas will either join the existing Constituent Assembly or form the new Constituent Assembly.

ADMINISTRTIVE MATTERS

16. Negotiations will have to be initiated as soon as possible on administrative consequences of any partition that may have been decided upon :—

(a) Between the representatives of the respective successor authorities about all subjects now dealt with by the Central Government, including Defence, Finance and Communications.

(b) Between successor authorities and His Majesty's Government for treaties in regard to matters arising out of the transfer of power.

(c) In the case of Provinces that may be partitioned as to administration of all provincial subjects such as the division of assets and liabilities, the police and other services, the High Courts, provincial institutions, & etc.

THE TRIBES OF THE NORTH-WEST FRONTIER

17. Agreements with the tribes of the North-West Frontier of India will have to be negotiated by the appropriate successor authority.

THE STATES

18. His Majesty's Government wish to make it clear that the decisions announced above relate only to British India and that their policy towards Indian States contained in the Cabinet Mission Memorandum of 12th May, 1946, remains unchanged.

NECESSITY FOR SPEED

19. In order that the successor authorities may have time to prepare themselves to take over power, it is important that all the above process should be completed as quickly as possible. To avoid delay, the different Provinces or parts of Provinces will proceed independently as far as practicable within the conditions of this Plan, the existing Constituent Assembly and the new Constituent Assembly (if formed) will proceed to frame Constitutions for their respective territories : they will of course be free to frame their own rules.

IMMEDIATE TRANSFER OF POWER

20. The major political parties have repeatedly emphasised their desire that there should be the earliest possible transfer of power in India. With this desire His Majesty's Government are in full sympathy, and they are willing to anticipate the date of June 1948, for the handing over of power by the setting up of an independent Government or Governments at an even earlier date. Accordingly, as the most expeditious, and indeed the only practicable way of meeting this desire His Majesty's Government propose to introduce legislation during the current session for the transfer of power this year on a Dominion status basis to one or two successor authorities according to the decisions taken as a result of this announcement. This will be without prejudice to the right of Indian Constituent

Assemblies to decide in due course whether or not the part of India in respect of which they have authority will remain within the British Commonwealth.

FURTHER ANNOUNCEMENT BY GOVERNOR-GENERAL

21. His Excellency the Governor-General will from time to time make such further announcements as may be necessary in regard to procedure or any other matters for carrying out the above arrangements.

APPENDIX
MUSLIM MAJORITY DISTRICTS OF BENGAL AND THE PUNJAB ACCORDING TO THE 1941 CENCUS

1.	Bengal		
	Chittagong Division	:	Chittagong, Noakhali, Tippera.
	Dacca Division	:	Bakarganj. Dacca, Faridpur, Mymensingh.
	Presidency Division	:	Jessore, Murshidabad, Nadia.
	Rajshahi Division	:	Bogra, Dinajpur, Malda, Pabna, Rajshahi, Rangpur.
2.	The Punjab		
	Lahore Division	:	Gujranwala, Gurdaspur, Lahore, Sheikhpura, Sialkot.
	Rawalpindi Division	:	Attock, Gujrat, Jhelum, Mianwali, Rawalpindi, Shahpur.
	Multan Division	:	Dera Ghazi Khan, Jhang, Lyalpur, Montgomery, Multan, Muzaffargarh.

*****

[Taken from : The Transfer of Power 1942 – 7 (1982). Pub : Her Majesty's Stationary Office, London, Vol. XI, pp – 89 –94.]

পরিশিষ্ট - ৬

পূর্ব পাকিস্তান সরকার

উপ-তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়, শত্রু সম্পত্তি

(জমি ও ইমারত)

ইপি. সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, ঢাকা।

স্মারক নং-১৬৯৪ - ১০ - ৫০৫/৬৭ - ইপি তারিখ - ২৬-৬-৬৮

প্রাপক ঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, শত্রু সম্পত্তি (জমি ও ইমারত), কুমিল্লা।

বিষয় ঃ তাঁহার স্মারক নং-১২৩৩/ই.পি

তারিখ- ১৭-৫-৬৮ ইং

১৪-৩-৬৬ তারিখে ৫৫ (১৭)-১-২২/৫ ই.পি. নং স্মারকের ৮ম অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল ঃ

ভারতে বসবাসরতমুসলমানদের সম্পূর্ণ মালিকাধীন সম্পত্তি সাধারণভাবে শত্রু সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হইবে না। যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অবৈধ দখলদারদের নিকট হইতে দখল পুনরুদ্ধার না করিলে, অনুপস্থিত মালিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবে, তবে এইরূপ সম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য দখল গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধরনের অনুপস্থিত মালিকগণ পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাদের সম্পত্তি দাবী করিলে, সম্পত্তির দখল তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই ধরনের সম্পত্তি সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাপনা করিবেন।

স্বাঃ এস. আহমেদ
উপ-তত্ত্বাবধায়ক
শত্রু সম্পত্তি (জমি ও ইমারত)

—)*(—

পরিশিষ্ট- ৭

জেহাদ ঃ বাংলাদেশেকে হিন্দু শূন্য করার কার্যকরী অস্ত্র

ইসলামের অভিধান অনুসারে '**জেহাদ' বলতে বোঝায় মহম্মদের ইচ্ছা এবং কার্যাবলীতে (Mission) যারা অবিশ্বাসী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।** এটি বিশেষভাবে ইসলাম ধর্ম প্রসারের জন্য এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে 'আল্লাহ্-বিরোধী ভাব' দূর করার জন্য কোরান ও হাদিসে উল্লেখিত আল্লাহ্র বিধান বলে সুপ্রতিষ্ঠিত ও মুসলমানদের অবশ্য করণীয় ধর্মীয় কাজ। কাগজে-পত্রে আর এক প্রকার জেহাদ আছে। নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামও নাকি জেহাদ। তবে তা হিসেবেই আছে, বাস্তবে নেই।

আল্লাহ্র বক্তব্য অনুসারে 'ইসলাম ধর্মই পৃথিবীতে একমাত্র মহাসত্য'। নবী মহম্মদের সময় আল্লাহ্ এই মহাসত্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন এবং নবীকে বলেন— "আল্লাহর নামে এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য পৌত্তলিকদের আমন্ত্রণ জানাও .... তারা যদি এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর দাবী কর ..... তারা যদি এই কর দিতে অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ্র সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" (ড. আবদুল হামিদ সিদ্দিকির 'সহী মুসলিম, হাদিস নং ৪২৯)

নবী মহম্মদ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জেহাদ (যুদ্ধ) না করিয়া কিংবা জেহাদের সংকল্প না রাখিয়া মৃত্যু বরণ করে, তাহার মৃত্যু হইল এক প্রকার ভণ্ড বা প্রতারকের (Hypocrite) মৃত্যু।" (মিশকাতুল মাসারির ৪৫১২ নং হাদিস)। এই পৃথিবী থেকে পৌত্তলিকদের উৎখাত করে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ বা যুদ্ধ চলতে থাকবে। কোরানে ২/১৯৩ এবং ৮/৩৯ নং আয়াতে এ কথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। দুঃখের কথা এই, উপমহাদেশে কোটি কোটি হিন্দু এই চরম সত্যকে বিশ্বাস করেন না। কূটকৌশলী মুসলমানদের ভাষায় তারা বলছেন, ইসলাম শব্দের অর্থ 'শান্তি'। একাধিক বিষয় মাষ্টার ডিগ্রীধারী জনৈক হিন্দু ব্রহ্মচারী সাধুর মতে 'Islam' বলতে বোঝায়— 'I shall love all men.'। এইসব নির্বোধ ব্রহ্মচারীরা কোরানের ক'-ও পড়েননি। হাদিসের 'হ'-ও জানেন না। বস্তুতঃ এই উপমহাদেশে হিন্দু রাজনীতিবিদদের মধ্যে ৫/৭ জন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ কোরান-হাদিসের বিন্দু বিসর্গও জানতেন না বা এখনও জানেন না। নিঃসন্দেহে এদের মধ্যমণি ছিলেন মি. মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী। কোরান হাদিস সম্পর্কে তার নূন্যতম জ্ঞান থাকলেও এই উপমহাদেশের কোটি কোটি হিন্দুর জীবনে আজ এমন সীমাহীন যন্ত্রণা নেমে আসতো না।

যাক্, জেহাদ সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা প্রয়োজন। জেহাদের মাধ্যমে মুসলমানরা যেমন ইহলোকে, তেমনি পরলোকে বিশেষ ভাবে উপকৃত হচ্ছে। ইহলোকে

জেহাদের মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম প্রচার করতে পারে, রাজ্য জয় করতে পারে, বিধর্মীদের (পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসীদের) খুন করতে পারে এবং লুঠপাট, অগ্নি-সংযোগ এবং বল্গাহীন ভাবে তাদের মেয়ে-বউকে ধরে এনে দিনের পর দিন ধর্ষণ করতে পারে।

মুসলমানদের জেহাদে অংশ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এর দ্বারা পরকালে তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত —'গ্যারান্টেড'। জেহাদের অবিচ্ছেদ্য অংগ হচ্ছে 'লুঠপাট ও নারী ধর্ষণ'। লুটের মালের মধ্যে থাকবে যাবতীয় সম্পদ— সোনা-দানা, ঘর-বাড়ী, নগদ অর্থ ছাড়াও নারী, পুরুষ, শিশু সবই। এসবের মধ্যে সক্ষম পুরুষদের মেরে ফেলতে হবে। মহিলা ও শিশুদের বিক্রী বা ভোগ করতে হবে।

লুঠপাট করা দ্রব্যের নাম 'মালে গনিমত' বা 'গনিমতের মাল'। ভদ্র ভাষায় একে বলে 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ'। মহান খোদা জেহাদের উপর ১৬৪-টি আয়াত এবং যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের উপরে ৭৫-টি আয়াত (কোরানের ৮ নং সূরা ; নাম 'সুরা আন-ফাল') নাযেল করেছেন (পাঠিয়েছেন)।

বাংলাদেশে বর্তমান কিছু সংখ্যক ইসলামপ্রেমী তথা শান্তিকামী মুসলমান দেখা যাচ্ছে। এদের সঙ্গে সহমত পোষণ করছে পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংখ্যক আঁতেলকামী ও ইসলামপ্রেমী হিন্দুনামধারী 'অহিন্দু' সুচতুর ভাবে জেহাদ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ এড়িয়ে যান —

* হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর এবং তাহাদের সহিত কঠোর নীতি প্রয়োগ কর। তাহাদের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম এবং পরিণতি হিসাবে উহা অত্যন্ত দুঃখময় স্থান (৬৬/৯)। ভারতের ইসলামপ্রেমী হিন্দু আঁতেলরাও হিন্দু হবার কারণেই যে 'কাফের', এই বোধটুকুই জন্মেনি তাদের। যে সকল হিন্দু নিজেদের 'দলিত' বলে পরিচয় দিয়ে যারা দিল্লীর ক্ষমতা দখল করতে চান, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়।

* তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। ..... আল্লাহ্ তোমাদের গুণাহ্-খাতা মাফ্ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাইবেন যে সবের নিচ দিয়া ঝর্ণা সদা প্রবাহিত এবং চিরকাল অবস্থিতির জন্য জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদিগকে দান করিবেন। ইহা বড় সাফল্য (৬১/১১-১২) ।

* .... তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তাহাদিগকে শাস্তি দান করিবেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবেন, আর তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করিবেন। এবং বহুসংখ্যক মুমিনদের দিলকে ঠাণ্ডা করিবেন। (৯/১৪)

* তোমরা যদি যুদ্ধ-যাত্রা না কর, তাহা হইলে তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি দান করা হইবে এবং তোমাদের স্থলে অপর কোন লোক সমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। তোমরা খোদার কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। .... (৯/৩৯)

* অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, তখন মুশরিকদের হত্যা

কর যেখানেই তাহাদের পাও; এবং তাহাদের ধর, ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাহাদের খবরাখবর লওয়ার জন্য শক্ত হইয়া বস। অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। .. (৯/৫)

* যে কেহই সংগ্রাম-সাধনা (জেহাদ) করিবে সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করিবে। ... (২৯/৬)

* আর যাহারা আমাদের জন্য চেষ্টা-সাধনা (জেহাদ) করিবে তহাহাদিগকে আমরা আমাদের পথ দেখাইব। ... (২৯/৬৯)

* প্রকৃতপক্ষে মু'মিন তো তাহারাই যাহারা .... নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে। তাহারাই সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ। (৪৯/১৫)

এ ছাড়া 'সহি বুখারী' এবং 'সহি মুসলিম শরীফে' (হাদিসে) জেহাদের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাও এড়িয়ে যান ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা। যারা আগ্রহী তারা যদি গুরুত্বপূর্ণ এই হাদিস সংকলন দু'টি সংগ্রহ করতে না পারেন তারা এই নিবন্ধে উল্লেখিত 'ডিক্‌শন্যারি অফ ইসলাম'-এর ২৪৪-২৪৮ নং পৃষ্ঠাগুলি পড়ে দেখতে পরেন। এখানে বিস্তৃত ভাবে যে সব কথা বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে —

(১) প্রথমে পুতুল পুজারীদের একমাত্র মহাসত্য পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে হবে। এদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে তারা মুসলমানদের আপন লোক হয়ে যাবে। আর যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে না, তাদেরকে বলতে হবে 'তোমরা আমাদের জিজিয়া কর দাও এবং 'জিম্মী' হয়ে বসবাস কর।'

(২) যারা জিজিয়া কর দিতে অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা যুদ্ধ করবে খোদার সাহায্য নিয়ে। **পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে অত্যাচারের সকল প্রকার পথ অবলম্বন করতে হবে, ঠিক যেমন 'তাইফ'-এর যুদ্ধে মহানবী করেছিলেন। মুসলমানরা তাদের বাড়ী ঘর অবশ্যই জ্বালিয়ে দেবে, ঠিক যেমন মহানবী জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন 'বাউইরা' (Baweera)- দের বাড়ীঘর।** এছাড়া তাদের বাসস্থান জলে ডুবিয়ে দিতে হবে। গাছপালা কেটে ফেলতে হবে এবং খাদ্য শস্য ধ্বংস করে দিতে হবে। এ ধরনের সব অত্যাচারই আইন সংগত। (পূর্বোক্ত অভিধান, পৃ- ২৪৫)

(৩) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে অর্থাৎ জেহাদ করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ধুলো পায়ে লাগলে, সেই পা নরকের আগুনে পুড়বে না।

৪) জেহাদে মৃত্যু হলে ঋণ করার পাপ ছাড়া বাকি সব পাপ খোদা মাফ করে দেবেন। খোদার পথে যুদ্ধ করা ধর্মীয় কর্তব্য। যখন কোন ইমাম যুদ্ধে ডাক দেবেন, তখন মুসলমানদের যুদ্ধে যেতেই হবে।

জেহাদ হজ করার চেয়ে পূণ্যতম। নবীজী তাঁর মদীনা বাসের ১০ বছরের মধ্যে ৮২ বার জেহাদ করেছিলেন। এর ২৬-টিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। অন্তত ২৩ বার তিনি জয়ী হয়েছিলেন। জেহাদে যিনি জয়ী হন তিনি গাজী উপাধি পান। অভিধানে 'গাজী' শব্দটির একাধিক অর্থ আছে। যেমন — বীর, যোদ্ধা, ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ করে। এছাড়া মূর্তি পুজারীর হত্যাকারীকেও 'গাজী' বলে।

(One who slays an infidel.) বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের পোষা গুণ্ডারা হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসীদের মতো মূর্তি পুজারীদের খুন করে ধনী হচ্ছে, যৌন তৃপ্তি লাভ করছে এবং সর্বোপরি 'গাজী' হচ্ছে। এর সঙ্গে পরকালে কয়েক গণ্ডা পিনোন্নতা হুরীদের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে অনবরত ক্লান্তিবিহীন যৌন সহবাস করার সুযোগ তো আছেই।

"যে গনিমতের মাল তোমরা পেয়েছ তা বৈধ এবং উত্তম বলে ভোগ কর।" ভাষান্তরে "অতএব তোমরা যাহা কিছু ধন- মাল লাভ করিয়াছ তাহা খাও; উহা হালাল ও পাক *(পবিত্র)*। ...." (৮/৬৯) পবিত্র ইসলামের দৃষ্টিতে এই লুটের মালকে 'খোদার অনুগ্রহের দান' বলা হয় এবং এর কে কতটুকু পাবে তা বলে দিতে কসুর করেননি রহমানির রহিম খোদা কোরানের ৮/৪১ নং আয়াতে। ৫ ভাগের এক পাবেন খোদা এবং তার রসুল, রসুলের আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র ও পথচারীরা। বাকী অংশ পাবে জিহাদীরা। বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সব মুসলিম প্রধান দেশে বিরতিহীন জেহাদ চলছে। তবে লুটের মাল বন্টনের হিসেব আলাদা আলাদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতৃহীন, দরিদ্র ও পথচারীর স্থান নিয়েছে রাজনীতির মস্তানরা।

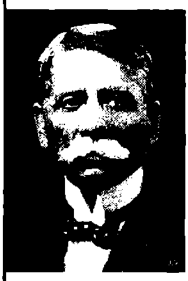
****

।। মাওলানা আকরাম খাঁ ।।

মাওলানা আকরাম খাঁ (১৮৬৮১৯৬৯) নিঃসন্দেহে একজন প্রথম শ্রেণির ইসলাম ধর্ম শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম (আর্য ধর্ম), খৃস্ট ধর্ম, ইহুদী ধর্ম এবং জৈন ধর্মের তীব্র সমালোচনা করে এগুলোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন। (মোস্তফা চরিত, পৃ- ২০১-২২৮) তিনি প্রতিমা পুজো বা পৌত্তলিকতাকে ভারতের সমস্ত ধর্মগত, জ্ঞানগত ও নীতিগত অধঃপতন ও যাবতীয় সর্বনাশের মূল উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন। (পৃ-২০৪)

।। সৈয়দ আমীর আলি ।।

কোলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি **স্যার সৈয়দ আমীর আলী** (১৮৪৯-



১৯২৮) ছিলেন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা এসেছেন পারস্য থেকে। আমীর সাহেবের লেখা **'দি স্পিরিট অব ইসলাম'** পড়লাম। মনে হয় খোদার গুণগান কীর্তন করার জন্যই তিনি প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার এই বইটি লিখেছেন। তাঁর ভাষার যাদু এমনই যে কোন পাঠক মনে করবেন, কোটি কোটি ক্ষমার পরমাণু দিয়ে খোদার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই খোদা পৌত্তলিকদের ক্ষমা করবেন এমন একটি বাক্যও ব্যবহার করতে পারেননি আমীর আলি সাহেব।

পরিশিষ্ট - ৮

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের
স্বাধীনতা ঘোষণার বয়ান
. মার্চ ২৫, ১৯৭১

'সম্ভবতঃ এটাই আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যে যেখানে আছ এবং যাই তোমাদের হাতে আছে তার দ্বারাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হবে। যতক্ষণ না পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ ব্যক্তি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে, তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।'

উৎস গ্রন্থ ঃ ' আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম',
সম্পাদনা ঃ শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ, পৃ - ৪৫।

***

পরিশিষ্ট - ৯

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ তারিখের পরে বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষদের
ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিঠি

From : Shri S. C. Mukherjee, Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Collector of Calcutta. No. 2669-PC/7C-341/71, Calcutta, the 26th November, 1971.

Sub : Grant of Indian citizenship to persons who have come over to India from Bangladesh.

Ref : Your D.O. No. 71–C dated the 1st Nov., 1971 on the above subject.

2. According to the policy of the Govt. of India, the Pakistan national who have come over to Indian from Bangladesh consequent on the army action on the civil population of that country

starting from 25th March 1971, have been given temporary shelter in India on humanitarian ground and all of them shall return to their homeland when conditions become normal there. These Pakistani nationals who are generally described as evacuees are foreigners and their entry and stay in India is being regulated in accordance with the directions issued by the Ministry of Home Affairs, Govt. of India. In terms of this direction all of them are required to registar themselves under the Registration of Foreigners Act. and to take out residential permit under the Foreigners Act. It would, therefore, be quite clear that these evacues are not being accepted by the Govt. of India as migrants who have come to India from Pakistan for permanent settlement and hence they do not qualify for the grant of Indian citizenship under section 5(1)(a) of the citizenship Act., 1955 on completion of six months stay in this Country as provided for the said Act. So the question of granting Indian citizenship to any one of them does not arise.

3. It is not clear why a through local inquiry by the police will not disclose the fact whether an applicant is a migrant or an evacuee from Pakistan. If the report be not conclusive on this point the Registering Authority should send back. The case for further enquiry, clearly indicating the point on which the report is required and may also call upon the applicant to produce documentary and oral evidence to prove to the satisfaction of the Registering Authority that the applicant is a migrant and not an evacuee from Bangladesh. If the Registering Authority is not fully satisfied that the applicant is a migrant, he shall reject the application and if the applicant is aggrieved, it will then be open to him to file an appeal under section 15(1) of the Citizenship Act., 1955 for a decision by the Central Govt.

All applications for Indian citizenship which may be received henceforth may be disposed of in the manner indicated above.

S. C. Mukherjee.
Deputy Secretary to the Govt.of West Bengal.

পরিশিষ্ট - ১০

পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল

(১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড পূর্ব রণক্ষেত্রে ভারতীয় এবং বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ সম্মতি প্রদান করছেন। এই আত্মসমর্পণে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাক বাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্য, সকল আধাসামরিক এবং বেসামরিক অস্ত্রধারী সৈনিক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই সকল সৈন্য যে যেখানে যেভাবে আছেন সেইভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন এবং তাদের নিকটস্থ জেনারেল অরোরার অধীনস্থ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করবেন।

এই দলিল স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড জেনারেল অরোরার আদেশাধীনে ন্যস্ত হবে। তাঁর আদেশের বরখেলাপ আত্মসমর্পণ চুক্তি ভঙ্গের সামিল হবে এবং যুদ্ধের সর্বগ্রাহ্য নিয়মাবলী ও বিধি অনুযায়ী অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই আত্মসমর্পণ চুক্তি ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন সন্দেহের উদ্ভব হলে লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

লেঃ জেনারেল অরোরা এই মর্মে পবিত্র আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, যাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন তাঁদের প্রতি জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী যোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে। লেঃ জেনারেল অরোরার অধীন সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদেশী নাগরিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষর,
জগজিৎ সিং অরোরা
লেঃ জেনারেল
জি ও সি এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয়
বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর
সর্বাধিনায়ক।
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

স্বাক্ষর,
আমির আবদুল্লা খান নিয়াজী
লেঃ জেনারেল
সামরিক আইন প্রশাসক, জোন-বি
এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চল
কমাণ্ডের সর্বাধিনায়ক।
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

পরিশিষ্ট-১১

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ তারিখের পরে বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রাপ্তি সম্পর্কে ভারত সরকারের চিঠি

(Express letter No 26011/16/71-10,
Dated, New Delhi, the 29th November, 1971.)

To: The Chief Secretaries to all State Governments and Union Territories, Administration.

বিষয় : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান। এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের নিকট থেকে ভারতের নাগরিকত্বের দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না বলে নির্দেশ।

যে সব উদ্বাস্তু ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে এসেছে তাদের ভারতের অধিবাসী বলে গণ্য করা যায় না। সুযোগ হলেই তাদের জন্মস্থানে ফিরে যেতে বলা হবে। ১৯৫৫ সালের ভারতের নাগরিকত্ব আইনের ৫/১/(এ) নং ধারা এবং ১৯৫৬ সালের নাগরিকত্ব নিয়মাবলী অনুসারে ভারতের নাগরিক হিসাবে তাদের নাম তালিকাভুক্ত হবে না। তারা যদি তাদের নাম ভারতের নাগরিক হিসাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য ভারতের নাগরিকত্ব আইনের ৫/১/(এ) ধারা অনুসারে আইনানুগ কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করে তবে তাদের সেই দরখাস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। নাগরিকত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে , যে ব্যক্তি১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে সে নাগরিকত্ব লাভের যোগ্য নয়। কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য নিয়ে এবং আগেকার তারিখ দিয়ে দরখাস্ত করল কিনা তা বিশেষভাবে অনুসন্ধানযোগ্য। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আপনাদের অধীনস্থ সমস্ত নাম নথিভুক্তকারী কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে জানিয়ে দিতে হবে।

স্বাঃ সি.এল.গোয়েল
আণ্ডার সেক্রেটারী, ভারত সরকার

পরিশিষ্ট - ১২

ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি-১৯৭২

(২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি)

শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধের একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের লক্ষ্যে একযোগে সংগ্রাম, রক্তদান এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার অঙ্গীকার নিয়ে মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় অভ্যুদয় ঘটিয়ে; সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তকে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের সীমান্ত হিসেবে রূপান্তরের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে; নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকে এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান প্রদর্শনের মূলনীতি সমূহের প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল থেকে; শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং সম্ভাব্য সকল প্রকারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্ব স্ব দেশের অগ্রগতির জন্য; উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণ ও জোরদার করার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে; এশিয়া তথা বিশ্বের স্থায়ী শান্তির স্বার্থে এবং উভয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতা আরো সম্প্রসারিতকরণে বিশ্বাসী হয়ে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ ও সামন্তবাদের শেষ চিহ্নটুকু চূড়ান্তভাবে নির্মূল করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; আজকের বিশ্বের আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধান যে শুধুমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব, বৈরিতা ও সংঘাতের মাধ্যমে নয়— এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে; রাষ্ট্র সংঘের সনদের নীতিমালা ও লক্ষ্য সমূহ অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করে একপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও অন্য পক্ষে প্রজাতন্ত্রী ভারত বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১

চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ স্ব স্ব দেশের জনগণ যে আদর্শের জন্য একযোগে সংগ্রাম এবং স্বার্থত্যাগ করেছেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে যে, উভয় দেশ এবং তথাকার জনগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী বজায় থাকবে। একে অপরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অবিচল থাকবে। চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উল্লেখিত নীতিমালা এবং সমতা ও পারস্পরিক উপকারিতার নীতি সমূহের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসুলভ সার্বিক সহযোগিতা ও

সম্পর্কের উন্নয়ন আরো জোরদার করবে।

অনুচ্ছেদ ২

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি সমতার নীতিতে আস্থাশীল থাকার আদর্শে পরিচালিত হয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ সর্ব প্রকারের উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের নিন্দা করছে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা পুনরুল্লেখ করছে। চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উপরোক্ত অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবিরোধী এবং জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্খার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করবে।

অনুচ্ছেদ ৩

চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা মজবুত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জোটনিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের অবিচল আস্থা পুনরুল্লেখ করছে।

অনুচ্ছেদ ৪

উভয় দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয় সকল স্তরে বৈঠক ও মত বিনিময়ের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ ৫

চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করে যাবে। উভয় দেশ সমতা, পারস্পরিক সুবিধা এবং সর্বোচ্চ আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের বেলায় প্রযোজ্য নীতির ভিত্তিতে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৬

চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং জল বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে অভিন্ন মত পোষণ করে।

অনুচ্ছেদ ৭

চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট হবে।

অনুচ্ছেদ ৮

দুই দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে ঘোষণা করছে যে, তারা একে

অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বা অংশগ্রহণ করবে না। চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পক্ষদ্বয় একে অন্যের উপর আক্রমণ থেকেও নিবৃত্ত থাকবে এবং তাদের ভূখণ্ডে এমন কোন কাজ করতে দেবে না যাতে চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি হতে পারে অথবা কোন পক্ষের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনুচ্ছেদ-৯

যদি কোন পক্ষ আক্রান্ত হয় বা আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন হয় তাহলে উচ্চতম চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসবে যাতে আক্রমণের ভীতি দূরীভূত হয় এবং যদি কোন পক্ষ আক্রান্ত হয় বা তার প্রতি আক্রমণের ভীতি প্রদর্শিত হয় তাহলে উচ্চতম চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসবে ও এমন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে আক্রমণের ভীতি দূরীভূত হয় এবং তাদের দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়।

পরিচ্ছেদ-১০

প্রত্যেক উচ্চতম চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠনিকভাবে ঘোষণা করছে যে, তারা কেউই অন্য কারো সঙ্গে, এমন কি কারো কাছে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন ব্যাপারে এমন কথা দেবে না যে বর্ত্তমান চুক্তির সঙ্গে সংগতিহীন।

পরিচ্ছেদ-১১

বর্তমান চুক্তিপত্রটি ২৫ বছরের জন্য সহি করা হচ্ছে এবং এই চুক্তি পরবর্তী কালে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পুনর্নবীকরণ করা যাবে। এই চুক্তিপত্র সহি করার তারিখ থেকে কার্যকরী হবে।

পরিচ্ছেদ-১২

এই চুক্তিপত্রের কোন অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদ সমূহের অর্থ নিয়ে যদি ভিন্নমত দেখা দেয় তাহলে উচ্চতম চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ উভয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বোঝাপড়ার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করে তার মীমাংসা করে নেবে।

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ।

স্বাঃ ইন্দিরা গান্ধী, প্রধান মন্ত্রী
প্রজাতন্ত্রী ভারতের পক্ষে
নতুন দিল্লী, ১৯ মার্চ, ১৯৭২

স্বাঃ শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধান মন্ত্রী,
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

***

পুনঃ শেখ মুজিবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই চুক্তির মূল্য দাঁড়িয়েছে কানাকড়িতে ;
এটির স্থান হয়েছে মহাফেজ খানার বদ্ধ কুঠুরিতে।

পরিশিষ্ট - ১৩

আল-বদর বাহিনী, জামাতে ইসলাম ও আজকের সন্ত্রাসী দল

'আলবদর একটি নাম। একটি বিস্ময়। আলবদর একটি প্রতিজ্ঞা। যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আলবদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী, আলবদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আলবদর সাক্ষাৎ আজরাইল। ... আল কোরআনের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত, সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত পাকিস্তানবাদী এসব তরুণরা ভারতীয় চর, অনুপ্রবেশকারী মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়।' এই হচ্ছে আলবদরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কি উদ্দেশ্যে এবং কবে এর জন্ম?

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যতগুলো যুদ্ধ করেছেন তার একটির নাম 'বদর যুদ্ধ'। এটি হয়েছিল ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মার্চ পশ্চিম আরবের হেজাজ অঞ্চলে। এক দিকে মহানবী। তাঁর সৈন্য সংখ্যা ৩১৩ জন। বিপক্ষে কোরেশবাহিনী। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১ হাজার। জয়ী হলেন নবীজীই। তাঁর পক্ষে নিয়োজিত মুসলমান যোদ্ধাদের স্মরণে ১৯৭১-এর ২২ এপ্রিল বাংলাদেশের মোমেনশাহী জেলা ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতৃত্বে 'আলবদর বাহিনী' গঠিত হয়। এই বাহিনীর জন্ম এবং কার্য্যাবলী সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ ফিচার প্রকাশিত হয় জামাতে ইসলামীর মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম'-র ১৪-৯-'৭১ তারিখের সংখ্যায় (পৃ-৩)। এটিতে বলা হয়—

'সরলপ্রাণ জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভাবনার চরম মুহূর্তে আলবদর বিশেষ আশ্বাস ও নিশ্চয়তা নিয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ও ইসলামের হেফাজতে আল বদরের বলিষ্ঠ ভূমিকায় ভারতীয় চর, অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারীদের সমূলে উৎখাত করে জনজীবনে শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তার কার্যকরী ও ন্যায়ানুগ পদক্ষেপ জনসাধারণকে শুধু মুগ্ধই করেননি, বরং তাদেরকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। জনজীবনে আল বদর তাই সত্য, ন্যায় ও শান্তির প্রতীক।'

মুসলিম লীগকে টেক্কা দিতে ১৯৪০-এ মাওলানা আবুল আলা মওদূদীর নেতৃত্বে জন্ম নেয় জামাতে ইসলামী। ১৯৪১-এ গঠিত হয় তাদের যুব সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র শিবির'। জামাতে ইসলামীর মদতে ১৯৯৮-এ বার্মা থেকে আগত রোহিঙ্গা মুসলমানরা কক্সবাজারে গঠন করে 'আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অরগানাইজেশন'। ১৯৭১-এর পরে, বিশেষত ওসামা বিন লাদেনের আবির্ভাবের পরে নিত্য নতুন সন্ত্রাসী দলের জন্ম হতে থাকে। বাংলাদেশে দেড় শতাধিক লাদেনপন্থী সন্ত্রাসী দল আছে। গোয়েন্দা সংস্থা



ওসামা বিন লাদেন (১০ মার্চ, ১৯৫৭- ২ মে, ২০১১)

১১-টি সংস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করছে। এগুলো হল —

(১) জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ; ২) শাহ্দাত-ই-আল হিকমা; (৩) জামায়াত-ই-আল তুরাত; (৪) হিজবুত তওহিদ; (৫) আল হারাকাত আল ইসলামিয়া; (৬) মারকাজুল আল ইসলামী; (৭) জামাতুল ফালাইয়া; (৮) তাওহিদী জনতা; (৯) বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট; (১০) জুম্মাতুল আল-সাদাত ও (১১)শাহ্দাত-ই নবুয়ত।

সন্ত্রাসীদের মধ্যে এরা চুনোপুটি। রাঘব-বোয়ালরা হচ্ছে —

ক) হরকতুল জিহাদ-ই-ইসলামী (বাংলাদেশ); খ) খতমে নবুয়াত;
গ) জইসে মোস্তফা বাংলাদেশ; ঘ) আল জিহাদ বাংলাদেশ;
ঙ) ওয়ার্লড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ; চ) আল্লাহ্র দল প্রভৃতি।
ছ) বাংলা ভাই; (বর্তমানে কিছুটা স্তিমিত)

এর সব ক'টি দলের উদ্দেশ্য মোটামুটি একই — **'সকল সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হেনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রদর্শন। এদের সামরিক অঙ্গীকার হচ্ছে, আল্লাহ্র শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করা, বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত চালু করা, যা কিছু ইসলাম বিরোধী, তা ধ্বংস করা ইত্যাদি।** 'আল জিহাদ বাংলাদেশ'-র দলীয় প্রধান ফজলুর রহমান আর ৩-টি (মোট ৪-টি) জঙ্গী সংগঠন মিলে ১৯৯৮-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে একটি যুক্ত ইশতাহারে স্বাক্ষর করে 'ওয়ার্লড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ' গঠন করেছেন।

১৯৯৯-এর জানুয়ারি পর্যন্ত বিন লাদেনের দেওয়া ২ কোটি টাকা ৪২১-টি মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়েছে। ঐ সময় পর্যন্ত হরকতুল জিহাদ চট্টগ্রামের একটি ট্রেনিং ক্যাম্পে ২৫ হাজার যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ('একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' এবং ৩.৯.২০০৩ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে শাহরিয়ার কবিরের ভাষণ থেকে আমরা এ সব তথ্য সংগ্রহ করেছি।)

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি প্রেসে পাঠাবার পূর্ব মুহূর্তে জানা গেল 'হিযবুত তাহিরী' নামে একটি সন্ত্রাসী দলের সাহায্য নিয়ে হাসিনা বিরোধী মৌলবাদী গোষ্ঠী বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে যাচ্ছিল। এই খবরের সত্যাসত্য সম্পর্কে আমরা এখনো নিঃসন্দিহান হতে পারিনি। তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভালমানুষ মনমোহনজী আগাম বলে রেখেছেন, বাংলাদেশে তেমন কোনো ঘটনা ঘটলে ভারত শেখ হাসিনার পাশেই দাঁড়াবে।

ঠিক এই সময় শেখ হাসিনার বিজ্ঞ অফিসারবৃন্দ মাষ্টারদা সূর্য্য সেন থেকে শুরু করে এই কলমচির মতো কাফেরদের জমি-জমা পাকা-পোক্তভাবে হজম করে নেবার আইন বানাতে ব্যস্ত। এখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. উইনস্টন চার্চিলের বলা একটি কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, হিন্দুরা যখন দর্শন চর্চায় ব্যস্ত থাকেন, মুসলমানরা তখন তরবারীতে 'শান' দেন।

পরিশিষ্ট - ১৪

জিন্নাহ্-লিয়াকত-ইয়াহিয়া-ভুট্টো-জিয়া-এরশাদের কয়েকজন পূর্বসূরী

ভারতরত্ন ড. আম্বেদকর তাঁর লেখা 'থট্স অন পাকিস্তান'-এর (পরবর্তী নাম 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া') ৫৪ থেকে ৬৩ নং পৃষ্ঠায় ভারত আক্রমণকারী মুসলমানরা পৌত্তলিক ভারতবাসীর উপর যে পাশবিক অত্যাচার করেছিলেন মর্মস্পর্শী ভাষায় তার বর্ণনা দিয়েছেন। 'উপসংহার' অংশে এর কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেদিনের অত্যাচারের সঙ্গে বর্তমান সময়ের অত্যাচারের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। এখানে আমরা ৭১২ থেকে ১৮৫৭ খ্রী. পর্যন্ত ১০ জন আক্রমণকারীদের চিত্র-পরিচিতি তুলে ধরছি। প্রথম আক্রমণকারী বিন কাশিমের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে।

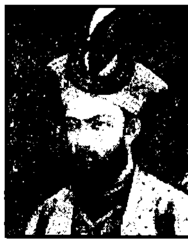

মহম্মদ ঘোরী


বখতিয়ার খিলজী


তৈমুর লং


আলাউদ্দিন খিলজী


সম্রাট শাহজাহান


আওরঙ্গজেব


কুতুবুদ্দিন আইবেক


নাদির শাহ্


আহমদ শাহ্ আবদালি

আজও যারা বিশ্বাস করেন 'ইসলাম' শব্দের অর্থ শান্তি, অনুগ্রহ করে তাঁরা জানাবেন কি ৬১০ খ্রী. থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন কোন দেশে মুসলমানরা শান্তি স্থাপন করেছেন? দলিত-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলার কাণ্ডারীরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিলে খুশি হব।

গবেষক-প্রাবন্ধিক শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের সাড়া জাগানো সৃষ্টি

১। কেন উদ্বাস্তু হতে হল (৩য় সংস্করণ,২০১২)
২। ইসলাম ও বিশ্বশান্তি (২০১১)
৩। মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ (২য় সংস্করণ, ২০১২)
৪। যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে সর্বধর্ম সমন্বয় (২০১১)
৫। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ : একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ (২০১০)
৬। মুসলিম রাজনীতি ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ (২০০৮)
৭। অহিংস তত্ত্ব, আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষা (২০০৯)
৮। বাংলাদেশ, মানবাধিকার ও সংখ্যালঘু নিপীড়ন (২০০৬)
৯। অপারেশন ছাড়াই হার্ট-ব্লকেজের চিকিৎসা (আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. বিমল ছাজেড়ের পদ্ধতি। ২য় সংস্করণ প্রকাশের পথে)
১০। বাংলা মন্ত্রপাঠে হিন্দু বিবাহ ও অন্নপ্রাশন
১১। ভি. টি. রাজশেকর সমীপেষু। (ছাপা নেই)
১২। রিজওয়ান-প্রিয়াঙ্কার বিয়ে এবং তসলিমা বিতাড়ন। (ছাপা নেই)
১৩। অটলবিহারী, তসলিমা এবং ......

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। দেবজ্যোতি রায় নির্বাচিত চিঠি, বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ
২। আমার জীবন আমার উপলব্ধি
৩। স্বনির্বাচিত এগারোটি প্রবন্ধ
৪। মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
৫। বিতর্কিত চিঠি সংকলন
৬। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু
৭। বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ এবং ড. আম্বেদকর
৮। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য : গান্ধীজী থেকে চিত্তরঞ্জন সুতার

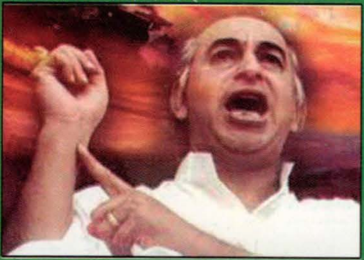
যোগাযোগ: ৯৮৩০৯৯৬৫৬৬ এবং ০৩৩-৬৫৩৫০৩০৩
e-mail: roy_roy05@sify.com


মি. এম. এ. জিন্নাহ


মি. আইয়ুব খান


মি. জিয়াউর রহমান

যাদের কারণে আমরা উদ্বাস্তু


মি. জুলফিকার আলি ভুট্টো


অধ্যাপক গোলাম আজম


মতিউর রহমান নিজামি


ফজলুল হক আমিনি


ওসামা বিন লাদেন

তৃতীয় সংস্করণ - ২০০১ * মূল্য - ৭০ টাকা মাত্র